

ইন সার্চ অফি দু বগলিঅ্যাঙ্কিহেজ

জুল ভান্ অমনিবাস



ইন সার্চ অন্ড দ্য বস্‌স্ট্যান্ডিংয়েজ । জুল ভান্‌ আমনিবাস

সূচিপত্র

প্রথম	2
দ্বিতীয়.....	128
তৃতীয়.....	238

প্রথম

মুশকিল আসানের তিন তলব

এক

হাওরের পেটে এ-কোন লেখা

হাওয়া আসছিলো দক্ষিণপশ্চিম থেকে। সেই হাওয়া ঠেলে ভেসে চলেছিলো মস্ত-একটা প্রমোদতরী, উত্তর প্রণালী দিয়ে। মাস্তুলের ডগায় পং পং করে উড়ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঝাণ্ডা, তার নিচে নীল বলয়ের ওপর সোনালি জরিতে লেখা E.G., আর তাকে ঘিরে আছে বংশপ্রতীক, ছোটো-একটি মুকুট, কোনো আর্ল-এর পারিবারিক আভিজাত্যের চিহ্ন নিশ্চয়ই। বাস্পেচলা এই প্রমোদতরীটির নাম ডানকান। ডানকান-এর মালিক লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন হাউস অভ লর্ডস-এ যান বটে, দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে সেখানে কথাও বলেন, তবে তার রক্তের মধ্যে আছে নীল সমুদ্রের নেশা : লালরক্ত যতটা-না নীল, তার চাইতেও বেশি-নীল বোধহয় এই সমুদ্রের টানই। রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবের তিনি নামজাদা সদস্য-কতবার যে তার বিলাসবহুল ইয়ট নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন, বাজি লড়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এবার কিন্তু নিছক দৌড়ের বাজি বা অ্যাডভেনচারের নেশায় তিনি তার এই মস্ত প্রমোদতরীটি নিয়ে এই প্রণালীর জলে বেরিয়ে পড়েননি, এবার তিনি বেরিয়েছেন তার নবপরিণীতা পত্নী তরুণী লেডি হেলেনাকে নিয়ে, নিছকই শখের বেড়ানো। সঙ্গে আছেন তার তুতোভাই মেজর ম্যাকন্যা। গোড়ায় যাবেন গ্লাসগো, তারপর বারদরিয়ায় প্রমোদভ্রমণে।

জুলাই মাস শেষ হতে চলেছে, আজ ২৬ তারিখ, বছরটা ১৮৬৪, ভরা গ্রীষ্ম। কিন্তু গ্রেটব্রিটনে গ্রীষ্মকাল সবসময়ে তো ঠিক গ্রীষ্মকাল নয়, আবহাওয়ার মর্জি কারু বোঝাই দায়; হয়তো দিনের পর দিন সূর্যের দেখাই পাওয়া গেলো না, আকাশ ভরা রইলো নিচু, ভারি মেঘে, কালো বা ধূসর; বৃষ্টি পড়লো টিপটিপ বা ঝমঝম; হাওয়া গর্জালো তারই সাথে পাল্লা দিয়ে, উত্তুরে হাওয়া, কনকনে-ঠাণ্ডা। অতএব গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা এড়াবার জন্যে পরে থাকো জবড়জং ভারি পশমি পোশাক; শুধু-যে কনকনে ঠাণ্ডা তা-ই নয়, তারই সঙ্গে অসহ্য হয়ে ওঠে দিনরাত্তির এই ভেজা-ভেজা ভাবটা। মনে হয় হাড়গোড়ও এই বর্ষার হাওয়ায় শ্যাওলা গজিয়ে জমে যাচ্ছে। এবার কিন্তু গ্রীষ্মের চালটা একটু অন্যরকম। বেশ ঝকঝকে রোদুর ছিলো গত কয়েক সপ্তাহ, আকাশ ছিলো নীল, আর আবহাওয়া ছিলো মোলায়েম। সেইজন্যেই হঠাৎ মাথায় এসেছিলো নতুন-বিয়ে-করা স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্রে কোথাও বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়। এরপর আবহাওয়া যদি দুম করে ঝোড়ো হয়ে ওঠে, তাহলেও অবশ্যি ভাবনা নেই-ডানকান চলে বাষ্পের জোরে, মাস্তুলের পাল হাওয়ার কৃপা পাবে বলে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে না; বিলাসের সমস্ত আধুনিক উপকরণ আছে জাহাজে, বাড়ির আরামের চাইতে কোনোদিক থেকেই কম নয়। আর বাড়িতে থেকে বা করতেন কী? ক্লাব, পার্টি, নাচের মজলিশ, সাম্রাজ্যের কোথায় কী অঘটন ঘটছে সে নিয়ে আলোচনা আর তর্কাতর্কি, আর নয়তো কখনও-কখনও কোথাও পিকনিকে বেরিয়ে-পড়া; একঘেয়ে কাটছিলো জীবন, উত্তেজনাহীন, অলস, নিস্তরঙ্গ। বরং সমুদ্র সবসময়েই চঞ্চল-সবসময়েই বিষম তাড়া করে কোথাও চলেছে, আর ঢেউয়েরা রহস্যময় কোন-এক ভাষায় অস্ফুট স্বরে সারাক্ষণই কী কথা শুনিye চলেছে। জাহাজ মানে হলো চলন্তের মধ্যে আরেক চলন্ত-কোথায় যেন এ-রকম একটা কথা একবার

শুনেছিলেন লর্ড এডওয়ার্ড। চলো কোথাও-সমুদ্রেও তো এটাই সুর। কাজেই চলো, বেরিয়ে-পড়া যাক।

তাছাড়াও আরো-একটা উদ্দেশ্য ছিলো বৈকি লর্ড এডওয়ার্ডের। তারই নির্দেশমাফিক, তারই নকশা অনুযায়ী, সদ্য কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে ডানকান, তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রীকে এটাই তার বিশেষ উপহার। কিন্তু এই ঝকঝকে জাহাজটি নিয়ে যদি বারদরিয়ায় পাড়ি জমিয়ে পরখ করেই দেখা না-গেলো তবে বুঝবেন কী করে ডানকান কেমন জাহাজ-কেমন মজবুত আর কাজের। অন্তত মহড়া দেবার জন্যও একবার বেরুতে হয় বৈ কি। আর এইজন্যেই তরতর করে ডানকান এখন চলেছে প্রণালীর জলে-আগে হলে বলা যেতে মস্ত-এক রাজহাঁস যেন অনায়াসে সাবলীলভাবে চলেছে; এখন অবশ্য এই কলের জাহাজ, যার চোঙ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তাকে ঠিক পুরোনো কবিতার মতো রাজহাঁসের সঙ্গে তুলনা দেয়া ঠিক হবে না, সেজন্যে আরো একটা নতুন-কোনো প্রাণীর কথা ভেবে নিতে হয়, কিন্তু মোদা কথাটা মানতেই হয়; ডানকানের চলবার ভঙ্গি ছন্দোময়, সাবলীল, অনায়াস-এমন সহজ-স্বচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পুরোনো পালের জাহাজ সচরাচর যেতে পারতো না। লর্ড এডওয়ার্ড ভারি খুশি ডানকান জাহাজের চলবার ভঙ্গি দেখে। কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গও এই জাহাজের ভার পেয়ে খুব খুশি। সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত তিনি চষে বেরিয়েছেন জাহাজে-জাহাজে, অনেক ভালো জাহাজেও কাজ করেছেন আগে, তবে এই ডানকান জাহাজের সঙ্গে সেগুলোর কোনো তুলনাই হয় না।

লর্ড এডওয়ার্ড রক্তের মধ্যে চাপ্তল্য বোধ করেছিলেন বলে নিজেই স্ত্রীকে নিয়ে জাহাজে এসে উঠেছেন। তখনও তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি তার এই ছটফটে অস্বস্তিটায় আসলে আরো-কোনো বড়ো অভিযানেরই পূর্ববোধ ছিলো-সত্যি বলতে কোনো

অভিযানের কথাই তিনি ভাবেননি, শুধু একটু বেড়ানো সমুদ্রে, আর নতুন জাহাজটার কেরামতি হাতে-কলমে জলে ভাসিয়ে পরখ করে দেখা-এই ও ছিলো তার উদ্দেশ্য।

বেশ-খানিকটা পথ অনায়াসেই চলে এসেছে ডানকানকোনো অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোঝা যায়নি, একটুক্ষণের মধ্যেই গতি দ্রুত করে ফেলতে পারে এই কলের জাহাজ, আর ইচ্ছে করলে তাকে মন্থরও করে আনতে পারে;-তাকে বাতাসের গতি বা জলের উচ্ছ্বাস-কোনোকিছুর ওপরই নির্ভর করতে হয় না। মাঝি-মাল্লারাও এই নতুন জাহাজটা হাতে পেয়ে উৎসাহভরে কাজে লেগেছে। সত্যি-বলতে, কেউ যদি একবার নাবিক হয়, রক্তে যদি একবার সমুদ্রের নেশা ঢুকে যায়, তাহলে ডাঙায় আর কিছুতে তার মন ওঠে না-এই, মাঝিমাল্লারাও ডাঙায় বসে কবে ডানকান জলে ভাসবে তারই প্রতীক্ষায় ছটফট করছিলো। এখন তারা এই আনকোরা মজবুত জাহাজটা হাতে পেয়ে ভারি খুশি।

আজকের দিনটা ভারি চমৎকার। ঝকঝকে মুচমুচে রোদুর, আকাশ ঘন-নীল, শুধু অনেক ওপরে ধূসর ও শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, সমুদ্রের সবুজ জলেও বাড়তি কোনো ঢেউ বা ছটফটানি নেই; ডানকান জাহাজ তার এই ট্রায়াল রানে চমৎকার চলেছে।

সেইজন্যই একটু বাদে যখন দূরে জলের ওপর একটা ক্ষুদ্র আলোড়ন দেখা গেলো তখন লর্ড এডওয়ার্ড বেশ অবাক হয়ে গেলেন-মনে হলো সমুদ্রের জল তোলপাড় করে কী-একটা যেন ওদিকটায় এক ধুকুমার কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স নিশ্চয়ই বলতে পারবেন ব্যাপারটা কী-ঐ আজব, অতিকায় জলস্তম্ভেরই বা কী কারণ। দূরবিনে চোখ লাগিয়ে মনে হচ্ছে কোনো মাছ-কিন্তু হঠাৎ এই সময়ে স্কটল্যান্ডের সমুদ্রে এ কোথাকার অতিকায় মাছ।

লর্ড এডওয়ার্ডের প্রশ্নের উত্তর কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স দূরবিনে চোখ ঝুঁটেই বলে উঠলেন : এ তো হাঙরের এক জাতভাই!

হাঙর! লর্ড এডওয়ার্ড বিস্মিত। এখনকার সমুদ্রে হাঙর আছে নাকি?

প্রায়ই আসে। এ অবশ্য কোনো সাধারণ জাতের খুদে হাঙর নয়-বরং সাধারণ হাঙরের চাইতে একে আলাদাই দেখায়। যদি অনুমতি করেন তো লেডি হেলেনাকে আমরা হাঙর কী করে ধরে তারই একটা নমুনা দেখিয়ে দিই। মাছটা সত্যি বড়ো, তছাড়া স্বভাবটাও বেয়াড়া। জেলেদের ছোটো নৌকোগুলোর ওপর উৎপাত করতে পারেফলে একে নির্মূল করাই ভালো।

তাহলে তা-ই করো। এ-বিষয়ে তুমি যা বলবে তা-ই হবে।

লর্ড এডওয়ার্ড গিয়ে লেডি হেলেনাকে ডেকের ওপর ডেকে নিয়ে এলেন।

ঝকঝকে রোদ্দুর আর সমুদ্রও প্রধানত শান্তই-তাই এই অতিকায় হাঙরটার দাপাদাপি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের হুকুমে মাঝারা সাজো-সাজো ভঙ্গিতে লড়াইয়ের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা সেরে ফেললে। মস্ত-একটা আংটায়-তাকে বঁড়িশি বলাই ভালো, যেমন অতিকায় মাছ তেমনি অতিকায় বঁড়িশি-মাংসের টুকরো গেঁথে মাঝারা জলে ফেলে দিলে। আংটাটা শক্ত কাছিতে বাঁধা, অনেকটাই বড়ো, দরকার হলে দড়ি ছেড়ে দিয়ে জলের মধ্যে হাঙরটাকে

খেলানো যাবে। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স অবিশ্যি নিছক মাছধরা দেখাবেন বলেই এটাকে ধরবার উদ্যোগ নেননি। এত-বড়ো মাছটা ধরতে পারলে অনেকটা তেল পাওয়া যাবে। হাঙরের তেল তো সবসময়েই কাজে লাগে। ওষুধ হিসেবে তো বটেই, তবে দরকার হলে এই চর্বিতে অন্য কাজও করা যাবে। . অনেকটা দূর থেকেই মাংসের গন্ধটা পেয়েছিলো মাছটা, কিংবা তার দৃষ্টিও ঘ্রাণশক্তির মতোই প্রখর ছিলো। তীরের মতো ছুটে এলো সে, যেন ছোঁ মেরে পড়বে। জলের ওপর দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে তার কালো পাখনাটা ছুটে আসছে, ডগাটা ছাইয়ের মতো ধূসর। কাছে এলে চোখে পড়লো তার মস্ত দুটি ভাঁটর মতো চোখ, রান্নুসে খিদেয় মুখটা হা-করা, সারি-সারি দাঁত দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড মাথাটাকে দেখাচ্ছে অতিকায় কোনো হাতুড়ির মতো। এর পাখনার ঝাঁপট, জোয়ালের জাঁতিক কিংবা মুণ্ডরের মতো মাথাটার ঘা-কোনোটাই সাধারণ ছোটো জেলেডিঙির পক্ষে মনোরম হতো না। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গই ঠিক বলেছেন। এ-জীবকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই।

কাছে এসেই মাছটা একটা গোঁত্তা খেয়ে ছোঁ মেরে পড়লো মাংসের টোপটার ওপর, আর সে মাংসের টুকরোটা গিলতেই মাঝারা হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিলে আর অমনি আংটাটা তার গলায় আটকে গেলো। তারপর শুরু হলো দড়ি টানাটানির খেলা। অতজন মাঝা মিলে কাছটাকে ধরে টান দিচ্ছে, হাঙরটা গলায় বঁড়শি বিধে যাওয়াতে ছটফটও করছে, কিন্তু তাই বলে মোটেই জল ছেড়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। ও-রকম অস্থিরভাবে দাপাচ্ছে দেখে তার ঝটপটি কমাবার জন্যে পাখনার ওপর দিয়ে একটা দড়ির ফঁসও পরিয়ে দেয়া হলো তাকে। তারপর আধঘন্টা ধুকুমার কাণ্ডর পর তাকে ভোলা হলো ডেকে, মাঝাদের একজন তক্ষুনি একটা কুঠারের কোপে তার পুচ্ছটাকে আলাগা করে দিলে। কিন্তু তার আগেই দেখা হয়ে গেছে দুই পাখনা, লম্বা পুচ্ছ, ফোলা পেট, লম্বা শরীর, মুণ্ডরের মতো মাথা-সব মিলিয়ে প্রকৃতিঠাকরুন কী-একটা অদ্ভুত

কারখানা সৃষ্টি করেছেন। সে যখন ছোট জলের মধ্যে তখন তার ঐ পাখনা আর পুচ্ছই তাকে গতি বা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে দেয় না। হাঙরটার ল্যাঙ্গে যে-কোপ দেয়া হয়েছিলো তার কারণ অতর্কিতে সে যাতে ল্যাজটা দিয়ে একটা মরণব্যপট দিতে না-পারে। লেডি হেলেনা কিন্তু এই ভয়ানক রক্তক্ষয়ী দৃশ্যটা দেখে কেমন আঁৎকে উঠেছিলেন, তিনি চটপট তার ক্যাবিনে ফিরে গেলেন। এই রক্তারক্তি কাণ্ডটার জন্যে তিনি তার মনোরম প্রমোদভ্রমণের অভিজ্ঞতাটে মাটি করে দিতে চান না।

অনেক প্রাণী আছে, মাংসাশী বটে, তবে খিদে না-থাকলে অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে না। হাঙররা মোটেই তা নয়, তারা ঝুঁক বেঁধে থাকে, সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর, মুহূর্তে সব সাবাড় করে দেয়। কুকুরমাছের জাতের এই মাছটা দলছাড়া হয়ে পড়েছিলো-সে কি একাই তার রান্সুসে খিদেটাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে? সে অবশ্য একাই একশো।

মাল্লারা সাধারণত হাঙর ধরলেই পেট চিরে দেখে নেয় কী-কী সে গলাধঃকরণ করেছে মরে যাবার আগে। পুচ্ছহীন হলেও তার দাপাপাপি তখনও আদৌ তুচ্ছ নয়। সে তখনও ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বেস নিচ্ছে আর ছটফট করছে। লম্বায়। সে দশফুটের ওপর, ওজনটাও কোন-না ছশো-সাড়ে ছশো পাউন্ড। মাল্লারা কয়েকজন মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু প্রথমেই পেট চিরে দেখা গেলো পেট খালি, পেটের মধ্যে কিছু নেই। মাংসের টুকরোটার গন্ধ পেয়েই সে-যে অমনভাবে ধেয়ে এসেছিলো তা সম্ভবত খিদেয় এমন হন্যে হয়ে ছিলো বলেই। কেটে সেটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেললে মাল্লারা, চর্বিটা সরিয়ে রেখে এই জলরান্সুসের দেহাবশেষ জলে ফেলতে গিয়েও মাল্লারা

থমকে গেলো কেননা তাদের মধ্যে একজন তখন চেষ্টা করে উঠেছে, আরে! ওটা কি আটকে আছে পাকস্থলিতে?

হবে কোনো নুড়িপাথর! যা রাস্কুসে খাই-খাই, খিদের জ্বালায় হয়তো তা-ই খেয়ে ফেলেছে। বললে অরেকজন।

টম অস্টিন-সে এই ডানকান জাহাজের ফাস্টমেট-বললে, ধুর আহাম্মক! দেখছিস না এ ছিলো পাঁড়মাতাল। ওটা নুড়িপাথর নয় মোটেই। আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা বোতল।

এই শোরগোল শুনে লর্ড এডওয়ার্ড এগিয়ে এসেছিলেন কাছে। অবাক হয়ে বললেন : বোতল! হাঙরের পেটে বোতল! এমন কথা তো কস্মিনকালেও শুনিনি যে হাঙর বোতলশুকু মদ খেয়ে ফ্যালে! বোতলটা বার করো পেট থেকে! অনেক সময় লোকে দরকারি কাগজপত্র পুরে ছিপি এঁটে সমুদ্রে বোতল ভাসিয়ে দেয়। এটা হয়তো সে-রকমই কিছু। কই, নিয়ে এসো ওটা।

হাঙরের পেট থেকে বোতলটা বার করে নিয়ে আসা হলো। তাকে ধুয়েটুয়ে সাফসুতরো করে বোতলটা রাখা হলো টেবিলে। লর্ড এডওয়ার্ড, মেজর ম্যাকন্যাব্স, কাপ্তেন ম্যাঙ্গ-এঁদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে লেডি হেলেনাও কৌতূহলী হয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

লর্ড এডওয়ার্ড বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আগাপাশতলা সেটা নিরীক্ষণ করলেন।

পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্স বললেন, হুম! শ্যাম্পেনের বোতল।
তিনি সেটা জানতে পারেন, সামরিক ব্যারাকে অস্ত্রশস্ত্র, কুচকাওয়াজের সঙ্গে, সঙ্গে
নানাবিধ পানীয়রও চর্চা হয়ে থাকে।

কীসের বোতল জেনে আর কী হবে, লেডি হেলেনা উগ্রীব হয়ে বললেন, হঠাৎ হাঙরের
পেটে কোথেকে এলো, সেটাই জানতে চাই।

অনেকদিন নিশ্চয়ই জলে ভেসেছিল। কী-রকম শ্যাওলা পড়েছে ওপরটায় দেখেছো? লর্ড
এডওয়ার্ড বললেন, হাঙরটার পেটে হয়তো খুব বেশিদিন যায়নি।

ছিপিটা খুলতে গিয়ে দেখা গেলো এতদিন জলে থাকার ফল ফলেছে—ভেতরটায় জল
টুকে গিয়েছে।

বিচ্ছিরি কাণ্ড হলো তো! ভেতরে জল টুকেছে দেখছি। তাহলে কি আর ভেতরে যা ছিলো
তা আর অটুট থাকবে।

বোতলের ছিপিটা খোলবার পর একটা বিশ্রী আঁশটে গন্ধে আশপাশ ঝিমঝিম করে
উঠলো।

ভেতরে কিন্তু সত্যি-কিছু আছে। কাগজ? সে-রকম তো দেখাচ্ছে। কিন্তু ভেতরে সেটা
আটকে গিয়েছে—সম্ভবত জলে ভিজে গিয়েই।

বোতলটা ভেঙে ফেললেই তো হয়? মেজর ম্যাকন্যাব্স অমনি সমাধানটা বাৎলে দিলেন।

তার চাইতে বরং বোতলের মাথাটাই ভাঙা যাক, কাগুন ম্যাঙ্গলসের সুপরামর্শ। তাহলে হয়তো ভেতরের জিনিশটা নষ্ট হবে না।

হাতুড়ি ঠুকে বোতলের মাথাটা ভাঙা হলো। ঝনঝন করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো ভাঙা কাঁচ। সন্তর্পণে কাঁচের টুকরো ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতর থেকে তিন-তিনটে পার্চমেন্ট বার করে এনে বিছিয়ে রাখা হলো টান-টান করে।

দেখা গেলো, তিনটে পার্চমেন্টই জল লেগে লেখা প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে আলোর সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন লর্ড এডওয়ার্ড। কী লেখা আছে এগুলোয়?

দুই
একে তিন তিনে এক

ভালো করে দেখে নিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, এ-যে দেখছি তিন-তিনটে আলাদা দলিল। একেকটা একেক ভাষায় লেখা। এটা আলেমান, এটা ইংরেজি-আর এইটে ফরাশিতে লেখা।

কী লেখা আছে? পাঠোদ্ধার করা যায়? লেডি হেলেনা কৌতূহলী হয়ে জিগেস করলেন।

উঁহু। সব কথা পড়া যাচ্ছে না যে। কিছু-কিছু লেখা জলে মুছে গিয়েছে যে।

তিনটে দলিলে যদি একই কথা তিন ভাষায় লেখা হয়ে থাকে, তাহলে হয়তো তিনটে একসঙ্গে মিলিয়ে পড়ে দেখলে একটা মর্মোদ্ধার করা যাবে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আচ্ছা, প্রথমে ইংরেজিটা দেখা যাক। ইংরেজিতে লেখা দলিলটা টান করে টেবিলে বিছিয়ে রাখার পর দেখা গেলো, তা থেকে শুধু এটুকুই পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে :

বেশ-খানিকক্ষণ লেখাটা পড়ে মর্মোদ্ধার করার ব্যর্থচেষ্টা করে হতাশ হয়ে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স মন্তব্য করলেন, উঁহু, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। একটা বাক্যও আস্ত নেই- কিছু বোঝা যাবে কী করে?

কোনো গোটা বাক্য না-থাকলেও কতকগুলো শব্দ তো আস্ত আছে। এই-যে, দ্যাখোনা, Sink, aland, This, and lost এই শব্দগুলো কিন্তু ঠিকই আছে। আর ঐ Skipp নিশ্চয়ই Skipper কথাটারই গোড়ার দিক। Gr-এটার G বড়োহাতের হরফ বলে মনে হয়, কোনোকিছুর নাম। Skipper যদি আমরা ঠিকঠাক ভেবে থাকি, তবে এই Gr হয়তো জাহাজটারই নাম আর ssistance কথাটা থেকে মনে হয় সাহায্য চাচ্ছে। সম্ভবত Gr জাহাজটা ডুবে গেছে, বা এমনভাবে ভেঙে গিয়েছে যে আর নাব্যতার উপযোগী নেই। সেই জন্যেই এই assistance চাইবার প্রার্থনা।

কাপ্তেন ম্যাক্সল্‌স বললেন, ssistanceটা যে assistance-এরই শেষাংশ সেটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। docum কথাটা সেভাবেই নিশ্চয়ই document কথাটার গোড়ার দিক- শেষটা মুছে গিয়েছে।

হয়তো এই অনুমানগুলো ঠিক, তবে যেহেতু অনেকগুলো লাইন নেই, কোনো বাক্যই নেই পুরোপুরি, তাতে আসল ব্যাপারটাই জানা যাচ্ছে না। যদি জাহাজডুবির পর কেউ সাহায্য চেয়ে এই দলিলটা বোতলে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে, ধরে নিলুম তা-ই হয়েছে, কিন্তু এই তথ্যগুলো নেই জাহাজটার নাম কী, কোথায় যাচ্ছিলো; কোন দেশের জাহাজ (কারণ বাকিগুলো তো ইংরেজিতে লেখা নয়-আলেমন আর ফরাশিতে) তাও বোঝা যাচ্ছে না। কবে কোথায় গিয়ে জাহাজটা বিপাকে পড়েছে তারও কোনো হদিশ নেই। আমরা যা জানতে পাচ্ছি, তার অনেকটাই অনুমানের ওপর নির্ভর করে মেজর ম্যাকন্যাব্স জানালেন।

দু-নম্বর পার্চমেন্টটার গায়ের লেখা প্রথমটার চাইতে আরও অবোধ্য-প্রায় পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। পার্চমেন্টে যা পড়া গেলো, তা এই :

ৎসভাই, আট্রোসেন, ব্রিংগটু ইরেন- কাপ্তেন ম্যাঙ্গস কথাগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন। আলেমান ভাষা, বললেন তিনি, তাছাড়া হরফগুলো গথিক। সিবেন ইউনি অর্থাৎ সাত জুন। ইংরেজি কাগজটার 62 যদি তারিখেরই অংশ হয় তাহলে এই দুটো জুড়ে পাওয়া যাচ্ছে সাত জুন, ১৮৬২। আলেমান দলিলে আছে Glass, ইংরেজিতে আছে Gowজুড়ে দিলে হবে Glassgow, অর্থাৎ জাহাজটা ছিলো গ্লাসগোর। পরের একটা লাইন কিছুই পড়া যাচ্ছে না-শুধু ঝাপসা কালির দাগ। কিন্তু তারপরেই রয়েছে ৎসভাই-zwei-মানে দুই, মাঝে ফাঁক দেখে মনে হয় attrosen-এর আগে অন্তত একটা হরফ ছিলো-যদি mattrosen হয় তবে বোঝাবে নাবিক, মাঝিমাল্লা। ঐ graus কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু অন্য দুটো কথা তো আসতই আছে bringt ihren-মানে bring them-ওদের নিয়ে এসো; এখন ssistance বা assistance-এর সঙ্গে যদি

জোড়া যায় তাহলে দাঁড়াবে being them assistance-মানে ওদের কাছে সাহায্য নিয়ে এসো। ওদের সাহায্য করে।

লর্ড এডওয়ার্ড বললেন : সাহায্য চাইছে? কারা? মেজর ম্যাকন্যাব্স বললেন : তাছাড়া এরা কোন্ ধরনের সাহায্য চাইছে তাও তো আমরা জানি না।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তৃতীয় পার্চমেন্টটা নেড়ে-চেড়ে বললেন : কী ধরনের সহায়তা পাঠাতে হবে, তা সম্ভবত পরের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। যেহেতু ফরাশিতে লেখা, কারুপক্ষেই বুঝতে অসুবিধে হবে না।

দ্রোয়া-trois-মানে তো তিন, আর mais-সেটা সম্ভবত মাস্তুলই বোঝাচ্ছে-তিন মাস্তুলের জাহাজ। লর্ড এডওয়ার্ড হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ইংরেজি আর ফরাশি লেখা মিলিয়ে তো জাহাজটার নামও পাওয়া যাচ্ছে-ব্রিটানিয়া-Britannia! অর্থাৎ গ্রেটব্রিটেনের জাহাজ! আর Austral ইংরেজিতেও যা বোঝাচ্ছে ফরাশিতেও তাই-অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধের কথা-

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন : তার মানে, দক্ষিণ গোলার্ধে জাহাজডুবি হয়েছে!

কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে লর্ড এডওয়ার্ড আরো-কতকগুলো ব্যাপার আন্দাজ করে নিলেন। শব্দের ভাঙাচোরা টুকরো থেকেই অনুমান করে নিতে হবে গোটা শব্দটা-এবং কোনো নৌযাত্রার সঙ্গেই যেন সে-সব শব্দের একটা সংগতি থাকে। আর এই সূত্রটা ধরেই সশব্দে অনুমান দাঁড় করালেন লর্ড এডওয়ার্ড : abor ধরে নিলুম

aborder এর প্রথম অংশ মানে জমিতে নামা। যাত্রীরা ডাঙায় নেমেছে। কিন্তু কোথায়? Contin-তা নিশ্চয় Continentই বোঝাচ্ছে-কোনো একটা মহাদেশ

দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশ? মেজর ম্যাকন্যাব্স তার অনুমানের ঢিল ছুঁড়লেন।

এটা খেয়াল করেছেন? কাপ্তেন ম্যাঙ্গস বলে উঠলেন, cruel শব্দটা থেকে আলেমান শব্দ graus-এরও একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে-grausan-অর্থাৎ gruesome-ভয়ংকর-নিষ্ঠুর।

Indi তাহলে কি India-ভারতবর্ষ? আর ongit ই বা কী-আরে! সেটা নিশ্চয়ই longitude-এরই ধ্বংসাবশেষ দ্রাঘিমা। তাহলে lat হলো অক্ষরেখা, latitude-৩৭ ডিগ্রি ১১। তাতে তো ঠিকানাটাই পেয়ে-যাওয়া গেলো, অন্তত তার একটা মোটামুটি আন্দাজ।

দ্রাঘিমা কত না-জানলে আর মোটামুটি ঠিকানা তুমি পেলে কোথায়? মেজর ম্যাকন্যাব্স ফ্যাকড়া তুললেন।

আগে তো তিনটের বয়ান মিলিয়ে সবটা লিখে ফেলা যাক-একসঙ্গে চোখের সামনে যদি থাকে তাহলে হয়তো হেঁয়ালিটার একটা নিস্পত্তি হবে- বললেন লর্ড এডওয়ার্ড।

যারা এই পার্চমেন্টগুলো বোতলে পুরেছিলো, তারা কিন্তু কোনে ধাঁধা বা হেঁয়ালি তৈরি করতে চায়নি-তারা ঠিকঠাক জানাতে চেয়েছিলো কোথায় কী হয়েছে। শুধু প্রকৃতির কৃপাতেই খানিকটা লেখা মুছে গিয়ে জট পাকিয়ে গেছে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্স বললেন।

সেইজন্যেই একসঙ্গে সাজিয়ে নিলে সুবিধে হবে। তাছাড়া লেখাগুলো সব পশ্চিম ইওরোপের নানা ভাষায়-আর আমরা যদি জাহাজের নামটা সঠিক অনুমান করে থাকতে পারি, ব্রিটানিয়া, তাহলে সেটা মোটেই অস্বাভাবিক হয়েছে বলেও মনে হয় না। এবার সবগুলো লেখা একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক তা থেকে জটটা খোলবার কোনো হদিশ মেলে কি না।

তিনটে পার্চমেন্টের লেখাকেই সাজিয়ে নিয়ে ইংরেজিতে লিখে ফেললেন লর্ড এডওয়ার্ড।

লেখাটা যখন তারা খতিয়ে দেখছেন, তখন মাল্লাদের একজন এসে জানতে চাইলে এবার ডানকান জাহাজ কোনদিকে যাবে। পুরোটাই তো এই আনকোরা জাহাজটার মহড়া চলেছে, এমনিতে তার বিশেষ-কোনো নিদিষ্ট গন্তব্যই নেই। এবার অবশ্য ঠিক করে নেয়া দরকার ডানকান ফিরে যাবে কি না।

প্রশ্ন শুনে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন : ডামবার্টন চলো। লেডি হেলেনা ম্যালকম কাল-এ ফিরে যাবেন। আমি তারপর যাবো লন্ডনে-নৌবাহিনীর দফতরে গিয়ে এটা দেখাতে হবে। তাছাড়া ব্রিটানিয়া সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর নিতে হবে আমাদের।

মাল্লাটি নির্দেশ নিয়ে চলে গেলে লর্ড এডওয়ার্ড লেখাটা তুলে নিয়ে বললেন : আমরা তাহলে ধরে নিতে পারি যে ১৮৬২ সালের ৭ই জুন একটা ত্রিমাঙ্গুল যুদ্ধজাহাজ-ব্রিটানিয়া গ্লাসগো থেকে বেরিয়েছিলো সেটা কোনো অজ্ঞাত কারণে ডুবে গিয়েছে। কাপ্তেন আর তার সঙ্গে দুজন মাল্লা ৩৭°১১ অক্ষাংশ থেকে তিনটি ভাষায় খবরটা জানিয়ে সাহায্যের

প্রার্থনা করে একটা বোতলে লেখাগুলো পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে যদি তারা উদ্ধার না-পেয়ে থাকে, তাহলে দু-বছরেরও বেশি হলো কোথাও পড়ে আছে-

যদি-না এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকে, বললেন, মেজর ম্যাকন্যা। আর যদি বেঁচেও থাকে, তাদের দশা এখন কী হয়েছে, সেটা খানিকটা কল্পনা করে নেয়া যায়, এতক্ষণে লেডি হেলেনা মুখ খুললেন।

খুব-একটা ভালো অবস্থায় নেই সম্ভবত, লর্ড এডওয়ার্ডকে একটু উদ্বিগ্নই দেখালো। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে, তার সমাধান কী, আমার মাথায় আসছে না। জাহাজটা ডুবেছে সম্ভবত দক্ষিণ গোলার্ধের কোথাও। কিন্তু ঐ gonie শব্দটার মানে কী হতে পারে?

ওটা তো ফরাশি লেখাটার টুকরো-ফরাশি ভাষায় যাকে Patagonie বলে, ইংরেজিতে তাকেই বলে Patagonia। এটা সেই পাতাগোনিয়া কথাটারই ভগ্নাংশ নয় তো?

পাতাগোনিয়া কি ৩৭° অক্ষরেখায় পড়ে? মেজর ম্যাকন্যাব্‌স জিগেস করলেন।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তক্ষুনি আমেরিকার দক্ষিণভাগের মানচিত্র খুলে দেখিয়ে দিলেন সত্যি তা-ই।

দক্ষিণ আমেরিকা যদি হয় তাহলে ধাঁধার জট আরো-খানিকটা খোলা যায়। Contin-017667 Continent, proto 9767 prisoners, 115 cruel indi সেক্ষেত্রে হতে পারে cruel Indians। আর এই অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে তারা হয়তো নিষ্ঠুর

ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে তারা এখনও বেঁচে আছে কি না, সে-সম্বন্ধে সংশয়ও জাগতে পারে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন : পাতাগোনিয়া দক্ষিণ আরুহেনতিনা আর দক্ষিণ চিলের মধ্যে অবস্থিত-তার একদিকে আয়োস গিরিমালা অন্যদিকে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর। তিয়ে দেল ফুয়েগো এই পাতাগোনিয়ারই অংশ।

যদি আহেনতিনা বা চিলের দক্ষিণভাগেই তা হয়ে থাকে, তবে এটা আশ্চর্য যে অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষার সঙ্গে এস্প্যানিওলে কিছু লেখা নেই। তাছাড়া আরুহেনতিনার পাম্পায় বা চিলেয় যে-ইন্ডিয়ানরা থাকে, তারাই বা কতটা নিষ্ঠুর? অকারণে কাউকে বন্দী করে রেখে তারা কি অত্যাচার করবে? লেডি হেলেনা প্রশ্ন তুললেন।

এ-সব তো আমাদের অনুমান মাত্র, লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, গ্লাসগো গিয়ে-হয় খোঁজ করে দেখা যাবে ব্রিটানিয়া সত্যি-সত্যি কোথায় যাচ্ছিলো। সেখানে নিশ্চয়ই কোনো নথিপত্রে কিছু লেখা থাকবে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন তার কাছে নৌদফতরের গেজেট আছে-সেখানে হয়তো এক্ষুনি কোনো হদিশ পাওয়া যেতে পারে। দু-বছর আগেকার গেজেট বার করেই একটা জরুরি তথ্য বার করে নেয়া গেলো।

এখানে গেজেটে একটা জ্ঞাপনী আছে। ১৮৬২ সালের ৩০শে মে কাপ্তেন গ্রান্ট কাইয়াও থেকে ব্রিটানিয়া জাহাজ নিয়ে গ্লাসগোর উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

কাইয়াও? সে আবার কোথায়? মেজর ম্যাকন্যাব্স জিগেস করলেন।

কাইয়াও, গেজেট থেকে মুখ তুলে কাণ্ডেন ম্যাক্সস জানালেন, পশ্চিম পেরুর একটা নগর-বন্দর-লিমার পশ্চিমে, কাইয়াও উপসাগরের তীরে অবস্থিত। তেমন ছোটো শহরও নয়-দেড় লাখের ওপর লোক আছে-

লর্ড এডওয়ার্ড কিন্তু কাইয়াওয়ের খবর শুনছিলেন না। তিনি বরং ব্রিটানিয়া জাহাজের কাণ্ডেনের নাম শুনে চমকে উঠেছেন। কাণ্ডেন গ্রান্ট? সেই যিনি প্রশান্ত মহাসাগরে নোভাস্কোশিয়ার পত্তন করতে চেয়েছিলেন-নয়াস্কটল্যান্ড?

হ্যাঁ। তিনিই। কিন্তু ১৮৬২ সালে ব্রিটানিয়া জাহাজ নিয়ে তিনি কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন তা আজও কেউ জানতে পারেনি।

তাহলে তো আমরা অনেকটাই জেনে যেতে পেরেছি। ৩০শে মে তিনি কাইয়াও থেকে বেরিয়েছিলেন-৭ই জুন অর্থাৎ ঠিক আটদিন পরে পাতাগোনিয়ার কাছে কোথাও-হয়তো উপকূলেই জাহাজ ডুবি হয়। এবার তাহলে দ্রাঘিমাটা জেনে যেতে পারলেই আমরা বুঝে যাবো সত্যি-কোথায় তার জাহাজডুবি য়ছিলো।

দ্রাঘিমা যদি নাও জানা যায়? কাণ্ডেন ম্যাক্সলস্ জানালেন, পাতাগোনিয়া বা তিয়েররা দেল ফুয়েগো আমার জানা। আমরা সেখানটায় অনায়াসেই। পৌঁছে যেতে পারবো।

এবার তাহলে গোটা সন্দেশটা লিখে ফেলা যাক, লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, অন্তত যে-কথাগুলো সম্বন্ধে আমাদের আর-কোনো সন্দেহই নেই, সেগুলো পর-পর সাজিয়ে দেখা যাক কী দাঁড়ায়।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের সাত তারিখে গ্লাসগোর ত্রিমাঙ্গুল যুদ্ধজাহাজ ব্রিটানিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে পাতাগোনিয়ার কাছে কোথাও ডুবে গিয়েছে। সুজন মাল্লা আর কাপ্তেন গ্রান্ট দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডের কোথাও গিয়ে নেমেছিলেন, বা নামবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সম্ভবত নামবামাত্র সেখানকার ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন তাদের বলা হয়েছে ভয়ংকর অথবা নিষ্ঠুর-নামবার সময় ৩৭°১১ অক্ষরেখায় তারা সাহায্য চেয়ে একটা বোতলে নানা ভাষায় খুঁটিনাটি জানিয়ে তিনটে চিরকুট ভাসিয়ে দিয়েছিলেন-অন্তত আর-কোনো বোতলে এই বার্তা জানিয়েছিলেন কি না জানা নেই-তবে এটায় তারা তিনটি ভাষা আবেদন জানিয়েছিলেন-যাতে যারই হাতে পড়ুক সে-ই মূল আবেদনটা পাতে পেরে সাহায্য পাঠাতে পারে।

এই মর্মার্থটা জানবার পর সকলেরই মত হলো যে, ব্যাপারটা বাস্তবিকই নিশ্চয়ই তা-ই হয়েছিলো।

লেডি হেলেনা কাপ্তেন ম্যাঙ্গাকে জিগেস করলেন : তারপর থেকে আজ অদি কি আদৌ কোনো খোঁজ মেলেনি তাঁদের?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস্ মাথা নেড়ে জানালেন, না।

কিন্তু এই চিরকুটগুলো দেখলে কি সরকার থেকে কোনো সাহায্য করা যাবে না? ব্রিটানিয়া তো একটা যুদ্ধজাহাজ, ফ্রিগেট-তাতে কামানও তো আছে

লেডি হেলেনা বললেন, আর কাপ্তেন গ্রান্টের পরিবার? কি স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে-

লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, এ নিয়ে তুমি মিথ্যে আর ভেবো না। আমিই তাদের খবর দেবো। দরকার হলে তাদের দায়িত্ব নেবো।

একটু পরে ডানকান যখন ডামবারটনের বন্দরে ভিড়লো, লেডি হেলেনাকে নিয়ে মেজর ম্যাকন্যাক্স গেলেন ম্যালকম কা-এর উদ্দেশ্যে, আর লর্ড এডওয়ার্ড লন্ডনের ট্রেন ধরবার আগে টাই আর মর্নিং ক্রনি কাগজ দুটোয় একটা বিজ্ঞাপনের খশড়া পাঠিয়ে দিলেন ছাপবার জন্যে :

কেউ যদি ত্রিমাস্তুল মানোয়ারি জাহাজ ব্রিটানিয়ার কোনো খোঁজ নিতে চান তাহলে নিচের ঠিকানায় লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।-ম্যালকম কাপ্প, ডামবারটন, স্কটল্যান্ড।

.

তিন

কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে

পশ্চিম স্কটল্যান্ডের লখ ফাইন-এর কাছে, যেখানে সমুদ্র থেকে একটা লম্বা ল্যাজ যেন দু-দিকে ডাঙা রেখে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তারই কাছে একটা টিলার ওপর তৈরি হয়েছে ম্যালকম কাল, মস্ত-একটা দুর্গ, পুরোনো সমস্ত কিংবদন্তি কুয়াশা আর আলোছায়ায় ছাওয়া পরিখাঘেরা কেব্লা, তাকে জড়িয়ে কত-যে গল্প আছে তার ঠিক নেই। সেই কবে থেকেই গ্লেনারভনরা এই কেব্লার মালিক, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র কল্পকথা কিংবা প্রেমকাহিনীর সে সাক্ষী-ফার্গাস ম্যাকগ্রেগর বা তারই মতো কেউ-কেউ সে-সব কাহিনীর নায়ক। স্কটল্যান্ডে যখন তুলকালাম কাণ্ড চলছিলো, বিদ্রোহ বিক্ষোভে স্বাধীনতার লড়াই, তখন অ্যাংলো-স্যাকসনদের অত্যাচারের কত-যে স্কট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, তার ইয়াত্তা নেই, যদিও গ্লেনারভনরা নানাভাবে টিকে থাকতে চেয়েছেন এখানে এবং টিকেও গিয়েছেন, আর তাদেরই সঙ্গে থেকে গিয়েছে-টিকেই গিয়েছে বলা যায় তাদের কিছু অনুচর-সহচর-বংশানুক্রমিকভাবে তাদের পরিবারও সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে গ্লেনারভনদের সঙ্গে ছিলো। ইংরেজদের অধীনতা মেনে নিতে হয়েছে বলে তাদের দুঃখের শেষ নেই। কিন্তু তারই মধ্যে তারা জিইয়ে রাখতে চেয়েছে তাদের স্বাভাবিকতা, তাদের সংস্কৃতি-কিল্ট পরে তারা, খাটো হাঁটু অন্দি নামা ছোটো স্কার্ট, কিংবা বলে গেলিকভাষা, কিংবা বাজায় ব্যাগপাইপ, ফুট, হাইল্যান্ডের সংগীত। তারা-থাকলে একা-একা গ্লেনারভনদের এই কেব্লায় থাকা মুশকিলের হতো, যতই কেননা ম্যালকম কাল মজবুত হোক, কিংবা কাল হোক সশস্ত্র, থাকুক জালিকাটা উপরদেয়াল, যেখান থেকে গোলন্দাজদের বন্দুকের নল বেরিয়ে থাকতে পারে হানাদারদের উদ্দেশ্যে। এরা সবাই নির্ভীক, দুঃসাহসী, বেপরোয়া-আর বিশ্বস্ত ও অনুগত। সত্যি-বলতে, তারাই আছে ডানকান জাহাজে, ওস্তাদ মাল্লা একেকজন, দুর্ধর্ষ, সমুদ্র যখন রাগে ফেঁসে, গর্জায় একটুও না-টসকে, একটুও বিচলিত না-হয়ে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তারা জাহাজ সামলাতে

পারে। স্কটল্যান্ডের উপকূলে সমুদ্র প্রায়ই অশান্ত হয়ে ওঠে, বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী বর্ষায়, আর ছেলেবেলা থেকেই সেই জলে বেরোয় বলে তারা জানে কেমন করে শামাল দিতে হয় সে-সময়। তারা শুধু নির্ভরযোগ্য বা নিছক বেপরোয়াই নয়, তাদের দুর্দান্ত দুঃসাহস এসেছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে, দক্ষতা থেকে, একেকজন তারা ওস্তাদ মাঝি-মাঝা, চৌকশ, দুর্ধর্ষ।

লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন অজস্র বিত্তসম্পদের মালিক-কিন্তু এই বিপুল অর্থ তিনি কোনো মক্ষিচুষ কঙ্কুসের মতো শুধু সিন্দুকেই তুলে রাখেন না, অকাতরে সে-অর্থ তিনি সে-অঞ্চলের মানুষদের অবস্থা ফেরাবার জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করেন, দরকার হলে হাউস অভ লর্ডস-এ তাদের জন্যে বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, লড়াই করেন, তাদের উন্নতির জন্যে নিপুণভাবে যুক্তি সাজিয়ে ও শানিয়ে ভাষণ দেন-সেইসব ভাষণে কেবল যে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ থাকে, কূটজাল থাকে যুক্তির, তা-ই নয়-কখনও-কখনও সেইসব কথার সঙ্গে মিশে যায় তীব্র আবেগ-অর্থাৎ নীরক্ত, শীতল, হৃদয়হীন বুদ্ধির প্যাঁচই খেলেন না লর্ড এডওয়ার্ড-এ-দেশের মানুষের জন্যে সত্যি ভাবেন তিনি, তাদের কথা ভাবেন সবসময়, আর এই দেশপ্রেম বা দেশবাসীর জন্যে প্রেম আছে বলেই অকুতোভয়ে এমন-সব পরিকল্পনা কঁদতে পারেন, যে-সব কাজে নামতে গিয়ে অনেক ডাকাবুকো লোকও দু-একবার ইতস্তত করবে। বিপদের সম্ভাবনা দেখে তিনি তার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা থেকে পেছিয়ে আসেন না। তিনি রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন, তা নিছক খেয়ালি বিভ্রান বলেই নন। এটা ঠিক যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নামতে তার ভালোই লাগে, উত্তেজনা জাগে মনে, রক্তে জাগে চাঞ্চল্য, শিহরন। কিন্তু আরো-একটা উদ্দেশ্য থাকে আড়ালে-প্রতিযোগিতায় তিনি কেবল ব্যক্তি হিসেবেই জেতেন না, জেতেন স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে, স্বদেশের নাম উজ্জ্বল করবার জন্যে। কিন্তু তাঁর এই দেশপ্রেম তাই

বলে তাকে সংকীর্ণ মানুষ করে তোলেনি-তঁার চিত্তের ঔদার্যও তাকে অন্যদের চাইতে ভিন্ন করে দিয়েছিলো-বিশেষত হাউস অভ লর্ডসে অন্য যে-সব ধনীর দুলাল আভিজাত্যের বড়াই করেন, নাকউঁচু হাস্‌ড়া দেমাক দেখান, সবসময়েই ভোগেন অহংম্মন্যতায় বা আত্মকেন্দ্রিকতায় তিনি ঠিক তাদের মতো নন। এজন্য তার বিস্তর সুনাম হয়েছিলো। আর তা যে কারু-কারু মধ্যে ঈর্ষার জ্বলুনি জাগিয়ে দিতো না, তাও নয়। কিন্তু বত্রিশবছর বয়সী এই সুপুরুষ কখনো নিজে থেকে কাউকে তার বিরুদ্ধাচরণ করবার সুযোগ দেননি-প্রতিযোগিতা হয় জলে, ইয়টের বাজিতে, আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জের থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ জলের মধ্যে চলে এই রেযারেষি। সাধারণ মানুষের প্রতি তার দরদ এতই সহজে তার স্বভাবটার সঙ্গেই মানিয়ে যেতো যে তাতে কখনও কোনো আত্মস্তরিতা প্রকাশ পেতো না। আর তার দরাজ দিলের সঙ্গে সংগতি রেখেই ছিলো তার প্রচণ্ড দুঃসাহস। এটা এমন ধরনের কোনো দুঃসাহস নয় যার মধ্যে দেখানোপনা আছে, শুধু দুঃসাহসী কীর্তি করেই যা তুষ্ট হতো, অর্থাৎ নিছক বেপরোয়াভাব প্রকাশ করার জন্যেই তিনি বেপরোয়া কাজেকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না, তার পেছনে তাগিদ থাকতো পরের উপকার করবার। আর এই পরোপকার-প্রবৃত্তি কারু কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী ছিলো না, বরং কারু জন্যে কোনো কাজ করে দেবার পর সে যদি গদগদ হয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করতো তবে তিনি যেন লজ্জাই পেয়ে যেতেন, একটু সংকুচিত বোধ করতেন, আড়ষ্ট। তিনি যদি অকাতরে দেশের মানুষের জন্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেন, অন্তত বিলিয়ে দেবার প্রয়োজন এলে তিনি যে তাতে পেছ-পা হতেন না এটা সুনিশ্চিতই ছিলো, তবু তিনি ঠিক চাইতেন না লোকে সেটা জানুক, জেনে তাকে বাহবা দিক, শাবাশি জানাক-পারলে নিজেই তিনি প্রসঙ্গটা হয়তো ভুলেই যেতেন।

এহেন লর্ড এডওয়ার্ড বিয়ে করেছেন হেলেনাকে, সাধারণ ঘরের মেয়ে। সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, সংবেদনশীল, কিন্তু তার ধমনীতে নীল রক্ত বয়ে যেতো না। অন্যান্য অনেক রূপসী তরুণী-অভিজাতঘরের মেয়ে সবাই-তার প্রেমে পড়বার জন্যে যেন তৈরি হয়েই ছিলো। তাদের সঙ্গে লর্ড এডওয়ার্ডের নানা উপলক্ষে মেলামেশাও হতো, নাচের মজলিশে, গানের আসরে, পালায়-পরবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনি বিয়ে করলেন উইলিয়ম টানেলের এই মেয়েকে-সেই অকুতোভয় টাফনেল, যিনি ছিলেন বিখ্যাত ভ্রমনবিদ, কত-যে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়ে এসেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। হেলেনার সঙ্গে যখন লর্ড এডওয়ার্ডের পরিচয় হলো টাফনেল পরিবার তখন বিষম দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলো। হেলেনার বয়েস তখন সদ্য বাইশ ছুঁয়েছে। বিত্ত, কিংবা নীল রক্ত, কিংবা তথাকথিত জাগতিক খ্যাতি কিছু না-ই থাক, হেলেনার রূপগুণ ছাড়া আরো-একটা জিনিশ ছিলো, যা লর্ড এডওয়ার্ডের প্রণয়প্রার্থী অন্য মেয়েদের ছিলো না-আর তাতেই যেন সবাইকে। টেক্সা দিয়ে গিয়েছিলেন লেডি হেলেনা, আর সেটা এই : তিনি স্কটল্যান্ডের দুহিতা। হেলেনা যে স্কটিশ, এটাই ছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে একটা বাড়তি আকর্ষণ। অবশ্য স্কটিশ না-হলেও হেলেনাকে তিনি বিয়ে করতেন, বলেই মনে হয়—কেননা প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই দুজনে দুজনের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু হেলেনা যে স্কটল্যান্ডের দুহিতা-এই তথ্যটা কাটান দিয়েছিলো এই সামাজিক রীতিকে-যে, অভিজাতরাই অভিজাতকে বিয়ে করবেন। লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে স্কটল্যান্ডের মানুষ মাত্রেরই অভিজাত। আর হেলেনা টাফনেল তো বিশেষ করে তা-ই, যেহেতু দুজনের মনের মিল এতটাই হয়েছিলো যে সত্যি-বলতে কোনো সামাজিক রীতিনীতির অযৌক্তিক বিধানকেই নির্বিচারে বিতর্কে মানতে দেয়নি।

বিয়ের পর হেলেনাকে তাক লাগিয়ে দেবেন বলে লর্ড এডওয়ার্ড একটা বাস্পেচলা জাহাজ তৈরি করাচ্ছিলেন। লোকে মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে যায় নিশ্চিত নিরুপদ্রব কোনো ভূস্বর্গে; লর্ড এডওয়ার্ডের ধারণা ছিলো অন্যরকম। তারা বেরিয়ে পড়বেন সমুদ্রে, মধুচন্দ্রিকার সঙ্গে মিশবে প্রমোদভ্রমণ, অর্থাৎ কোথাও গিয়ে আস্তানা গেড়ে বসা নয়—সারাক্ষণই চলতে থাকবেন দুজনে, রোজ নতুন জলে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখবেন—অথচ জাহাজটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকে, আরামবিরামের অবকাশ থাকে। সত্যি-বলতে, কোনো ইয়ট ক্লাবের সদস্য মিথ্যে কেন মধুচন্দ্রিকা যাপন করবে ডাঙায়?

আর এই কারণেই তৈরি করা হয়েছিলো ডানকান। জাহাজের নীল-খশড়া-অর্থাৎ নকশাটা—অনেক ভাবনাচিন্তার পর লর্ড এডওয়ার্ডের মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো। একই সঙ্গে মজবুত হবে, সর্বাধুনিক এনজিন থাকবে তার, তরতর করে জল কেটে এগিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে থাকবে আরামেরও সব উপকরণ, যাতে কিছুতেই এ-কথা কখনও মনে না-হয় যে এর চাইতে কোনো ভালো হোটেলে গিয়ে উঠলেই হতো।

আর তারপরে নতুন-তৈরি জাহাজ ডানকানকে নিয়ে মহড়ায় বেরুবামাত্র আকস্মিকভাবে পাওয়া গেলো মুশকিল আসানের তিন তলব—তিন-তিনটে ভাষায় লেখা সাহায্যের প্রার্থনা।

লর্ড এডওয়ার্ড টাইমস আর মর্নিং ট্রনিকলে বিজ্ঞাপন দুটো পাঠিয়ে দিয়েই রওনা হয়ে গেলেন লণ্ডনের উদ্দেশে, নৌদফতরে গিয়ে তিনি বিশদ জানাবেন কী হয়েছে, সেইসঙ্গে

খোঁজ-খবরও নেবেন কাণ্ডেন থ্রাণ্টের ব্রিটানিয়া সম্বন্ধে। আর লেডি হেলেনা চলে এলেন ম্যালকম কা-এ।

পরদিনই লণ্ডন থেকে এক তার এসে হাজির। যত-শিগগির-সম্ভব লর্ড এডওয়ার্ড ডামবারটন ফিরে আসবেন; কিন্তু তারের পেছন-পেছন সেদিনই রাত্তিরে এলো এক চিঠি। তার সংক্ষিপ্ত বয়ানের ততোধিক সংক্ষিপ্ত সারমর্ম লন্ডন থেকে ফিরতে দেরি হবে। নববিবাহিত বর তার কনেকে খুবই সোজাসুজি জানিয়েছে। তাড়াতাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না। চিঠির বয়ানের ধরন দেখে লেডি হেলেনার একটু ভাবনাই হলো। যেন তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ লর্ড এডওয়ার্ড কোনো কারণে মতি পরিবর্তন করে জানাচ্ছেন লণ্ডনে তার সময় লাগবে। কেন? হঠাৎ আবার কী হলো?

এ-চিঠি পাবার পর লেডি হেলেনা যখন সাত-সতেরো অনেক কিছুই ভাবছেন অথচ কোনো হৃদিশই পাচ্ছে না লর্ড এডওয়ার্ডের আকস্মিক সূচিবদল করার কারণের, এমন সময়ে তার খাশ পরিচারক এসে জানালে অনেক দূর থেকে ট্রেনে করে দুই কিশোর-কিশোরী এসেছে, গ্লেনারভনের সঙ্গে এম্মুনি দেখা করতে চায়, জরুরি দরকার। তাদের নাকি বিষম বিচলিত দেখাচ্ছে।

কারা এরা-লেডি হেলেনা ঠিক বুঝতে পারলেন না। লর্ড এডওয়ার্ডের তাড়াতাড়ি না-ফেরার সঙ্গে এদের কোনো যোগ আছে? থাকুক বা না-থাকুক, তাদের খুব বিচলিত দেখাচ্ছে এ-কথা শুনেই লেডি হেলেনা তাদের ডেকে পাঠালেন।

ঘরে যারা ঢুকলো, সত্যি তাদের বয়েস বেশি নয়। মেয়েটির বয়েস ষোলো-সতেরো হবে, সে-ই দুজনের মধ্যে বড়ো, পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায় এককালে যদি-বা অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ হয়েও থাকে, এখন নিশ্চয়ই অবস্থাবিপাকে পড়েছে, কেননা পোশাক তার দামি, তাতে রুচির ছাপ আছে, পরিচ্ছন্নও, কিন্তু দেখে বোঝা যায় এই পোশাক পুরোনো, বহু ব্যবহারে তার রঙ একটু মিইয়ে এসেছে। ছিপছিপে সুশ্রী কিশোরী, ডাগর দুটি চোখ-লাল, ফোলা-ফোলা, দেখে মনে হয় এতক্ষণ কাঁদছিলো। ছেলেটির বয়েস বারো-তেরো, তারও পরনে দামি কিন্তু পুরোনো পোশাক-দুজনেরই মুখের আদলে মিল আছে, সম্ভবত এরা ভাই-বোন। একটু উদ্রান্তই দেখাচ্ছে দুজনকে, উত্তেজিতও। তারা লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে চায়, খবরকাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে ছুটে এসেছে, কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজ নিতে চায় তারা।

কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজ? তাদের উত্তেজিত অধীর চোখমুখ দেখে জিগেস করলেন লেডি হেলেনা : কেন, বলো তো? কে তোমরা?

কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে।

কাপ্তেন গ্রান্টের ছেলেমেয়ে!

হ্যাঁ। মেয়েটি প্রায় যেন ফিশফিশ করে কথাটা বললে, আমার নাম মেরি, আর এ আমার ভাই, রবার্ট।

রবার্ট বললে, আমরা টাইমস-এ একটা বিজ্ঞাপন দেখেছি-কেউ যদি ত্রিমাস্তুল মানোয়ারি জাহাজ ব্রিটানিয়ার কোনো খোঁজ নিতে চায় তাহলে যেন এখানে এসে হিজ লর্ডশিপের

সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু এসে শুনি তিনি এখানে নেই, লণ্ডন গেছেন। অথচ বিজ্ঞাপনে ব্রিটানিয়া জাহাজের নাম দেখে আমাদের আর তর সয়নি-

আমরা আগে থেকে চিঠি লিখে দেখা করবার জন্যে কোনো সময় ঠিক করে আসিনি, হিজ লর্ডশিপ তো আর জানতেন না আমরা আসবো- মেরি বললে, কিন্তু বাবার জাহাজের নাম দেখেই আমাদের এমন অস্থির লাগলো যে আমরা কোনো নিয়মকানুনের ধার না-ধরেই ছুটে এসেছি-

লেডি হেলেনা তাদের আশ্বস্ত করলেন। না-না, সেজন্যে ভেবো না। আসলে লর্ড গ্লেনারভন ব্রিটানিয়া সম্বন্ধে কথা বলতেই লন্ডনে নৌবাহিনীর সদর দফতরে গেছেন। তারপর লেডি হেলেনা তাদের এক-এক করে খুলে বললেন কেমন করে হাঙরের পেটে বোতলটা পাওয়া গেছে, আর বোতলের ভেতরে তিনটে ছোট্ট পার্চমেন্ট-তাতেই ব্রিটানিয়ার খবর ছিলো। লর্ড গ্লেনারভন কালকেই ফিরে আসবেন। তোমরা বরং এখানেই থেকে যাও-কোনো ফর্মালিটি নেই-কাল লর্ড এডওয়ার্ড ফিরে এলেই তোমাদের সঙ্গে কথা হবে-লন্ডনে তিনি কী জানতে পারবেন, তা আমিও জানি না, তাই আমিও তার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

লর্ড এডওয়ার্ডকে ম্যালকম কাপ্প-এ না-পেয়ে ভাইবোনে যেন একটু চুপসেই গিয়েছিলো। লেডি হেলেনার সদয় ব্যবহারে তারা রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারা রাতটা কেব্লাতেই কাটাতে রাজি হলো। বিশেষ করে লেডি হেলেনা যখন বললেন যে তিনি কাপ্পেন গ্রান্ট সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না, ভালোই হলো, এই ফাঁকে তাদের কাছ থেকে তার সম্বন্ধে সব জরুরি কথা জেনে নিতে পারবেন। তিনি অবশ্য সব কথা খুলে বলেননি

তাদের কাছে, ব্রিটানিয়া যে জলে ডুবে গিয়েছে, কাণ্ডেন গ্রান্ট যে বিদেশ-বিভূয়ে ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছেন-এ-সব কথা বলে তিনি ভাইবোনকে ঘাবড়ে দিতে চাননি।

সত্যি-বলতে রবার্ট আর মেরি বাবার কথা বলবার জন্যে যেন উদ্ধীর্ষ হয়েই ছিলো। যেন তাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে তারা মনের বোঝা হালকা করে নেবার সুযোগ পেয়েই বর্তে গিয়েছে। একটু বিশ্রামের পর, খাবার-টেবিলে বসে ভাইবোনে তাকে কাণ্ডেন গ্রান্ট কথা শোনাতে।

বেচারারা! বাবার কথা বলতে-বলতে তাদের যেন চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছিলো। ছেলেবেলাতেই তারা মাকে হারিয়েছিলো। তারপর তাদের হারাতে হলো বাবাকেও।

কাণ্ডেন গ্রান্ট ডাকারুকো বেরোয়া মানুষ। কিন্তু নিছক দুর্দান্ত অ্যাডভেনচারে বেরুনোই নয়, তার চোখে ছিলো স্বাধীন স্কটল্যান্ডের স্বপ্ন। স্কটল্যান্ড যদি স্বাধীন না-ই হয়, অন্তত সে যদি কোথাও উপনিবেশ স্থাপন করতে পারে, তাহলেও হয়। সেই স্বপ্ন ছিলো বলেই একদিন তিনি নিজের সব সম্বল দিয়ে মানোয়ারি জাহাজ ব্রিটানিয়ানিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে বেরিয়ে পড়েছিলেন-কোনো নতুন দ্বীপ খুঁজে বার করে সেখানে একটা উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্যে। ছেলেমেয়েকে রেখে গিয়েছিলেন এক আত্মীয়র কাছে-ইচ্ছে ছিলো, নতুন দ্বীপে বসবাসের ব্যবস্থা করে ফিরে এসে একদিন তাদের সঙ্গে নিয়ে আবার পাড়ি জমাবেন। কিন্তু একদিন খবর এলো, ব্রিটানিয়া জাহাজের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।-হয় সে-জাহাজ ডুবে গিয়েছে, নয়তো এমন-কোনো দুর্বিপাকে পড়েছে যা মৃত্যুরই শামিল-কিংবা হয়তে পড়েছেন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর কোনো পরিস্থিতিতে।

মেরির বয়েস তখন মাত্র চৌদ্দ, রবার্ট আরো ছোটো। এমন সময় সেই বৃদ্ধা আত্মীয়ও মারা গেলেন। তারপর থেকে ছোটোভাইটিকে সে সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আগলে রেখেছে, তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, তাকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছে। দু-বছর ধরে কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ না-পেয়ে সে ধরেই নিয়েছিলো যে বাবা মারা গেছেন। এখন, কাগজে বিজ্ঞাপনটা পড়েই তার মধ্যে এক নতুন আশা জেগে উঠেছে। এক মুহূর্তও দেরি না-করে ছুটে এসেছে লর্ড গ্লেনারভনের কাছে। বাবা তাহলে মারা যাননি-নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

লেডি হেলেনা অবিশ্যি তাদের কাছে নিজের আশঙ্কার কথা খুলে বললেন না। প্রথমত, দু-বছর আগে সাহায্য চেয়ে এই বোতল জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কাপ্তেন গ্রান্ট যদি তখন দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হয়ে থাকেন, তাহলে এখনও বেঁচে আছেন কি না কে জানে। তাছাড়া তারা তো এটা ঠিক করে জানেন না কাপ্তেন গ্রান্ট সত্যি-বলতে কোথায় বন্দী হয়ে আছেন। অন্ধরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে একটা আঁরা জানেন, দ্রাঘিমা রেখা যে কী, সেটার জন্যে তাঁদেরও তো অন্ধকারে হাড়ে বেড়াতে হবে। তাছাড়া লর্ড এডওয়ার্ডের ফিরে আসতে দেরি দেখে এটাই ভয় হয় যে নৌদফতর ব্যাপারটাকে কোনো পাত্রাই দেয়নি। তারা হয়তো কোনো সাহায্য করতে চাইবে না।

ভাইবোনকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে লেডি হেলেনা মেজর ম্যাকন্যাসের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বলেছিলেন। মেজর ম্যাকন্যাসের মনে হচ্ছিলো লেডি হেলেনার আশঙ্কা হয়তো অমূলক নয়-নৌদফতর হয়তো ঐ হারানো জাহাজের সন্ধানে কাউকেই পাঠাতে রাজি হবে না। কিন্তু মেরির দৃঢ়তায় তিনি প্রায় মুগ্ধই হয়ে গেলেন। এইটুকু মেয়ে

একটুও ভেঙে পড়েনি-সব দুর্বিপাকের মধ্যেও ছোটোভাইটির দেখাশুননা করে এসেছে। এটা মানতেই হয় যে মনের জোর আছে মেয়েটির। তবে সবসময়ে তো আর শুধু মনের জোরে হয় না, পরিস্থিতি যদি প্রতিকূল হয় তাহলে মনের জোর তখন হয়তো ভেঙে পড়তে দেয় না-শুধু প্রতীক্ষা করতে বলে কখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে। এতদিন মেরি ধরে নিয়েছিলো যে তার বাবা বেঁচে নেই, সে নিজেই এক মনের জোরে সব দুর্বিপাকের মধ্যে ছোটোভাইটির দেখাশুননা করার দায়িত্ব পালন করছিলো। এখন সে বিজ্ঞাপন দেখে আশা করে ছুটে এসেছিলো, এমনকী আজ লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা না-হলেও এই আশা আছে যে কাল দেখা হবেই, কাল বাবার সব খবর জানতে পাবে-অথচ লর্ড এডওয়ার্ড সম্ভবত লণ্ডন থেকে কোনো আশার খবর নিয়েই ফিরবেন না। মেজর ম্যাকন্যাসের সঙ্গে এই নিয়েই কথা বলছিলেন লেডি হেলেনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না এই অবস্থায় কী তার করণীয়। তবে এটা অনুমান করতে দেরি হয় না যে যতদিন রবার্ট আর মেরি মেনে নিয়েছিলো যে কাণ্ডে গ্রান্টের ফিরে আসার কোনো আশাই নেই ততদিন অন্তত দুঃখকষ্ট মেনে নিয়েই একরকম চলছিলো, অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো তাতে, কিন্তু এখন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো একবার আশা জেগে উঠেই যদি মিলিয়ে যায় তখন হয়তো তাদের কচি মনে আশাভঙ্গের আঘাত আরো-তীব্র হয়ে পড়বে।

যতটা আশা করে এসেছিলো, ততটা সম্ভবত আর ছিলো না বলেই মেরি নিশ্চয়ই সকালবেলায় একটু আড়ষ্ট ও সংকুচিত বোধ করছিলো; আর সেই অস্বস্তির জন্যেই, লেডি হেলেনা আর মেজর ম্যাকন্যাস তাদের যতই আপ্যায়ন করার চেষ্টা করুন না কেন, তারা একটু দূরে-দূরেই সরে থাকছিলো। সেইজন্যেই লর্ড এডওয়ার্ড যখন জুড়ি-

গাড়ি চড়ে স্টেশন থেকে চৌদুনে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে এলেন, মেরি আর রবার্ট তখন ছিলো বাগানে।

লর্ড এডওয়ার্ড কোনোদিকে না-তাকিয়ে হনহন করে সটান চলে গেলেন লেডি হেলেনার কাছে। ইংরেজ সরকারের বানিয়া মনোভঙ্গিতে তিনি বিচলিত; আরো বিচলিত এই কথা ভেবে যে মুখে থ্রেটব্রিটেন থ্রেটব্রিটেন করে চাঁচালেও ইংরেজরা সত্যি-সত্যি স্কটিশ, আইরিশ বা ওয়েবাসীদের মানুষ বলেই যে মনে করে না, আরো-একবার হাতে-নাতে তার প্রমাণ পেয়ে গিয়েছেন তিনি লগুনে। বিস্তর যুক্তি সাজিয়েও নৌদফতরের কর্তাদের তিনি এ-বিষয়ে আদৌ বোঝাতেই পারেননি, যে হারানো মানোয়ারি জাহাজ ব্রিটানিয়ার সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া তাদের আশু কর্তব্য।

তার মুখচোখের ভাব দেখেই লেডি হেলেনার বুঝতে মোটেই দেরি হয়নি যে লর্ড এডওয়ার্ডের লগুনসফর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে-শুধু তা-ই নয়, কি-রকম যেন অপমানিত বোধ করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড। গ্লেনারভন যখন উত্তেজিত স্বরে বললেন, খামকাই গিয়েছিলুম নৌ-দফতরে-কোনো কাজই হয়নি, লেডি হেলেনা তখন আদৌ বিস্মিত হননি। বরং এই আশঙ্কা নিয়েই যে কাল রাতে মেজর ম্যাকন্যাব্স আর তিনি বলাবলি করেছিলেন, এ-কথা তার মনে পড়ে গেলো।

তাদের মতে ব্রিটানিয়ার সন্ধানে বেরুনোটা হবে বুনোহাঁসের পেছনে ছোটা, আগের কথার জের ধরেই বললে লর্ড এডওয়ার্ড।

এদিকে জুড়িগাড়ি এসে থেমেছে, গটগট করে একজন সে-গাড়ি থেকে নেমে লিভিংরুমের দিকে চলে গেছেন, তাকে দেখেই অনুচর-পরিচরেরা সেলাম ঠুকেছে-এইসব লক্ষ করে মেরি আর রবার্ট বুঝতে পেরেছিলো যে ইনিই লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন। তারাও, তাই, তার পেছন-পেছন লিভিংরুমে চলে এসেছিলো। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তারা শুনতে পেলো লর্ড এডওয়ার্ড বলছেন :

হাজারটা ফ্যাকড়া, হাজারটা ওজর, হাজারটা আপত্তি সরকারের। দু-বছর আগে যে-জাহাজ ডুবেছে-

ডুবেছে বলে আমরা এখনও সঠিক জানি না, লেডি হেলেনা বললেন, বরং বলতে পারি দু-বছর আগে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে-

হ্যাঁ, আমিও তা-ই বলতে চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু তাদের বক্তব্য : ডুবুক বা হারিয়ে যাক-দু-বছর আগে যা ঘটেছে, এতদিন পরে কেউ খামকা এত টাকা খরচ করে তার সন্ধানে যায়! তাছাড়া তাদের মতে ঐ তিনটে পার্চমেন্টই অসম্পূর্ণ-পুরো হদিশ কোনো পার্চমেন্টেই দেয়া নেই। কিন্তু, আসল কথা কি জানো, মাত্র তিনজনের জন্যে-সে তিনজনও তো পুরোমানুষ নয়, নেহাৎই স্কট-একটা আস্ত গোটা জাহাজ তারা কিছুতেই পাঠাবে না। এরা যে শুধু বানিয়া, শুধু মুনাফাই দ্যাখে-তা নয়-এরা নিজেদের ছাড়া আর-কাউকেই ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। ||||| লর্ড এডওয়ার্ড রাগের স্বরে তেড়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সরকারের ফয়সালা শুনে তক্ষুনি মেরি আর রবার্ট নিজেদের আর সামলে রাখতে না-পেরে অস্ফুট স্বরে আত্ননাদ করে উঠেছে :বাবা! বাবা! যেন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়েছে। কাণ্ডন গ্রান্টের।

লর্ড এডওয়ার্ড এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে খেয়ালই করেননি কখন এই দুটি অচেনা কিশোর-কিশোরী এসে তার কথা শুনতে লেগেছে। হঠাৎ এই অস্ফুট আত্নাদ শুনে অবাক হয়ে তিনি জিগেস করলেন, এরা কে? তারপর সরাসরি তাদেরই তিনি জিগেস করলেন : বাবা! কে তোমাদের বাবা?

এবার লেডি হেলেনা সব কথা বুঝিয়ে দিলেন তার স্বামীকে। যেমন করে কাণ্ডন গ্রান্টের এই ছেলেমেয়ে দুটি খবরকাগজে বিজ্ঞাপন পড়ে তক্ষুনি, তড়িঘড়ি, তার সঙ্গে দেখা করতে চলে এসেছে, বিজ্ঞাপনের বয়ান থেকে কতটা আশা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছিলো নতুন করে, ভেবেছিলো অবশেষে বুঝি সত্যি হৃদিশ মিলেছে কাণ্ডন গ্রান্টের- আর এখন তারা তার প্রতিবেদন শুনে কতটাই মর্মাহত হয়ে পড়েছে! এড, এরা তোমার বিজ্ঞাপন পড়েই কাল এখানে চলে এসেছে। বলল, এখন এদের কী বলবে?

কিছুই বলার নেই, হেলেনা। এতক্ষণ তো সে-কথাই বলছিলুম। নৌদফতর কিছুতেই একজন হারিয়ে-যাওয়া স্কটের উদ্দেশে কোনো জাহাজ পাঠাবে না-

মেরির আত্মভিমান প্রখর। এই কচি বয়সেই নানা দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়েছে তাকে, দেখাশুনো করতে হয়েছে ছোটোভাইটির, অভিভাবকহীন অবস্থাতেও সে কোনোদিন দোরে-দোরে সাহায্য করে বেড়ায়নি। এখন পুরো ব্যাপারটা শুনে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে সে যতটাই রেগে যাক, মুখে সে-কথা প্রকাশ না-করে শুধু বললে : তাহলে আমরা চলি। বাবার খবর যতটুকু পাওয়া গেছে, সেটাই অনেক। অ্যাডিন বাদে অন্তত নতুন করে একটা সম্ভবনা জেগেছে যে তিনি বেঁচে

আছেন। হয়তো একদিন নিজেই কোনো উপায় করে ফিরে আসবেন। এই বলে রবার্টের হাত ধরে সে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালে, বললে, চল, রবার্ট, মিথ্যে মনথারাপ করিসনে। উপায় একটা বার করবোই।

লেডি হেলেনা কাল রাত থেকেই এই অনাথ ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন। এবার একটু শঙ্কিতই হলেন তিনি, বিচলিত হয়ে এরা যদি ভয়ংকর-কিছু করে বসে। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তোমরা আবার এম্মুনি কোথায় যাবে?

দাঁতে দাঁত চেপে মেরি বললে : শেষ ভরসা একজনই। যে-করেই হোক মহারানীর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলবো। যদি কোনোভাবে তাঁর মনে দয়া জাগাতে পারি তাহলে হয়তো তিনি কোনো-একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

অন্যরা যা জানতো, তা মেরিও জানতো। এত সহজে রানীর দেখা পাওয়া যায় না। এতগুলো বাধা আসবে আমলা বা অনুচরদের কাছ থেকে যে কোনোদিনই হয়তো রানীর কাছে গিয়ে পৌঁছানোই যাবে না। কোনো উটকো যে-সে লোককে রানীর সঙ্গে দেখা করতে দেয়াই হয় না।

মেরি, শোনো, যেয়ো না, লেডি হেলেনার গলার স্বর পালটে গিয়েছে। এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার কিছু হয়নি। রানীর বদলে আমরা নিজেরাই হয়তো কোনো-একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। তারপর লর্ড এডওয়ার্ডের দিকে ফিরে বললেন :এডওয়ার্ড, ইংরেজরা যদি আমাদের মানুষ বলেই মনে না-করে, আমরা তবে খামকা তাদের কৃপার জন্যে অপেক্ষা করবো কেন। তুমি তো ডানকান জাহাজ বানিয়েছে আমাদের প্রমোদভ্রমণের

জন্যে। মজবুত, আধুনিক জাহাজ, বাষ্পে চলে। কিন্তু প্রমোদভ্রমণ তো আর অকারণে যেখানে-সেখানে ভেসে-যাওয়া নয়, জাহাজ যদি জলে ভাসানো হয় তাহলে তার একটা গন্তব্য থাকে। পৃথিবীর সেরা দৌড়বীরের চাইতেও সেই লোকটাই দৌড়ের বাজিতে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছিলো যে ম্যারাথনে দৌড়েছিলো-কেননা তার দৌড়টা নিছক দৌড় ছিলো না, ছিলো তার দেশকে বাঁচাবার উপায়। আমাদের প্রমোদভ্রমণও সার্থক হবে যদি তার সামনে একটা লক্ষ্য থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে।

তুমি কি বলতে চাচ্ছে, হেলেনা? আমি যা মনে-মনে ভেবেছি তা-ই কি তোমারও মনের কথা? লর্ড এডওয়ার্ড প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, এডওয়ার্ড। আমি সত্যিকার সুখী হবো, সত্যিকার আনন্দ পাবো যদি আমাদের প্রমোদভ্রমণ শেষপর্যন্ত আর নিছক-প্রমোদভ্রমণ না-থাকে। আমরা তো এই উপলক্ষে ডানকান নিয়ে কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজেই বেরিয়ে পড়তে পারি-সাগরপাড়ি যদি দিতেই হয়, তবে সামনে এই লক্ষ্যটা রাখলেই হয়। দরকার হলে সাতসমুদ্র তেরোনদী পাড়ি দিয়েই না-হয় আমরা কাপ্তেন গ্রান্টকে খুঁজে বার করে নিয়ে আসবো।

লর্ড এডওয়ার্ড আনন্দে যেন ফেটেই পড়বেন। জানো, হেলেনা, লগুনে বসে-বসে আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছিলুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনি তোমাকে একা ফেলে রেখে এত দূর পথ পাড়ি দেয়া ঠিক হবে কি না। তুমিও যে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে, সেটা মোটেই ভাবিনি। জাহাজ যত আধুনিকই হোক বা মজবুতই হোক, দিনের পর দিন অজানা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার মধ্যে ধকলও আছে, আবার একঘেয়েমিও আছে। দিনের পর দিন চারপাশে জল দেখতে সকলের সমান ভালো লাগে না কি না!

মেরি আর রবার্ট গিয়ে ততক্ষণে লেডি হেলেনাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমরাও সঙ্গে যাবো, একসঙ্গেই চৌচিয়ে উঠেছে তারা, আপনারা যদি বাবার খোঁজে জাহাজ নিয়ে দূর সাগরে পাড়ি জমান, তাহলে আমরাও সঙ্গে যাবো

নিশ্চয়ই যাবে, লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, ডানকানে বিস্তর জায়গা আছে। তাছাড়া হেলেনারও ভালো লাগবে তোমাদের সঙ্গী পেলে-অন্তত একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচবে।

লেডি হেলেনাও সায় দিলেন : তাছাড়া তাড়াটা তত তোমাদেরই বেশি। তোমরা সারাক্ষণ বসে-বসে অদ্ভুত সব কথা ভাববে, ভাববে ডানকান জাহাজের কী হলো, বাবার দেখা পেলো কিনা-তার চাইতে সঙ্গেই চলো, একই সঙ্গে আমরা খুঁজে দেখবো কাপ্তেন গ্রান্ট এখন কোথায় আছেন।

তোমাদের কোনো অসুবিধেই হবে না। ডানকান নেহাৎ ছোটো জাহাজ নয়-দুশো দশ টনের জাহাজ। এর চাইতেও ছোটো-ছছোটো শাবেক আমলের জাহাজ নিয়ে ত্রিস্তোবাল কোলোন সম্পূর্ণ অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন-কোথায় যাবেন, জানতেনই না। আমাদের তো তবু খানিকটা আন্দাজ আছে-অন্তত এটা তো জানি কত অক্ষরেখায় যেতে হবে।

.

চার
পাড়ি

একবার যখন ঠিক হয়ে গেছে যে ডানকানজাহাজই ব্রিটানিয়াআর কাপ্তেন গ্রান্টের সন্ধানে দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রে পাড়ি দেবে, তখন আর একমুহূর্তও তর সইছিলো না কারু। কাপ্তেন ম্যাঙ্গসকে ডেকে অভিযানের কথা বলতেই তিনি তো একপায়ে খাড়া; সমুদ্র যারা ভালোবাসে, ডাঙায় থাকতে তাদের যে আদপেই ভালো লাগে না, সারাক্ষণ যে তারা উশখুশ করে কবে আবার জলে ভাসতে পারবে, কাপ্তেন ম্যাঙ্গই তার সশরীর প্রমাণ। এখানে অবশ্য আরো-একটা কথা আছে। ইংরেজদের নৌদফতরকে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে হবে তাদের সাহায্য ছাড়াই কেউ দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারে-শুধু তা-ই নয়, কোনো দায়িত্ব নিয়ে বেরুলে স্কটরা ছিনেজোঁকের মতো লেগে থেকে সে-দায়িত্ব পালনও করতে পারে। অন্তত লর্ড গ্লেনারভনের জেদও যে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাছাড়া আছে মেরি আর রবার্ট-আর-কিছুর জন্যেও যদি না-হয় অন্তত তাদের কথা ভেবেও চট করে অভিযানে বেরিয়ে-পড়া উচিত।

কিন্তু এত-বড়ো একটা অভিযানে বেরুতে গেলে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই তো আর হুট করে রওনা হওয়া যায় না। কাপ্তেন ম্যাঙ্গসের ওপরেই ভার পড়লো ডানকানকে গ্লাসগোর বন্দরে নিয়ে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযানের জন্যে যা করা দরকার সবকিছুই নিজে তদারক করে করবার।

এটা ঠিক যে ডানকান বাষ্পে চলে। কিন্তু ফোরকাসুলের সামনে বড়ো মাস্তুলটার ডগায় পাল খাটাবারও ব্যবস্থা আছে-সে কিন্তু নিছকই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নয়; হাওয়া যদি তোড়ে বয়, অনুকূল থাকে, তাহলে ডানকান পালতোলা জাহাজ হিসেবেই চলবে, আর অন্য সময় তো আছেই তার ১৬০ অশ্বশক্তির এনজিন। পুরোনোদিনের পালের জাহাজের

সঙ্গে তার এখানেই তফাৎ-তাকে সবসময় অনুকূল হাওয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে না। অন্য সময় সে বাষ্পের জোরেই ঘন্টায় সতেরো সামুদ্রিক মাইল হিশেবে চলতে পারবে। কিন্তু সেই বাষ্প তৈরি করবার জন্য চাই কয়লা, বিস্তর কয়লা-আর এই দূরপাল্লার পাড়িতে সঙ্গে যতটা-সম্ভব কয়লা নিয়ে-যাওয়াই ভালো, না হলে মাঝপথে হঠাৎ কয়লার দরকার হলে সব জায়গায় তো তা নাও মিলতে পারে। অপরিপাক রসদও চাই সঙ্গে, যাতে পথে খাবারের অভাবে ভুগতে না-হয়। তারপর জাহাজের সামনে আত্মরক্ষার খাতিরে একটা কামানও বসাতে হবে-পথে জলদস্যুদের পাল্লায় পড়লে যাতে সামলানো যায় ।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স প্রায় যেন জলে-জলেই মানুষ, কিন্তু সে তো সাধারণ খালাশিও। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানেন, উদ্ভাবনীশক্তি আছে, আছে অফুরন্ত আর অদম্য প্রাণশক্তি আর সাহস, উপস্থিতবুদ্ধির জোরে কোনো মুশকিলে পড়লে সেটা কাটান দেবার ক্ষমতা রাখেন। ম্যালকম কালেই তিনি মানুষ হয়েছেন, গ্লেনারভনদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই নৌবিদ্যায় তার হাতেখড়ি হয়েছিলো, এখন তিনি অভিজ্ঞতার জোরে বলীয়ান হয়ে উঠেছেন। আর তারই সুযোগ্য সহযোগী টম অস্টিন-দক্ষ ও কুশলী নাবিক, কালে তিনিও কোনো জাহাজের পরিচালনভার নিজের হাতে পাবেন। আর তারা দুজনে মিলেই গ্লাসগোর ডকইয়ার্ড থেকে বাছাই করে-করে আরো পঁচিশজন মাল্লাকে ডানকান জাহাজে কাজ দিয়েছেন। দক্ষতা আর পরিশ্রমের ক্ষমতা ছাড়া তাদের সকলেরই আরো একটা পরিচয় আছে-তারা সবাই ডামবারটনের মানুষ, গ্লেনারভনদের প্রতি তাদের আনুগত্য অসীম।

প্রমোদভ্রমণের উপযোগী করে আগেই ভালো করে সবচেয়ে-বড়ো ক্যাবিনটা সাজানো হয়েছিলো, কিন্তু তখন তো আর জানা ছিলো না তাদের এত দীর্ঘ কোনো অভিযানে বেরুতে হবে। তাই এখন তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখে দীর্ঘদিনের উপযোগী করেই সাজানো হলো মাস্টার-ক্যাবিন-সত্যি-বলতে বিয়ের পর এই-প্রথম লর্ড এডওয়ার্ড তার নবপরিণীতা পত্নী লেডি হেলেনাকে নিয়ে দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাবেন-এ তো আর ডানকান জাহাজের নিছক কোনো মহড়া নয় কাছেপিঠের সমুদ্রে। তাছাড়া রবার্ট যে কতটা চৌকশ ছেলে সে তো আর গোড়ায় বোঝা যায়নি, কিন্তু পাড়ি জমাবার আগেই দেখা গেলো কাণ্ডেন ম্যাঙ্গসের সঙ্গে তার ভারি খাতির হয়ে গিয়েছে, ছায়ার মতো সে কাণ্ডেন ম্যাঙ্গসের গেছব-পেছন থাকে; সে-যে কাণ্ডেন গ্রাস্টের ছেলে, গোড়ায় এটাই ছিলো তার প্রতি কাণ্ডেন ম্যাঙ্গসের অতিরিক্ত একটা আকর্ষণের কারণ, কিন্তু পরে দেখা গেলো এই অভিযানে শেষপর্যন্ত রবার্টেও সমুদ্রে হাতেখড়ি হবে, তারও রক্তে তার বাবার মতোই অ্যাডভেনচারের নেশা আছে যে।

এ ছাড়া সঙ্গে যাবেন মেজর মাকসও। বছর পঞ্চাশ বয়স, এমনিতে স্বল্পবাক কিন্তু কৌতুকবোধ প্রখর, অনেক অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া মানুষ মেজর, জানেন, যে বিপদের সময় অহেতুক উত্তেজনা বরং ক্ষতিই করে-তখনই বরং মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। লর্ড এডওয়ার্ডের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু শুধু সেইজন্যেই নয়, অ্যাডভেনচারের সম্ভাবনা দেখেই তিনি ডানকান জাহাজে এসে উঠেছেন-তাছাড়া মেরি আর রবার্টের প্রতি তার কেমন একটা মায়াও জন্মে গিয়েছিলো। এই দুর্ধর্ষ অকুতোভয় মানুষটার মধ্যে ভেতরে কোথাও যে স্নেহের একটা অফুরন্ত প্রস্রবণ ছিলো, এটা তারও একটা প্রমাণ-যদিও তিনি নিজে সে-কথা ঠিক জানেন না-তিনি ভেবেছেন ডানকানের লম্বা পাড়িতে তিনি যোগ দেবেন নিছক একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পেতে।

এমনিতে হয়তো কোন জাহাজ এলো, কোন জাহাজ গেলো-তাতে লোকের কিছুই এসে-যেতো না। কিন্তু ডানকান যে-উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে চাচ্ছে লোকের মুখে-মুখেই সে-কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাই যখন ২৫শে আগস্ট ০ ঘন্টায়, অর্থাৎ ২৪ আর ২৫-এর মাঝরাতে, ঠিক বারোটার সময়, জাহাজ ছাড়লো, গ্লাসগোর লোক ঝেটিয়ে এসেছিলো জাহাজ দেখতে। চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠলো, ঝগঝগ আওয়াজ উঠলো এনজিনে, চাকাগুলো পাক খেলো, আর ডানকান বন্দর থেকে নোঙর তুললো। সকাল ছটার মধ্যেই জাহাজ গিয়ে পড়লো বারদরিয়ায়। ডানকানের লম্বা পাড়ি শুরু হয়ে গেলো, কতদিনের জন্যে কে জানে।

.

পাঁচ

ভ্রান্তিবিলাস ও অন্যমনস্ক অধ্যাপক

ডানকান যখন ছেড়েছিলো, সবাই ভেবেছিলো এখানে স্কটল্যান্ডের কাছে সমুদ্র নিত্তরঙ্গ থাকবে, আচমকা এখন ঝড়বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। ঝড়তুফান হয়তো সত্যিই ওঠেনি, কিন্তু হাওয়া ছিলো প্রখর, সমুদ্র ছিলো ক্ষুধা ও চঞ্চল, আর সমুদ্রযাত্রায় ততটা অভ্যস্ত নন বলেই প্রথম দিনে মেরি বা লেডি হেলেনা কেউই নিজেদের ক্যাবিন থেকে বেরোননি। দ্বিতীয় দিনে যখন হাওয়ার তোড় কমলো, সমুদ্র শান্ত হয়ে এলো, ঢেউয়ের দোলাও কমে এলো। সমুদ্র শান্ত হয়ে যেতেই যাত্রীরা ডেকে এসে জড়ো হলেন; ঠিক যেন পূর্ব দিগন্তে সমুদ্রের মধ্য থেকেই উঠে এলো সূর্য, আকাশের গায়ে একটা লালের

ছোপ, আর সেখান থেকে রৌদ্রের ছটা বেরিয়ে আসছে, ডানকানের শাদা পালে এসে পড়েছে রোদুর। স্নিগ্ধ একটা হাওয়া দিচ্ছে।

কারুই যেন আর তর সইছিলো না। চট করে যদি গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যেতো, তাহলেই যেন খুশি হতে সবাই। কিন্তু ইওরোপ থেকে তাদের যেতে হবে দক্ষিণ আমেরিকায়, নতুন মহাদেশের তটে-১৪৯২ সালে ক্রিস্টোবাল কোলোন (বা ক্রিস্টোফোরো কোলোম্বো বা ক্রিস্টফার কলম্বাস) খুব-তো আর চট করে যেতে পারেননি নতুন মহাদেশে। তাদের হয়তো অত সময় লাগবে না, কিন্তু এ তো আর ইওরোপের এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যাওয়া নয়।

লেডি হেলেনা যেন স্পষ্ট করে মেরির জিজ্ঞাসাটাকেই উচ্চারণ করলেন : আমাদের গিয়ে পৌঁছুতে কত সময় লাগবে, এড?

ম্যাঙ্গ, আমরা কত জোরে যাচ্ছি বলো তো? ঘন্টায় সতেরো সামুদ্রিক মাইল। যদি চলার এই গতি বজায় থাকে, তাহলে আমরা পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই কেপ হর্ন পৌঁছে যাব। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন।

কেপ হর্ন? ভারি অদ্ভুত নাম তো?

কেপ হর্ন আসলে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম বিন্দু। ৫৫°৫৯ দক্ষিণ। তিয়ে দেল ফুয়েগো হর্ন আইল্যান্ডেরই অংশ, মূল ডাঙা হচ্ছে দক্ষিণ চিলে, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন, শিঙের মতো দেখতে বলেই অন্তরীপটার নাম কেপ হর্ন। সেখানে পৌঁছুবার পরই খোঁজখবর নিয়ে আমাদের পরবর্তী সূচি তৈরি করতে হবে।

পাতাগোনিয়া যেতে হলে ঐ দক্ষিণতম বিন্দু পেরুতেই হবে ডানকানকে। পাঁচ সপ্তাহ অবশ্য খুব বেশি নয়-দেখতে-না-দেখতেই এই দিনগুলো কেটে যাবে। লর্ড এডওয়ার্ড ঘুরে মেরির দিকে তাকিয়ে জিগেস করলেন, মিস থান্ট, ডানকান জাহাজকে কেমন লাগছে?

ডানকান যদি তাকে আর রবার্টকে না-নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়তো, তাহলে মেরির তা মোটেই ভালো লাগতো না। এখন তার মনে হচ্ছে কাপ্তেন থান্টের সন্ধানে যে-অভিযান রওনা হয়েছে, তাতে তারও মস্ত একটা ভূমিকা আছে। সে উদ্ভাসিত মুখে বললে দারুণ! চমৎকার!

রবার্টের কী খবর? জিগেস করলেন লর্ড এডওয়ার্ড। কই? তাকে তো দেখছি না?

মেরি কিছু বলবার আগেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স হেসে বললেন, রবার্ট তো আমার প্রধান সহকারী হয়ে উঠেছে। এই হয়তো সে আছে এনজিনের সামনে, পরক্ষণেই ফোরক-এ বা মাস্তুলের ডগায়। ঐ তো, তাকিয়ে দেখুন না বড়ো মাস্তুলটার দিকে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলসের কথা শুনে সবাই মাস্তুলটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, মাস্তুলের ওপরে উঠে রবার্ট দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখেই, মেরির বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। কী ডাকাবুকো ছেলেই না হয়েছে সে, প্রাণে একটুও ভয়ডর নেই। জাহাজে উঠতে পেরে সে যেন ফুর্তিতে ডগমগ করছে। কিন্তু মেরি আঁৎকে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ! পড়ে যাবে যে!

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স কিন্তু তখনও হাসছেন। বললেন, মিথ্যে ভয় পাবেন না, মিস গ্রান্ট। দু-দিনেই আপনার ভাইকে ওস্তাদ নাবিক বানিয়ে দেবো-দেখে এমনকী কাপ্তেন গ্রান্টেরও তাক লেগে যাবে।

কিন্তু ওভাবে অকারণে—

সে-ই তো ভালো। জাহাজ যখন দুলছে না তখনই তো তরতর করে ওপরে ওঠা-নামা অভ্যাস করতে হবে, যাতে পরে দরকারের সময় আচমকা এ-কাজ করতে গিয়ে ভয় না-পায় বা গুবলেট করে না-ফ্যালে। দেখবেন মিস গ্রান্ট, আপনার বাবা বরং তার এইসব ওস্তাদি দেখে তারিফই করবেন।

আপনি যদি বলেন, মেরির গলা থেকে শঙ্কার ভাব তখনও দূর হয়নি। আপনার ওপরই কিন্তু ওর ভার রইলো।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আবার আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেন মেরিকে। কিছু ভাববেন, মিস গ্রান্ট। আমি সবসময় ওর ওপর কড়া নজর রাখবো।

লর্ড এডওয়ার্ড প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে বললেন, ম্যাঙ্গ, আমি বরং এই ফাঁকে এঁদের জাহাজটা ভালো করে দেখিয়ে আনি। তুমি ততক্ষণে স্টুয়ার্ডকে বলো আমাদের ছোটোহাজরির ব্যবস্থা করতে।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স ডেকের একপাশে রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সিগার টানছিলেন। একদিন নতুন মহাদেশ থেকেই তামাক এসেছিলো, আর এখন ইওরোপের অজস্র

লোকই এই চুরুট খাবার নেশায় আটকে গিয়েছে। তার মধ্যে কোনো চাঞ্চল্যই নেই। সম্ভবত মেজর ম্যাকন্যাব্স সকালবেলায় ছোটোহাজরির আগে কোনো বিষয় নিয়েই অস্থির হন না। কোনো লড়াইয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কী করেন, এ নিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড অনেক সময়ই ভাবতেন। মেজর ম্যাকন্যাব্স এর আগেই সারা জাহাজ ঘুরে দেখেছেন, ফলে ডানকান জাহাজ ঘুরে দেখবার জন্যে তার কোনো কৌতূহল ছিলো না। লর্ড গ্লেনারভন অন্যদের নিয়ে জাহাজের অন্যদিকে চলে গেলেন। মেজর ম্যাকন্যাব্স একা-একা দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে-ভাবতে আনমনে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ কাছেই কার পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দ্যাখেন অচেনা এক ভদ্রলোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলস, তার সহকারীরা, জাহাজে কাজ করতে এসেছে যে-সব মাঝিমাল্লা, তাদের প্রায় সবাইকেই মেজর ম্যাকন্যাব্স চেনেন। এটা ঠিক যে নতুন অনেককেই অভিযানের আগে ডানকান জাহাজে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই অচেনা ভদ্রলোক যে তাদের কেউ নয়, সে তার চেহারা বা পোশাক-আশাক দেখেই বোঝা যায়। খালাশির পোশাক পরা নেই তাঁর, তাছাড়া খুব হটাকটা গাট্টাগোটা পোড়খাওয়া লোকও নন তিনি। বরং ঢ্যাঙা রোগামতো এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় একটা সরু লম্বা পেরেকের ডগায় কেউ মস্ত-একটা মাথা গেঁথে দিয়েছে। মাথার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে এসেছে, ছুঁচলো চিবুক, চোখে পুরু পরকলার চশমা। ভদ্রলোক এখনও যেন ঘুমের ঘোরে থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, ঝকঝকে দিনের আলোয় চোখ কুঁচকে আলোটা যেন চোখে সহিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। চোখমুখে বুদ্ধির দীপ্তি। আর কেমন-একটা কৌতুকের ছোপ। মাথায় কানঢাকা টুপি, হলদে রঙের বুটজুতো পায়ে, কোমরে সেই রঙের চামড়ারই বেল্ট, গায়ে খয়েরি রঙের মখমলের জ্যাকেট, ট্রাউজার জোড়ার রঙও তা-ই-পকেটগুলোয় রাশি-রাশি কাগজপত্র, যেন একটা আস্ত

টেবিলের সব জিনিশপত্র কোট-প্যান্টের পকেটে এসে আশ্রয় নিয়েছে। গলা থেকে বুলছে একটা টেলিস্কোপ। ভদ্রলোক মেজরকে ঘিরে ধুপধাপ আওয়াজ করে একবার পাক খেয়ে নিলেন; ঐরই এই ধুপধাপ শব্দে মেজরের তন্ময়তা ভেঙেছিলো।

মেজর ম্যাকন্যাব্স একটু অবাক হলেও কোনো কথাই বললেন না-বা তার চোখমুখে বিস্ময়ের কোনো ছাপ দেখা দিলো না। অথচ এমনিতে তার বিস্মিত হবারই কথা ছিলো। তিনি যতদূর জানতেন তাতে তারা কয়েকজন ও মাঝিমাল্লারা ছাড়া ডানকান জাহাজে আর-কোনো যাত্রীরই যাবার কথা নয়। তবু মেজর ম্যাকন্যাব্স মুখ ফুটে এই অচেনা যাত্রীটির কোনো পরিচয়ই জানতে চাইলেন না। এই ঢ্যাঙা ভদ্রলোকটি কিন্তু জিজ্ঞাসু চোখে হাজারো কৌতূহল নিয়েই মেজর ম্যাকন্যাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মেজর ম্যাকন্যাব্স তাকে নিজে থেকে কোনো সম্ভাষণ করলেন না দেখে এই অচেনা আগন্তুকটি টেলিস্কো টেনে লম্বা করে দিগন্তের দিকে তাকালেন। তারপর টেলিস্কোপটা একটা ছড়ির মতো রেখে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ভদ্রলোক টাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেলেন। কারণ টেলিস্কোপ তার ভারে ততক্ষণে খোপের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তার কাণ্ড দেখে কেউ হয়তো এতক্ষণে হেসে ফেলতো, কিন্তু মেজর ম্যাকন্যাব্স তবু গায়ে পড়ে ভদ্রলোক সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই প্রকাশ করলেন না।

ঢ্যাঙা ভদ্রলোক উঠে পড়ে জ্যাকেটটা থেকে ধুলো ঝেড়ে টেলিস্কোপটা ফের গলায় বুলিয়ে দিয়ে নবাবিচালে হাঁক পাড়লেন। স্টুয়ার্ড! স্টুয়ার্ড!

ঠিক সেই সময়েই কাপ্তেন ম্যাঙ্গসের নির্দেশ অনুযায়ী স্টুয়ার্ড অলবিনেট সকলের ছোটোহাজরির ব্যবস্থা করতে ডাইনিংরুমে যাচ্ছিলো। হঠাৎ এমন হাঁক শুনে একটু থতমত খেয়ে ভদ্রলোকের সামনে এসে বললে : আপনি কি আমায় কিছু বলছেন?

আপনিই কি স্টুয়ার্ড?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

আমি ছ-নম্বর ক্যাবিনের যাত্রী।

ছ-নম্বর ক্যাবিন! স্টুয়ার্ড অলবিনেট এবার সত্যি হতভম্ব হয়ে পড়লো। ডানকান তো কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ নয়, তাতে আবার ছ-নম্বর ক্যাবিন বলে কী আছে?

হ্যাঁ। তা মঁসিয় স্টুয়ার্ড, আপনার নামটা আমি জানতে পারি? আমার আবার সারাক্ষণ স্টুয়ার্ড-স্টুয়ার্ড করে চাঁচাতে ভালো লাগে না।

অলবিনেট। অলবিনেট তখন সত্যি বুঝে উঠতে পারছিলো না কী বলবে। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকে কখনও এই যাত্রীটির কথা বলেননি।

তা মঁসিয় অলবিনেট, প্রায় দু-দিন আমার পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি। পারী থেকে গ্লাসগো অন্দি প্রায় ছুটেই এসেছি একটানা। চ্যানেল পেরুতে হলোক্যালে থেকে ডোভার, তারপর এখানে গ্লাসুগোতে। তা ছোটোহাজরি হবে কখন?

অলবিনেট ততক্ষণে তার হতচকিত দশা থেকে বেরুবার চেষ্টা করছে। বললে, নটার সময়, ডাইনিংরুমে।

ভদ্রলোক তাঁর অগুনতি পকেট হাড়াতে-হাড়াতে শেষে কোন-এক পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করে এনে অতীব মনোযোগ সহকারে সময়টা দেখলেন। সবে তো দেখছি আটটা বাজে! আরো-একটি ঘন্টা! তাহলে আমার ক্যাবিনে কিছু পানীয় আর খুচরো-কিছু বিস্কুট পাঠিয়ে দেবেন। খিদেয় আমার জঠর এখন চি-চি করছে। হ্যাঁ, আর, ভালো কথা-কাপ্তেন কোথায় এখন? কিংবা ফাস্টমেট? জাহাজ তো দেখছি চমৎকার চলেছে, পালে খোলা হাওয়া লাগিয়ে তোফা পাড়ি জমিয়েছে।

স্টুয়ার্ড ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না এই অচেনা অভ্যাগতটিকে নিয়ে সে কী করবে। আর তখনই কাপ্তেন ম্যাককে এদিকটায় আসতে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে। তার জানা নেই এই যাত্রীমহোদয় সত্যি কে কাপ্তেন নিশ্চয়ই জানেন। তাই সে পরিচয় করিয়ে দিলে ইনিই কাপ্তেন-।

কাপ্তেন? কাপ্তেন বার্টন, শেষ অব্দি তাহলে সাক্ষাৎ হলো আপনার সঙ্গে? চমৎকার। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারি খুশি হয়েছে-বলে হাতঝাঁকুনির জন্যে অচেনা যাত্রীটি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বার্টন? নিজের পিতৃদত্ত দীক্ষান্ত নামটিকে এভাবে আদ্যন্ত বদলে যেতে দেখে কাপ্তেন ম্যাকগল্‌স বেশ হকচকিয়েই গেলেন। অচেনা যাত্রীটি ততক্ষণে তার হাত ধরে ঝাঁকচ্ছেন, নানান গোলেমালে পরশু তো দেখাই হলো না। অবশেষে আজ সকালেই একেবারে

মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো। খুব ভালো লাগছে আমার। তা, কেমন লাগছে এই. এস. এস. স্কটিয়া জাহাজটাকে?

কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স আরো ভড়কে গিয়ে, যেন বিষম খেয়েই স্টুয়ার্ডের দিকে একবার তাকালেন। তারপর এই প্রথম তিনি সম্ভাষণ করলেন যাত্রীটিকে, এস. এস. স্কটিয়া মানে?

যে-জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিচ্ছেন, তারই নাম। কীরকম ছিমছাম ঝকঝকে জাহাজ, দেখেছেন? খাশা! ঠিক রাজহাঁসের মতো ভেসে চলেছে। আচ্ছা, বলুন ততা, আপনি কি সেই বিখ্যাত বার্টনের কেউ হন, যিনি আফ্রিকার নানা দুর্গম অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে অমন চমৎকার একখানা বই লিখেছেন আফ্রিকা সম্বন্ধে?

কিন্তু সার, আমি বার্টনের কেউ নই-বার্টন আমার নামই নয়।

তবে কি আপনি ফাস্টমেট মঁসিয় বার্ডনেস?

কাণ্ডেনের পেছন-পেছনই গল্প করতে-করতে আসছিলেন লর্ড এডওয়ার্ডরা। তাঁদের দেখেই সাময়িকভাবে কাণ্ডেনকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁদের দিকে প্রায় ছুটেই চলে গেলেন এই অদ্ভুত নবাগত যাত্রী। এঁরাও তবে এই জাহাজেরই যাত্রী? বেশ ভালো হলো। জমিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে-একঘেয়ে নিরেস লাগবে না যাত্রাটা। আসুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে নিই। লেডি হেলেনাকে সম্ভাষণ করলেন মাদমোয়াজেল, মেরিকে বললেন মাদাম, লর্ড এডওয়ার্ডকে বললেন সিয়-আর খুব করে সবাইকার হাত নেড়ে দিলেন।

প্রহসনটা হুড়মুড় করে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে এগুচ্ছে দেখে কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলস ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। তার এই হতভম্ব ভড়কে-যাওয়া দশা এখনও কাটেনি বটে, তবে তার মনে হয়েছে এবারে সমস্ত ব্যাপারটা মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভালো করে অনুধাবন করা যাক, কিন্তু সেটা তার সাধ্যে কুলোলে তো? যেই তিনি বলতে গেছেন, ইনি হলেন লেডি হেলেনা, আর উনি লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন, আগন্তুক অমনি বলে উঠেছেন, তাই নাকি? তা জাহাজে প্রথম আলাপেই অত নিখুঁতভাবে সহবৎ মেনে চলা যায় না। তবে স্কটিয়ার ওপর দু-দিনেই প্রথম আলাপের এই আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে উঠবে। তখন কি আর এ-সব তুচ্ছ আদবকায়দার কথা কেউ মনে রাখবে?

রকমসকম দেখে সকলেই তাজ্জব। শুধু যে-কথাটা প্রথমেই জিগেস করা উচিত ছিলো, সেই কথাটাই এবার জিগেস করলেন লর্ড এডওয়ার্ড-কার সঙ্গে আলাপ হলো জানতে পারি কি!

ও-হো, দুঃখিত। নিজের পরিচয়টাই তো এখনও দেয়া হয়নি। এই অধম পারী ভৌগোলিক সমিতির প্রধান সচিব, এবং বার্লিন, বম্বাই, লাইপজিক, লন্ডন, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, হীন, নিউইয়র্ক ভৌগোলিক সমিতির সদস্য জাক-য়েলিয়াস ফ্রাঁসোয়া মারি পাএওয়ল। আমি কিন্তু ইস্ট-ইনডিয়া ইনস্টিটিউটের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড এথনোগ্রাফিক্যাল সোসাইটিরও সদস্য। দুই দশক ধরে শুধু আরামকেদারায় বসেই ভূগোলের চর্চা করেছি-এবারে সশরীরে যাচ্ছি। ভারতবর্ষে, পদব্রজে ঘুরে-ঘুরে ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে।

জাক পাঞ্চয়লের নামটা শোনামাত্র লর্ড এডওয়ার্ডের মধ্যে একটা সম্বন্ধের ভাব জেগে উঠলো। তিনিও অবসর সময়ে এক-আধটু ভূগোলচর্চা করে থাকেন-আর তাইতেই বিভিন্ন জার্নালে নানা সময়ে জাক পাঞ্চয়লের নানাবিধ তত্ত্ব ও আবিষ্কারের খবর বেরিয়েছে, আর যে-রকম সম্মান দিয়ে সে-সব প্রতিবেদন বেরিয়েছে তাতে বোঝা যায় পণ্ডিতেরা জাক পাঞ্চয়লের বিদ্যাবত্তাকে যথেষ্টই সম্মান করে থাকেন। ডানকান জাহাজে যে এভাবে আচমকা তারই সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। পুরোটাই রীতিমতো চমকপ্রদ এক ভ্রান্তিবিলাস বলেই মনে হচ্ছে, আরামকেদারা থেকে পা বাড়াবামাত্র ভূগোলবিদ কোথাও একটা গুপ্তগোল পাকিয়ে বসে আছেন-কিন্তু বিভ্রম যা-ই কিংবা যেভাবে ঘটে থাকুক না কেন, লর্ড এডওয়ার্ড ভাবলেন এই ছিটগ্রস্ত অধ্যাপকটিকে সমাদর করা কর্তব্য, এবার তিনি নিজেই তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিগেস করলেন, আচ্ছা, একটা কথা যদি জানতে চাই-

একটা কেন? অনেক কথাই জানতে চাইতে পারেন। কী জানতে চান, বলুন

আপনার কথা থেকে মনে হলো আপনি বোধকরি পরশু রাতের বেলা জাহাজে এসে উঠেছেন-

হ্যাঁ, রাত আটটায়। তিরিশ ঘন্টা রেলের ঝাঁকুনি খেয়েছি সমানে, তারপর ঘোড়ার গাড়িতে করে স্টেশন থেকে জাহাজঘাটা-যা ধকল গেছে, কী আর বলবো। আমার তো আর ভ্রমণ করে অভ্যাস নেই। তাই এস. এস. স্কটিয়ায় উঠেই সোজা ছ-নম্বর ক্যাবিনে গিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছি-একটানা ছত্রিশ ঘন্টা ঘুমিয়েছি, নইলে আবার অসুখবিশুখ বাধিয়ে মুশকিলে পড়ে যেতে হতো।

এতক্ষণে এই বিভ্রমের রহস্য বোঝা গেল। ডানকান ছাড়বার আগে সবাই যখন গিঞ্জেয় গেছে, জাহাজে যে কোনো পাহারার দরকার আছে সেটাও কারুতখন খেয়াল হয়নি, আর রাতের অন্ধকারে বিধ্বস্ত পাণ্ডয়ল ডানকানকেই এস. এস. স্কটিয়া মনে করে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়েছেন তার জন্যে নির্দিষ্ট করা ছ-নম্বর ক্যাবিনে।

কথা ছিলো সোজা কলকাতার বন্দরে পৌঁছে, সেখান থেকেই স্থলপথে আমাদের ভৌগোলিক অভিযান শুরু হবে। ভৌগোলিক সমিতির পক্ষ থেকে বডোলাটবাহাদুরকে সেই মর্মেই বিশদ বিবরণ জানানো হয়েছিলো। আমাদের ভৌগোলিক সমিতি জানতে চাচ্ছিলো, তিব্বতের ইয়ারো-জাঙবো-চউ নদীটা হিমালয়ের দক্ষিণদেশ থেকে বেরিয়ে শেষটায় আসামের ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে পড়েছে কি না। সেটাই সরেজমিনে দেখে-আসা আমার উদ্দেশ্য ছিলো। ঐ রাস্তায় বেরিয়ে, নদীর গতিপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে, এই ৪৬ সালে ত্রিক ব্যর্থ হয়েছিলেন-আমার ধারণা, আমি নিশ্চয়ই সফল হবো।

জাক পাণ্ডয়ল যেন দ্বৈতালোপে বিশ্বাসই করেন না, ক্লাসে পড়িয়ে তার অভ্যাসটা এমনই বিগড়ে গেছে যে সারাক্ষণ, অনর্গল, মুখ থেকে তুবড়ির মতো বাক্যের ফুলঝুরি ছিটিয়ে চলেন। রেলভ্রমণের ধকলে তিনি কতটা কাহিল হয়েছিলেন এখন আর সেটা বোঝবার কোনো জো নেই-সম্ভবত ঐ ছত্রিশ ঘন্টা একটানা ঘুমিয়ে নেবার পর শরীরটা তার এতই ঝরঝরে লাগছে, এতই চাঙ্গা লাগছে যে তোড়ে বাক্যবর্ষণ করে যাচ্ছেন। একটু খারাপই লাগলো তার ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে, কিন্তু গোড়াতেই ভুলটা ভাঙিয়ে না-দেয়াটাও অন্যায় হবে। মঁসিয় পায়েল, লর্ড গ্লেনারভন খুব স্পষ্ট করে বললেন, আপনি কিন্তু মোটেই কলকাতা যাচ্ছেন না।

তড়াক করে কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলসের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন জাক পাঞ্চয়ল, অথচ কাণ্ডেন বার্টন-

আপনি ভুল করেছেন, মঁসিয় পাঞ্চয়ল, ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, আমি কিন্তু কাণ্ডেন বার্টন নই-

তাহলে স্কটিয়া—

এবং এটা এস. এস. স্কটিয়াও নয়।

জাক পাঞ্চয়ল শুধু হতচকিত নন, স্তম্ভিত। জীবনে এই-প্রথম সম্ভবত তার কোনো বাক্‌ফুর্তি হতে চাচ্ছিলো না। এক-এক করে সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন তিনি; না, মোটেই কোনো রসিকতা নয়, এটা, সকলেরই মুখ গম্ভীর। শুধু কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলসের ওষ্ঠাধর মুচকি-এক হাসিতে ফুসকাযিত হয়ে আছে। আর তারপরেই তার চোখ পড়লো হালের চাকায়, সেখানে বড়ো বড়ো হরফে

স্পষ্ট করে লেখা :

ডানকান

গ্লাসগো

অ্যাঁ! ডানকান!

প্রায় অর্ধস্ফুট একটা আত্ননাদের মতোই কথাটা পাণ্ডয়লের মুখ থেকে নিঃসৃত হলো। কীরকম হতাশভাবে ছুটে গিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন তার ঐ ছ-নম্বর ক্যাবিনে।

ঐ ভ্রান্তিবিলাসে সকলেরই হাসি পাচ্ছিলো, শুধু মেজর ম্যাকন্যাই সারাক্ষণ চুপচাপ গম্ভীর হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, বেচারা! ঐটা অবিশ্যি সবাই জানে যে জাক পাণ্ডয়ল প্রায় গল্পের বইয়েরই চরিত্রের মতো, অন্যমনস্ক অধ্যাপক বলতে যা বোঝায়, উনি তারই সশরীর জলজ্যান্ত প্রমাণ

বেচারি বললে কী হবে, মেজর ম্যাকন্যাসের গলা শোনা গেলো ঐতক্ষণে, ওঁকে এখন কলকাতার বদলে আমাদের সঙ্গে পাতাগোনিয়াতেই যেতে হবে-কিছুতেই আর ফেরা হবে না।

তবে প্রথম যে-বন্দরে ডানকান নোঙর ফেলবে, লর্ড গ্লেনারভন সহানুভূতির সুরে বললেন, সেখানেই বেচারিকে নামিয়ে দেওয়া যাবে না-হয়।

জাক পাণ্ডয়লের ঐ গোড়ায় গলদের শেষরক্ষা কী করে করা যায়, ঐ নিয়ে যখন পরামর্শ করতে সবাই ব্যস্ত, ঠিক তখনই তার বিখ্যাত ছ-নম্বর ক্যাবিন থেকে কাঁচুমাচু মুখ করে বেরিয়ে এলেন জাক পাণ্ডয়ল, তাঁকে কেমন-একটু সংকুচিত দেখালো। কোনো কথা না-বলে তিনি নিরীক্ষণ করলেন বড়ো মাস্তুলটা, তাকিয়ে দেখলেন সমুদ্রের ফেনোচ্ছল জল, আর দূরের ঝাপসা দিগন্তরেখা। তারপর আন্তে হেঁটে লর্ড গ্লেনারভনের কাছেও এসে দাঁড়ালেন।

আপনাদের জাহাজ কোথায় যাচ্ছে?

চিলেয়-দক্ষিণ আমেরিকায়।

সর্বনাশ! সে-যে একেবারে উলটো দিকে—

আপনি না-হয় আমাদের সঙ্গে চলুন—

উঁহু, তা হয় না আমাদের একটা আন্তর্জাতিক অধিবেশন রয়েছে যে সামনেই—

তাহলে মাদেইরাতে নেমে পড়বেন-তারপর সেখান থেকে ফিরতি কোনো জাহাজ ধরে
ইওরোপেই ফিরে যাবেন না-হয়।

ডানকান তো আর মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে না, নৌসেনারও জাহাজ নয়-এ তো নিছকই
একটা প্রমোদতরণী। আপনারা নিশ্চয় নৌবিহারেই বেরিয়েছেন। তাহলে আর কলকাতা
বেড়াতে গেলেই বা ক্ষতি কী? তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতা, লন্ডনের
পরেই; সেখানে বা তার আশপাশে ঘুরে বেড়িয়ে কতকিছু দেখতেও তো পাবেন। সম্পূর্ণ
অন্যরকম এক জীবনযাত্রা, একেবারেই আলাদা এক সংস্কৃতি।

আপনি কলকাতা নিয়ে ওকালুতি না-করলেও আমার নিজে থেকেই তো কতকাল ধরে
কলকাতা-শুধু কলকাতা কেন, আস্ত ভারতভূমিই ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু
এখন, এই মুহূর্তে ডানকানকে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে বেড়াতে যাবার লোভ আমাকে সংবরণ
করতেই হবে। এখন দক্ষিণ আমেরিকা না-গিয়ে আমার কোনোই উপায় নেই।

লর্ড গ্লেনারভন তখন বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পাতাগোনিয়া যাচ্ছেন। একটুও সবুর করার উপায় নেই, এমনিতেই বড্ড দেরি হয়ে গেছে, একটা দিনও অন্যকোথাও গিয়ে নষ্ট করা চলবে না। তাছাড়া মেরি আর রবার্টও খুব ব্যাকুল হয়ে আছে। এই বেচারিদের কথা ভাবলে মনে হয় জলযানের বদলে কোনো উড়োযানে করে উড়াল দিতে পারলেই ভালো হতো-চট করে পেরিয়ে যাওয়া যেতো এই বিপুল জলধি। এককালে হয়তো লোকে কোনো উড়োজাহাজ আবিষ্কার করবে-তখন হয়তো দূর-দূরান্তেও আরো-অল্প সময়ে চলে-যাওয়া যাবে।

সব কথা খুলে বলে লর্ড গ্লেনারভন পাঞ্চওয়লকেও তাদের সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। তার চেয়ে আপনিই বরং চলুন না আমাদের সঙ্গে। কলকাতা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না-সেখানে পরেও যাওয়া যাবে। তাছাড়া আপনি তো আর দক্ষিণ আমেরিকা চক্ষেও দ্যাখেননি-চর্মচক্ষুতে সব দেখে আপনি নতুন মহাদেশ সম্বন্ধে অজস্র নতুন তথ্য জানতে পারবেন।

জাক পাঞ্চওয়ল প্রস্তাবটায় মোটেই রাজি হলেন না-তবে লেডি হেলেনার দয়ামায়াসহানুভূতির প্রশংসা করলেন সাতকাহন করে, বোতল থেকে উদ্ধার করা সাহায্যের জন্যে তিন তলবও দেখলেন, সে-সম্বন্ধে অবশ্য নতুন-কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। কিন্তু যখন জানলেন যে লেডি হেলেনা বিখ্যাত ভূপর্যটক উইলিয়াম টাফনেলের দুহিতা, তখন হৈ-হৈ করে উঠলেন : তাই নাকি! বিল টাফনেল তো আমার বন্ধুমানুষ। ইনি তাঁরই মেয়ে! কী আশ্চর্য, দৈব যে কখন কী করে, তা কেউ বুঝতেও

পারে না। কে জানতো যে একদিন বিল টানেলের মেয়ের সঙ্গে একই জাহাজে করে আমি সাগরপাড়ি দেবো!

ছয়

জাক পাঞ্চয়লের মতিবদল

আগস্টের তিরিশ তারিখে দেখা গেলো মাদেইরা, উত্তর আটলান্টিকের ক্যানারি আইল্যান্ডসের উত্তরে, এলোমেলো ছড়িয়ে আছে ছোটো-ছোটো কতগুলো দ্বীপ, পোর্তুগালের অধীন এই দ্বীপগুলোর রাজধানী ফুনশাল, তিনশো-দুই বর্গমাইল তার বেড়, আর কী দারুণ আঙুর হয়, ওহ, মাদেইরা ওয়াইন দারুণ খেতে, তবে, মূল মাদেইরা দ্বীপ, যার বেড় দুশো পঁচাশি বর্গমাইল, সেখানে খামকা নোঙর ফেলতে চাচ্ছেন কেন? এখানে তো দেখার কিছুই নেই, আগেকার যত ভূগোলবিশারদেরাই তো যা দেখার সবকিছু দেখে গিয়েছেন। হতো যদি ব্রাজিল, যেখানে পশ্চিমে আমাজোন থেকে বেরিয়েছে মাদেইরা নদী-পোর্তুগিসরা আশ্চর্য, নতুন-কিছু দেখলেও পুরোনো নামেরই স্মরণ নেয়-এই মাদেইরা নদী মামোরে আর বেনির মোহনায় পড়ে বোলিভিয়ার সীমান্তটাকে চিনিয়ে দিচ্ছে, তাহলে না-হয় একবার নামা যেতো,এত-সমস্ত কথা ভূগোলবিশারদ জাক পাঞ্চয়লের, জাহাজ থেকে না-নামবার অনেকগুলো ছুতোর মধ্যে একটি। এখান থেকে নিশ্চয়ই আপনারা ক্যানারি আইল্যান্ডে যাবেন, ঐ যে-দ্বীপগুলো আছে আটলান্টিকে, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে, রৌদ্রোজ্জ্বল, চমৎকার, সবশুধু ২৮০৭ বর্গমাইল, এখনও এস্পানিয়ারই অধীন, তার রাজধানী লাস্ পালমাস্ সান্তা ক্রুস দে

তেনেরিফে, সেখানে পাহাড়ের চুড়ায় উঠলে হয়তো অনেককিছু দেখা যাবে। পূর্ব ক্যানারির এই লাস্ পালমাস খুব-একটা ছোটো দ্বীপ নয়, সবশুধু ১২৭৯ বর্গমাইল বেড়, সেখানে অবশ্য ঘুরে-ঘুরে কিছু দেখা যেতে পারে।

এই মর্মে ছোটোখাটো বক্তৃতা শুনে, এবং মাদেইরায় নামতে এই ভৌগোলিকের অনিচ্ছা দেখে, লর্ড গ্লেনারভন মৃদু একটু হাসলেনই শুধু কিছু বললেন না। না-হলে বলতে পারতেন, মাদেইরার যত খবর আপনি জানেন ততটাই তো আপনি জানেন লাস্ পালমাস-এর, আর জানেন বলেই যদি খামকা নামতে না-চান, মাদেইরায়, তবে সেই একই যুক্তিতে লাস্ পালস্-এই বা নামবেন কেন? একটা দ্বীপ পোর্তুগালের, আর অন্যটা এস্পানিয়ার-তফাৎ তো শুধু এটাই। এ-ধরনের কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যে কোনো লাভ নেই, এটা বুঝতে পেরেই লর্ড গ্লেনারভন মাথা নেড়ে সস্মিত মুখে জাক পাঞ্চয়লের প্রস্তাবটাই মেনে নিলেন।

মাদেইরা থেকে ক্যানারি আইল্যান্ডসের দূরত্ব আড়াইশো মাইলের মতো। পরের দিন অপরাহ্ন দুটো নাগাদ ডেক থেকে দূরে দিগন্তের কাছে, লাস্ পালমাস সান্তা ক্রুজ দে তেনেরিফের পাহাড়চুড়ো দেখা গেলো, ঘন-সবুজ ছায়ার মতো। জাক পাঞ্চয়লও তখন দাঁড়িয়েছিলেন ডেকে। তাকে ডেকে নিয়ে চোখে দূরবিন খুঁজে দিয়ে কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স জিগেস করলেন, চিনতে পারছেন-ঐ যে আপনার লাস্ পামাস্-এর পাহাড়-তেনেরিফে। পাঞ্চয়ল যেন দেখেও দেখতে পেলেন না। তিনি আরামকেদারার ভূগোলবিশারদ, জানা পৃথিবীটা তার নখের ডগায়, কিন্তু সেটা স্বচক্ষে দেখে বাড়তি কী আর উৎসাহ দেখাবেন তিনি। তাঁর চোখমুখে কেমন-একটা ঔদাসীনি্যের ভাবই লেপটে রইলো। তবে গোল হলো তখন যখন কয়েকঘন্টা পরে খালি চোখেই দেখা গেলো পাহাড়, ডানকান এখন তার

অনেকটাই কাছে গিয়ে পৌঁছেছে-এমন জলজ্যন্ত দ্বীপটা চাক্ষুষ দেখে ফেলবার পরে আর না-দেখবার ভান করা যায় কী করে? কিন্তু এবার তার মুখচোখ তাচ্ছিল্যের ভাবে ভরে গেলো। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গকে তিনি জানালেন, ধুর! ঐ পাহাড়ে উঠে আর কী হবে? ও-পাহাড়ে তো হুমবোল্টও উঠেছে, বঁপ্লাও উঠেছে। এ-পাহাড় আর তবে নতুন বা অজানা হলো কী করে? হুমবোল্ট তো ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ের পাঁচ-পাঁচটা আলাদা-আলাদা জায়গায় গিয়েছিলো, পাহাড়ের উঁচু চূড়োটার উঠে দেখেছে এস্পনিয়ার সিকিভাগ, তারপর এমনকী আগ্নেয়গিরির ভেতরে গিয়ে পর্যন্ত জমাট লাভার স্তর দেখে এসেছে। ওখানে আর নতুন-কী দেখবো আমি। তার চেয়ে বরং কেপ ভেদ গিয়ে ঘুরে দেখা যেতে পারে : পশ্চিম আফ্রিকার এই এই দ্বীপগুলো পোর্তুগালের অধীন, রাজধানী প্রাইয়া সাঁউ তিয়াগুর ওপর ঠিক যেন ছবির মতো বসিয়ে রেখেছে কেউ-তাছাড়া সেনেগলের অংশ এটা, আফ্রিকার একেবারে পশ্চিমতম বিন্দু-অন্তরীপটা যেভাবে অ্যাটলান্টিকে ঢুকে এসেছে ১৭°৩৬ তে তাতে মনে হয় গোটা আফ্রিকাই যেন পশ্চিমদিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে। আপনারা কেপ ভের্দ-এ থামবেন তো?

তা তো থামতেই হবে, কথার তোড়ে ভেসে যেতে-যেতে কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স জানালেন, কয়লা নিতে হবে যে।

আমি তাহলে সেখানেই নেমে যাবো, পাণ্ডয়ল অমনি ঘোষণা করে বসলেন, ফ্রাসের কিছু লোকজন তো থাকবেই ওখানে, ব্যবসা করতে যারা ওখানে গেছে। অবশ্য লোকে বলে ওখানেও কিছু দেখার নেই, সেনেগল তো ফরাশিদেরই অধীন-আরেকটা ফ্রান্স বানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে আর-কি ওখানে। তবে চোখ থাকলে, খুঁটিয়ে দেখতে জানলে, অনেককিছুই চোখে পড়ে যেতে পারে। অন্তরীপটা সেনেগলের বলে ফরাশিদের,

দ্বীপগুলো সব পোতুগিসদের-পাশাপাশি দেখতে গেলে দুটো দেশের তফাৎ ভালো করে মালুম হয়ে যাবে।

কেপ ভেদ বা কাপ ভার্দ, যখন এলো, সেদিন আকাশ ফেটে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। কাপ্তেন ম্যাক্স পরিকল্পনা মতোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এসে পৌঁছেছেন, দিনটা সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ। কিন্তু কেউ যেন আকাশ উপড় করে ঘড়া-ঘড়া জল ঢেলে যাচ্ছে। ডানকান ঠিক সেনেগলের অন্তরীপে এসে ভেড়েনি, ভিড়েছে দ্বীপের রাজধানী পোঠু প্রাইয়াতে। ককটক্রান্তি পেরিয়ে আসার পর থেকেই আকাশ ছিলো মেঘলা, কালো-কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো সূর্য, তারই মধ্যে মরা মিয়োনো আলোতে দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিলো আগ্নেয়গিরির চূড়াটা-সম্ভবত শ-তিনেক ফুট উঁচু হবে।

পোঠু প্রাইয়াতে ডানকান নোঙর ফেলবামাত্র দেখা গেলো ভূগোলবিশারদ জাক পাঞ্চয়ল তার তল্লিতল্লা জিনিশপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্যে প্রায় একপায়ে খাড়া, কিন্তু তারই মধ্যে বেশ গজর-গজর করে চলেছেন। তার অন্তহীন বিড়বিড় থেকে অচিরেই অবশ্য মর্মার্থ উদ্ধার করা গেলো। তাঁর সঙ্গে রয়েছে আনকোরা সব দামি-দামি যন্ত্রপাতি, যে-রকম বৃষ্টির ঢল নেমেছে তাতে সব ভিজে-টিজে একেবারে বিকল হয়ে যাবে যে।

কেবল এইই নয়-তার ভ্যাজর-ভ্যাজর এমনকী পোত প্রাইয়ার আদ্যশ্রদ্ধ করে ছাড়লো-অবশ্যই কোনো ভৌগোলিকের দিক থেকে। এ-দেশটার নাকি উল্লেখ করার মতো নদী নেই-ভেবে দেখুন, পাহাড় আছে, খাতও আছে, জমি ঢাল থেকে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে, অথচ কোনো নদী নেই! তাজ্জব!-তাছাড়া গাছপালা যা আছে তা নেহাৎই নাকি নামকাওয়াস্তে, বনজঙ্গল নেই-অথচ এর নাম কি না কেপ ভেদ-সবুজ অন্তরীপ। এ-রকম

বেমানান নাম কখনও শুনেছেন?—পাহাড় যা আছে তাও তো নিছক বালির টিবি-সাঁউ তিয়াগুর আগ্নেয়গিরিটাকে সরেজমিন দেখে গিয়েছেন মঁসিয় দ্য ভিল-তার বর্ণনা থেকেও মনোরম কোনো তথ্য জানা যায়নি। এ-রকম একটা জনবিবর্জিত দ্বীপে দু-দুটো মাস মানুষ থাকে কী করে—দু-মাসের মধ্যে তো আর দেশে ফেরার জাহাজ মিলবে না!

বিড়বিড় করে এমনি সাতকাহন পেড়ে বসলেন পাএয়ল আর ক্রমশ কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়তে লাগলেন।

গোড়ায় বেচারি পাএয়লকে তাতাচ্ছিলেন সবাই, এমনকী মেজর ম্যাকন্যাব্স শুষ্ট : নেমে গেলে ক্ষতিই বা কী। ভৌগোলিকদের তো আর পৃথিবীর আশ্চর্য-সব ভূদৃশ্য নিয়ে মাথা ঘামালেই চলে না—তাদের তো অতিসাধারণ দেশ-গাঁ দ্বীপ-মহাদ্বীপের বর্ণনা তৈরি করতে হয়। কিন্তু এ-সব কথায় চাঙ্গা হয়ে ওঠার বদলে পাএয়ল ক্রমেই যেন মিইয়ে পড়তে লাগলেন। শেষটায় তার বেচারা-বেচারা মুখটা দেখে লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভনের একটু মায়া হলো, বললেন, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এখানে আপনার হাত-পা গুটিয়ে মিথ্যোমিথ্যি দু-মাস বসে-থাকা ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু মঁসিয় পাএয়ল, এরপর তো ডানকান গিয়ে সটান চিলেতে থামবে—একেবারে নতুন-এক মহাদেশে—অন্য-একটা গোলাধর্মে। তা চলুন, আমাদের সঙ্গে না-হয় পাতাগোনিয়াতেই চলুন, সেখানকার ইন্ডিয়ানদের চাক্ষুষ দেখে আসবেন, চলুন। তাদের নিয়ে তো কতরকম গালগল্প ফেঁদেছে লোকে—কিন্তু সত্যি তারা কী-রকম সেটা একটু নিজের চোখে দেখে নেয়া কি ঠিক হবে না?

কিন্তু আমার যে তিব্বতে যাবার কথা? আমায় তো ইয়ারো-জাংবো-চৌতে গিয়ে যেখানে কেউ যায়নি সেখানকার সব হালহুদিশ জেনে আসতে হবে!

আপনার মনে হচ্ছে নদী নিয়েই কারবার। তিব্বতী নদী না-পান আমেরিকার নদী পেয়ে যাবেন। ইয়ারো-জাংবো-চৌ-এর বদলে না-হয় রিও কলোরাদোর উৎস আর মোহনাই দেখবেন না-হয়।

তাহলে তো গোড়া থেকেই ভারতবর্ষের বদলে পাতাগোনিয়া যাবার পরিকল্পনা করলেই হতোভৌগোলিক সমিতিতে আগে থেকে বলে-কয়ে- জানিয়ে এলে অভিযানটা একটা সরকারি রূপ পেতো। তা-না-না-না করে নিমরাজি হবার ভঙ্গিতে বললেন ফরাশি ভৌগোলিক।

লর্ড গ্লেনারভন একটা নামকাওয়াস্তু কৈফিয়ৎ জুগিয়ে দিলেন। নিশ্চয়ই অনেকরকম পরিকল্পনাই ছিলো আপনাদের সমিতির। সে-সব নিয়ে উদ্বাস্ত ছিলেন বলেই হয়তো তখন ঠিক খেয়াল হয়নি। তাছাড়া খুব কি আর ঝামেলা হবে? ভারতবর্ষে গেলেও দেখতে পেতেন ইন্ডিয়ান-এই পাতাগোনিয়াতেও দেখতে পাবেন ইণ্ডিয়ান-শুধু এরা যে আমেরিডিয়ান সেটা মনে রাখলেই হলো।

মঁসিয় পাএয়ল, এবার লেডি হেলেনা তাকে উসকে দিলেন, আর মিথ্যে ভাবছেন কেন? এই বর্ষায় এখানে কোথাও যাবেনই বা কী করে? তার চেয়ে । আমাদের সঙ্গেই চলে আসুন। আমরাও না-হয় আপনার ভৌগোলিক অভিযানের সঙ্গী হতে পেরে কৃতার্থ হবো। আর এ নিয়ে দ্বিরুক্তি করবেন না।

না-না, দ্বিরুক্তি নয়, পাএয়লের মুখ উদ্ভাসিত, চোখ ইজ জ্বলজ্বলিং, ঠিক ওপর-পড়া হয়ে বলতে পারছিলুম না বলেই আপনাদের না বলেই আপনাদের দিক থেকে আমন্ত্রণ আসার অপেক্ষা করছিলুম। আর-কোনো ওজর-আপত্তির কথা না-তুলে সরাসরি মনের কথাটাই খুলে বললেন ভৌগোলিক : আপনাদের জাহাজ, আপনারা যদি না-ডাকেন তো সেই জাহাজে করে যাই কী করে?

মেরি হাততালি দিয়ে বলে উঠলো :বাঃ, এই-তো বেশ হলো। আমাদের অভিযানে আরো-একজন সঙ্গী বাড়লো।

আর রবার্ট তো সোজা গিয়ে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো।

অমনি খুশি হয়ে পাএয়ল বলে উঠলেন, রবার্টকে তিনি একেবারে দিগগজ ভৌগোলিক বানিয়ে তুলবেন। রবার্ট বেচারি নিজে কী হতে চায় সেটা জানবার চেষ্টা না-করেই একেকজন তাকে একেকরকম মহাশয় বানিয়ে দেবার ঘোষণা করে বসে আছেন। পাএয়ল তাকে ভূগোলবিশারদ বানিয়ে দেবার কথা বলার আগে কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বলেছেন, রবার্ট গ্রান্ট হবে কাপ্তেন গ্রান্টেরই সুযোগ্য সন্তান-তাকে তিনি বানিয়ে দেবেন ওস্তাদ নাবিক। মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কোন-এক দুর্লভ মুহূর্তে মুখ ফুটে বলেছেন তাকে তিনি বানিয়ে দেবেন দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী, অকুতোভয় যোদ্ধা। লর্ড গ্লেনারভন বলেছেন তাকে আদবকায়দা শিখিয়ে একেবারে পাক্কা জেন্টলম্যান বানিয়ে দেবেন। লেডি হেলেনা বলেছেন প্রাণে দয়া-মায়া না-থাকলে অমন মস্ত সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়েও কোনো লাভ নেই, তিনি দেখবেন সে যাতে দয়াধর্ম শেখে। কেবল মেরি-যে অ্যাডমিন রবার্টের দেখাশুনো করে এসেছে-সে-ই কিছু বলেনি, উলটে সবাই তাকে ছাত্রী হিসেবে

পাকড়াবার চেষ্টা করেছিলো-ঠিক রবার্টের মতোই আরেকজন, যাকে যেমন-খুশি সবাই গড়ে নিতে পারবে।

কিন্তু রবার্টকে ভূগোলপণ্ডিত তৈরি করার জন্যে পাণ্ডয়ল যে ডানকান ছেড়ে না, গিয়ে তাদের সঙ্গেই অভিযানে বেরুবেন বলে মনস্থির করেছেন, এতে জাহাজগুছু সবাই ভারি খুশি হয়ে উঠলো। পাণ্ডয়ল ভারি মজার মানুষ-একে তার অমন ভুলোমন, তায় ভীষণ আরামকাতুরে, তায় নানা বিষয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত ফোড়ন কাটেন। তিনি সঙ্গে থাকলে আর যা-ই হোক এ-অভিযান কখনোই একঘেয়ে বা বিরজিকর হয়ে উঠবে না-সবসময়েই একটা-না-একটা রসালো প্রহসন সৃষ্টি হবে, কতরকম মজা হবে।

চারদিন ধরে জাহাজে কয়লা বোঝাই হলো, রসদ তোলা হলো, শূন্য ভাড়ার ভরাট করা হলো। বৃষ্টি মাঝে-মাঝে ধরে আসে বটে, টিপটিপ, টিপটিপ, কিন্তু কখনোই পুরো থেমে থাকে না। এরই মধ্যে মেজর ম্যাকন্যাব্স একাই একদিন বর্ষাতি চাপিয়ে পোর্তু প্রাইয়ায় নেমে সরেজমিন তদন্ত করে এসেছিলেন সব। জাক পাণ্ডয়ল কিন্তু একবারও জাহাজ থেকে নামবারই চেষ্টা করেননি। তিনি বরং ডেকের ওপর পায়চারি করতে-করতে কিংবা ডেকচেয়ারে বসে আড্ডা দিতে দিতেই তার ভূগোলবিদ্যার জ্ঞানের বহর জাহির করতেন। আর বৃষ্টির সময় তো কথাই নেই-তার ঐ বিখ্যাত ছ-নম্বর ক্যাবিন থেকে তিনি একপাও বেরুতেন না।

ডানকান যখন তার কয়লা আর রসদ নিয়ে ফের তার অভিযানে রওনা হয়ে পড়লো, আর সেপ্টেম্বরের সাত তারিখে পেরিয়ে এলো বিষুবরেখা, সেদিন থেকে জাক পাণ্ডয়ল তার ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি প্রকাশ করবার জন্যে আরো-একটি নতুন বিষয়

পেলেন। যখন-তখন খাবারটেবিলেই তিনি মস্ত-একটা মানচিত্র বিছিয়ে দিয়ে কাকে বলে নিরক্ষরেখা, কাকে বলে অমুক ডিগ্রি দেশান্তর আর তমুক ডিগ্রি অক্ষরেখা, কখন কার কত ডিগ্রি পেরুলে সময়ের তফাৎ হয়ে যায় চার মিনিট-এ-সব বিষয় সোৎসাহে হাত-পা নেড়ে বোঝাতে লাগলেন। স্টুয়ার্ড অলবিনেট বেচারির হলো বিষম ঝামেলা-সে বাটি-রেকাবি-কাঁটা-চামচে ন্যাপকিন-গেলাশ যে কোথায় সাজাবে তা বুঝতে না-পেরে, তার খাবারটেবিলটা এভাবে জবরদখল হয়ে যেতে দেখে, পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে বেজায় খিটিমিটি লাগিয়ে দিতো। অন্যদের কাছে কিন্তু জাক পাঞ্চয়লের ভূগোলের ক্লাস মজাই লাগতো। আর কাণ্ডেন ম্যাঙ্গও খুশি ছিলেন যে এইসব প্রহসনের মধ্যে যদি মেরি মজা খুঁজে পায়, তাহলে অন্তত সেই সময়টুকু সে কাণ্ডেন গ্রান্টের কথা ভুলে থাকবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো কাণ্ডেন গ্রান্টকে শিগগিরই খুঁজে-পাওয়া যাবে, তাদের এই অভিযান সফল হবে। শুধু মেজর ম্যাকন্যাব্স এই আরামকেদারার বাহাদুরি আর অবিশ্রাম বকর-বকর শুনতে চাইতেন না। তিনি নিজে বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে পোর্টু প্রাইয়া ঘুরে এসেছেন, কোনো পণ্ডিতি বক্তৃতা দেননি, আর ভূগোলবিশারদ কিনা সর্বক্ষণ মুখে খেঁ ফুটিয়ে চলেছেন, অথচ কোনোকিছু গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবার বেলায় তার যত-সব ওজর-আপত্তি শুরু হয়ে যায়।

একটু বোধকরি বিরক্তই হয়ে উঠছিলেন মেজর ম্যাকন্যা, বিশেষত খাবার সময়ে ভূগোলের ক্লাসে তার প্রবল, অনীহাই ছিলো, কিন্তু হঠাৎ একদিন অবস্থাটা বেশখানিকটা বলেই গেলো। জাহাজের লাইব্রেরিঘরে জাক পাঞ্চয়ল আবিষ্কার করে বসলেন একবার বই, এম্পানিওলে লেখা-নতুন মহাদেশে যাচ্ছেন, দক্ষিণ গোলার্ধে, সেখানে ব্রাজিল বা ওলন্দাজ ইণ্ডিস বা ব্রিটিশ গিয়ানার মতো দু-চারটে জায়গা ছাড়া সর্বত্রই তো এম্পানিওলের চল-বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর অবশ্য যার-যার নিজের ভাষা আছে। ভাষাটা

জানলে চিলেতে নেমে ভারি কাজে লেগে যাবে। আদানুন খেয়ে পাণ্ডয়ল ভাষাটাকে কজা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বই ঘেঁটে-ঘেঁটে নানারকম শব্দ বার করেন, ধাতুরূপ মুখস্থ করেন, ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হাওয়ার উদ্দেশে ছড়িয়ে দেন এস্পানিওল বাণী। এমনকী, অন্যদের সঙ্গে কথা বলবার সময় যখন-তখন ব্যবহার করেন এস্পানিওল, আর পরস্পরেই বলেন, থুড়ি, ভুল হয়ে গেছে, তোমরা তো কথাটার মানে জানো না, কথাটা ফরাশিতে হলো এই, আর ইংরেজিতে হলো ঐ। আর এটা সবচেয়ে বেশি হতে যখন তিনি রবার্টকে পাকড়ে তাকে আমেরিকার কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

ক্রিস্তোফোরো কোলোরম্বা, ক্রিস্তোবাল কোলোন বা ক্রিস্টফার কলম্বাস যে-নামেই ডাকো না কেন, ক্রিস্তোবাল কোলোন মরবার আগে জেনেই যেতে পারলেন না ইওরোপ থেকে নতুন-একটা মহাদেশে যাবার রাস্তা তিনি আবিষ্কার করেছেন, ভারতবর্ষের ধারে-কাছেও ঘেঁসেননি। সেই প্রথম অভিযানে ১৪৯২তে গিয়েছিলেন কুবায়, আর শেষ অর্থাৎ চতুর্থ অভিযানে ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে গিয়েছিলেন বারবেডোসে-প্রত্যেকবারই বেচারি ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে এসে পা দিয়েছেন, ফলে এখানকার লোকেরা হয়ে গেলো ইন্ডিয়ান, বারবেডোস হয়ে গেলো পশ্চিম-ইনডিস-ইন্ডিয়া কথাটার চল ষোড়শ শতাব্দীর আগে হয়নি-আর তাও ভাঙ্কু ডা গামা ১৪৯৮-তে কোড়িকোডে পা দেবার পর সেই রাস্তায় যখন পোর্তুগিস আর ওলন্দাজ বোম্বেটের লুঠতরাজ দারুণ বেড়ে গেলো, তারই পর পোর্তুগিস বোম্বেটেরা আবার আমাদা থেকে বদলে গেলো হার্মাদ-এ, নৌসেনা থেকে জলদস্যুতে। ক্রিস্তোবাল কোলোন যে-গুগোলটা পাকিয়ে গিয়েছিলেন সে শুধু ভূগোলটা ঠিকঠাক জানতেন না বলেই-

আমেরিকা মহাদেশের কথা ইওরোপের কেউই জানতো না-তারা জানতো ভূমধ্যসাগর, তারপর আফ্রিকা-তাও মরোক্কো-টরোক্কো-ভারতবর্ষের রাস্তাও জানা। ছিলো না তাদের, যদিও আরবদের মারফৎ পেতো মশলিন, মশলা, চিনি আর আরো নানারকম শৌখিন জিনিশ। তো ক্রিস্টফার কলম্বাসই বা কী করে বুঝবেন জলের মধ্যে আস্ত একটা অজ্ঞাত মহাদেশই পড়ে আছে, উত্তর-দক্ষিণ দুই গোলার্ধ জুড়ে? রবার্ট একবার কলম্বাসের ভূগোলবিদ্যায় অজ্ঞতার কারণটা বালাবার চেষ্টা করেছিলো।

সে-কথাই তো বলছি, এই কথোপকথনের মধ্যে অন্য শ্রোতারাও যথারীতি জুটে গিয়েছিলেন, তারা শুনতে পেলেন পাণ্ডুয়ের সারগর্ভ বয়ান : ক্রিস্টোবাল কোলোন তো না-জেনেই মরলেন যে তিনি একটা নতুন মহাদেশে যাবার রাস্তা বার করে ফেলেছেন। বেরিয়ে ছিলেন এশিয়া-বিশেষ করে ভারতে যাবার সোজা রাস্তাটা খুঁজে বার করতে। ফলে মধ্য আমেরিকায় এসে ভেবেছিলেন এসে পৌঁছেছেন ক্যাথে অর্থাৎ চিনদেশে, কিংবা নিপ্পন দেশে, জাপানে। শুধু ভূগোল না-জানবার ফল-কারণ ভূগোল তো আর কতগুলো নদীপাহাড় নয়, দেশ-বিদেশের মানুষজনেরও কাহিনী; চিন জাপান সম্বন্ধে একফোঁটা জ্ঞান থাকলে এ-গণ্ডগোল তার হতো না। তার চেয়ে ঢের সড়গড় ছিলেন আমেরিগো ভেসপুচ্চি-ফলে তার নাম থেকেই নতুন মহাদেশের নাম হয়ে গেলো আমেরিকা। যেমন মাগেলানের নাম থেকে হলো মাগেলান প্রণালী, মাগেলান অন্তরীপ-ইত্যাদি।

ডানকান তখন মাগেলান প্রণালীতে ঢুকেছিলো বলেই এ-নামটা করেছিলেন পাণ্ডুয়ল। এবং সদলবলে ডেকে দাঁড়িয়ে অন্তরীপের কাছে এসে তিনি চর্মচক্ষে পাতাগোনিয়ার ইণ্ডিয়ানদের দেখবার চেষ্টা করলেন-কিন্তু, উঁহু, কাউকেই দেখা গেলো না। তার কৌতূহলের কারণ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন তিনি। একেকজন অভিযাত্রী

একেকরকম বর্ণনা দিয়েছেন ইন্ডিয়ানদের। কেউ বলেছেন এরা সব এগারো ফুট লম্বা দৈত্য, কেউ-বা বলেছেন, উঁহু-উঁহু-এরা সব তিন ফুট লম্বা হয়, সবাই বামন, কেউ-কেউ আবার বলেছেন, তা পাঁচ-ছ ফুট হবে বলেই মনে হলো। জনাথন সুইট যে লিলিপুট বা ব্রবডিঙনাঙদের কথা বলেছেন, এরা তার কেউই নয়। তবে ডীন সুইফ্ট বোধহয় এ-সব অভিযাত্রীদের গুলগল্ল কিংবদন্তি শুনেই একটা দ্বীপে ফেলেছেন খুদে মানুষ লিলিপুশনদের আর অন্য দ্বীপে ফেঁদেছেন ব্রবডিঙনাঙি দৈত্যদের আস্তানা।

হ্যাঁ, তা তো বুঝলুম, সরাসরি মোক্ষম জায়গাতেই প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন লর্ড গ্লেনারভন, কিন্তু আসল উচ্চতাটা তবে কী?

বসে থাকলে উচ্চতা একরকম, দাঁড়ালে আরেকরকম, অমনি চ্যাটাং করে এলো জবাব-ফোড়ন কাটার মতো-রবার্টের কাছ থেকে।

তা ঠিকই বলেছে, রবার্ট, পাণ্ডয়ল বললেন, ওদের ধড়টা লম্বা, পা জোড়া খাটো। তবে যাঁরা এদের নিয়ে পণ্ডিত কেতাব লিখেছেন তারা কিন্তু বলেননি মাপজোক নেবার সময় এরা বসে ছিলো, না দাঁড়িয়েছিলো।

.

সাত

ডানকান-এর যাত্রীরা পদব্রজে

ক্লাইড ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ঠিক বিয়াল্লিশ দিন যখন কেটে গিয়েছে ডানকান গিয়ে ঢুকলো তালকাউয়ানো উপসাগরে; ঐ নামেই নগর-বন্দর, চিলের দক্ষিণমধ্যে তার অবস্থান, কনসেপসিওনের উত্তর-পশ্চিমে। তালকা নামে যেহেতু চিলের ঠিক মাঝখানে সাতিয়াগোর দক্ষিণে আরো-একটা নগর আছে। তাই এই তালকাকে আলাদা করে বোঝাবার জন্যে নাম দেয়া হয়েছে তালকাউয়ানো। বলাই বাহুল্য, জাক পাঞ্চয়লের একটা ছোটোখাটো উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার পরই এই সম্যক জ্ঞান লাভ হলো অন্যদের। আর তার বাগ্মিতা এমনই চুলবুল-করানো ছিলো যে তক্ষুনি লর্ড গ্লেনারভনও জাক পাঞ্চয়লের সঙ্গে সরাসরি ডাঙায় এসে নামলেন। বন্দরের রমরমার জন্যেই শহরটায় গিশগিশে ভিড়। পাঞ্চয়ল ভেবেছিলেন, সদ্য-রপ্ত-করা এম্পানিওল ভাষার প্রয়োগনৈপুণ্যে তিনি চট করেই লর্ড গ্লেনারভনকে তাজ্জব করে দেবেন, তার প্রতিভা দেখে সবাই নিশ্চয়ই দারুণ চমৎকৃত হয়ে যাবেন। কিন্তু ফরাশি টানে এম্পানিওল বলার ফল অবশ্য তার ঠিক মনঃপূত হলো-কোনো হতভাগা চিলেননা তার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলে না। একের পর এক লোককে ডেকে তড়বড় করে কথা বলছেন পাঞ্চয়ল, তোড়ে ছুটিয়ে দিয়েছেন এম্পানিওল ভাষার তুবড়ি, আর তারা গোড়ায় ধন্দে পড়ে গিয়েছে, পরে হতভম্ব, এবং কারু-কারু কাছ থেকে জুটেছে কিঞ্চিৎ ব্রুকুটিও। শেষটায় নিজেই পাঞ্চয়ল ব্যাখ্যা করলেন তার কথা অন্যদের কাছে এমন দুর্বোধ্য-না, না, অবোধ-ঠেকার কারণ। আসলে আমার জিভেরই আড় ভাঙেনি-নিশ্চয়ই উচ্চারণে গোল পাকিয়ে গিয়েছে।

তাঁর ভাষাশিক্ষার এহেন পরিণতি দেখে গ্লেনারভন একটু মুচকি হাসলেন শুধু। বললেন : চলুন। শুদ্ধ দফতরের আপিশটায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।

শুদ্ধ দফতরের আপিশে গিয়ে অবশ্য তেমন লাভ হলো না, শুধু এ-তথ্যটা জানা গেলো যে ইংরেজ কনসাল থাকেন কনসেপসিওনে-অর্থাৎ চিলের দক্ষিণমধ্যের সেই তুলনায়-বড়ো শহরটায়।

এখান থেকে কদূর?

তা, তেজি ঘোড়া পেলে ঘন্টাখানেকে পৌঁছে যাবেন।

ঘোড়া জোগাড় করা হলো প্রায় তক্ষুনি-কড়ি ফেললে কীই-বা না-মেলে, আর দুজনে ঘোড়ায় চেপে তক্ষুনি জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

কিন্তু যতই প্রত্যাশা বা উত্তেজনা থাক, ইংরেজ কনসাল সব শুনে-টুনে তাদের সব প্রত্যাশায় ঠাণ্ডাজল ঢেলে দিলেন। কাণ্ডেণ গ্রাণ্টের ব্রিটানিয়া জাহাজ, তার হালহদিশ, তার সলিলসমাধি-কিছুই তার জানা নেই। লর্ড গ্লেনারভনদের কাজে লাগতে পারলে তিনি ধন্য হতেন, কৃতার্থ হতেন, কিন্তু...

অতএব, পুনরায়, তালকাউয়ানায় প্রত্যাবর্তন দুজনের। অথচ এখানে হাত গুটিয়ে বসে-থাকাও তো চলে না। সুতরাং চর পাঠানো হলো উপকূল ধরে দূরে-দূরে, রাহাখরচ বাদেও প্রলোভন রইলো কেউ কোনো খবর আনতে পারলেই ইনাম মিলবে, কিন্তু কোনো খবরই মিললো না।

এ-সব করতে-করতেই প্রায় হপ্তা কাবার। ছ-দিন বাদেও কোনো খবর নেই। এতদিন মেরি আর রবার্ট আশায় আশায় বুক বেঁধে ছিলো, এবার তারা হাল ছেড়ে দিয়ে একবোরে ভেঙে পড়লো।

অতএব ঐ রহস্যময় চিরকুটগুলো নিয়ে আবারও খুঁটিয়ে দেখতে বসে গেলেন মঁসিয় পাঞয়ল। শব্দগুলোর মর্মোদ্ধার করতে কোনো ভুল হয়নি তো? এবং তন্নতন্ন করে সবগুলো চিরকুট খতিয়ে দেখে তড়াক করে প্রায় লাফ দিয়েই উঠলেন জাক পাঞ্চয়ল।

হুম! যা ভেবেছি তা-ই! গোড়াতেই গলদ, তো শেষরক্ষা হবে কী করে?

তার ভাবভঙ্গি দেখে সবাই কাছে ঘেঁসে এলেন।

কী ব্যাপার? গোড়ায় আবার গলদ কোথায়?

কয়েকটা শব্দের ভুল মনে করা হয়েছে দেখছি! জাক পাঞ্চয়লের চোখ জ্বলজ্বল করছে, উদ্ভাসিত বদন বিগলিত। বন্দী হবো-এমন-কোনো কথা তো লেখেননি কাপ্তেন গ্রান্ট-সম্ভবত লিখতে চেয়েছিলেন বন্দী হয়েছি। সাহায্য চেয়ে এই চিরকুট যখন লিখেছিলেন, তার আগেই নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছেন।

তা কী করে হয়?লর্ড গ্লেনারভন তার যুক্তি উপস্থাপিত করলেন।বোতলটা তো জলে ফেলা হয়েছিলো-আর সে নিশ্চয়ই ঐ জাহাজডুবির সময়তেই।-হলে বন্দীশিবির থেকে দিবি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে সমুদ্রের জলে ফেলবেন কী করে বোতলটা?

হয়তো পথে কোনো নদী পড়েছিলো, তার জলেই ফেলেছেন। পরে ভেসে এসেছে সমুদ্রে।

তা অবশ্য হতে পারে। এ-সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তা, না-হয় ধরেই নিলুম, ক্রিয়াপদের ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত আমরা গুলিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তাতে কী দাঁড়ালো? আমাদের আপনি কী করতে বলেন?

সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা যেখানে আমেরিকার উপকূল ছুঁয়েছে, সেখান থেকে রওনা হয়ে ঐ রেখা বরাবর সোজা অ্যাটলান্টিক অন্দি যাই, চলুন। আমরা যদি আস্ত সমান্তরাল রেখাটার বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই, তাহলে কোথাও-না-কোথাও জাহাজডুবির লোকজনদের কারু-না-কারু হৃদিশ মিলে যাবে।

মেজর ম্যাকন্যাসের এ-সব বুনো-হাঁসের-পেছন-ছোটায় কোনো আস্থা নেই। তিনি শুধু ফোড়ন কাটলেন : অতীব-ক্ষীণ সম্ভাবনা-এবং অমূলক।

এটা ভুলে যাবেন না, মেজর, যে এটাই একমাত্র সম্ভাবনা। আপনি নিশ্চয়ই চান না এঙ্কুনি সবাই মিলে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই শুড়শুড় করে। রিও কলোরাদো কিংবা রিও নেগ্রো নদীর অগুনতি শাখা বেরিয়ে গেছে মহাদেশের ভেতরে-তার কোনোটার ধারে কোনো আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের দল তাদের বন্দী করেছে। হৃদিশ পেলে, সুযোগ-সুবিধে করে নিয়ে, আমরাই উদ্ধার করতে পারবো তাদের। তা যদি সম্ভব না-হয়, তবে পূর্ব-উপকূলে ডানকান জাহাজের কাছে পৌঁছে ফৌজের লোকজন ডাকবো-আর তখন আপনি স্বয়ং মেজর ম্যাকন্যা, আপনিই অভিযানের নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

প্রস্তাবটা মোটেই হাস্যকর নয়। আর অভিযানের নেতৃত্ব পাবার সম্ভাবনাটা দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্সও তার সামরিক গোঁফে একবার তা দিয়ে নিলেন।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তক্ষুনি টেবিলে মানচিত্র বিছিয়ে নিলেন। ডানকানকে কোথায় অপেক্ষা করতে বলা হবে, সেটাও ঠিক করে নেয়া জরুরি। সব খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে তিনি প্রস্তাব করলেন : আমাদের জাহাজ তাহলে কোরিয়েন্টস অন্তরীপ আর সান্‌ আন্তোনিওর মাঝে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করুক।

তা-ই ভালো।

এই নূতন মহাদেশের মাঝখান দিয়ে কে-কে যাবে কাপ্তেন গ্রান্টের খোঁজে, অজ্ঞাতের সন্ধানে, অজানার উজানে, তা আলোচনা করে ঠিক করা হলো। কাপ্তেন ম্যাঙ্গ-এর তো ডাঙার অভিযানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না-তিনি যদি জাহাজে না-থাকেন, তবে ডানকান জাহাজকে সাগরপাড়ি দেবার সময় সামলাবে কে? আর লেডি হেলেনা বা মেরিরও গিয়ে কাজ নেই, পথে মেয়েদের নিয়ে বেরুলে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে অনেক ঝামেলাঝঙ্কি দেখা দিতে পারে। ইচ্ছে ছিলো, রবার্টকেও বাচ্চা বলে অজুহাত দিয়ে ডাঙার অভিযান থেকে নিবৃত্ত করা হয়, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, কারু কোনো ওজর-আপত্তি শুনলে তো? শেষটায় ঠিক হলো জাহাজের তিনজন খালাশিকে নিয়ে স্থলপথে যাবেন লর্ড গ্লেনারভন, সঙ্গে থাকবেন মেজর ম্যাকন্যা, জাক পাঞ্চয়ল আর রবার্ট তো আগেভাগেই ডাঙায় গিয়ে নেমে একপায়ে খাড়া।

অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে এই সাতজনে বেরিয়ে পড়লো অভিযানে-সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তিনজন ডাকারুকো হটাকটা শক্তপোক্ত লোক, আর তাদের সঙ্গেও আছে আরেকটি ছোটোছোলে। গাইডদের সর্দার কিন্তু সত্যি বলতে স্থানীয় লোক নয়, সে একজন ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ, কবে কোনকালেসে প্রায় বিশ বছর হলো-কোর্তেসদের মতো লাতিন আমেরিকায় পা দিয়েছিলো সোনারূপো হিরেজহরতের লোভে, কিন্তু লুঠতরাজ যা-যা করার আগেই তা সাজ করে নিয়েছিলো কোনকিস্তাদোরেরা, ফলে আখেরে তার তেমন সুবিধে হয়নি। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এতগুলো বছর একটানা কাটিয়ে-দেবার পর সে ইংরেজি ভাষা প্রায় ভুলতেই বসেছে, এমনকী তার নামটা শুক্কু এখন এম্পানিওল হয়ে গিয়েছে, লোকে তাকে ডাকে কাতাপাস বলে। যে-শৈলশিরাকে এখানকার লোকে বলে কোর্দিইয়েরা, সেই গিরিসংকট পেরিয়ে আরহেতিননার সীমান্তে গিয়ে পাম্পার কোনো গাইডের হাতে পৌঁছে দেয়াই এখন তার জীবিকা। কতকগুলো খচ্চরের পিঠে মালপত্রের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রওনা হলো সবাই। এই পাহাড়ি খচ্চরগুলো-গাধা আর ঘোড়ার মিশেলদারুণ শক্ত, পাহাড়ি চড়াই-উত্ৰাই ভাঙতে তাদের মতো জীব আর দ্বিতীয় যেন নেই। বাহন হিশেবে তারা চমৎকার, দিনে জল মোটে একবার খেলেই চলে, আটঘন্টায় পেরিয়ে আসে মাইল তিরিশ এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়িপথ।

এক সমুদ্রতীর থেকে আরেক সমুদ্রতীর যেতে হবে-এই বিস্তীর্ণ দুস্তর পথে কাতাপাস-এর অভিজ্ঞতা জানিয়েছে সরাই-টরাই পথে খুব-একটা পড়বে না। খেতে হচ্ছে জারানোনা শুখামাংস, মকাই, অথবা ভাত। ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা করে নেবার জন্যে জলের সঙ্গে সবাই মিশিয়ে নিচ্ছে একটু করে রাম-এখানকার আখের রস নিংড়ে তৈরি-করা।

পাণ্ডয়ল পণ করে বলেছেন তিনি এম্পানিওল ছাড়া আর কোনো ভাষাতেই কথা বলবেন না-ফরাশিও না, ইংরেজিও না। কিন্তু তাঁর চমকপ্রদ উচ্চারণে এম্পানিওল ভাষার যে-সংস্করণ ফুটে বেরোয়, অন্য-কেউ তা খুব-একটা বোঝে না বলেই, প্রায় বাধ্য হয়েই, নিজের সঙ্গেই সারাক্ষণ একটা দ্বৈতালাপ চালিয়ে যেতে হচ্ছে; অর্থাৎ, নিজেই প্রশ্ন করছেন, এবং নিজেই মুখ থেকে খসিয়ে ফেলছেন উত্তর। তার ওপর কাতাপাস মানুষটা কথা কম বলে, কাজ করে বেশি। পাণ্ডয়লের তুবড়ির মতো প্রশ্নগুলোর উত্তরে সে হাঁ-হাঁ ছাড়া কিছুই বলে না। খচ্চরগুলোর তদারকি করছে তার দুই অনুচর : বাহনদের তাড়া লাগাবার জন্যে কখনও তারা দুর্বোধ্য কিছু আওয়াজ করে, গলা ছেড়ে চাঁচায়, কখনও হাতের পাঁচন দিয়ে খোঁচায়, কখনও-বা টিল ছোঁড়ে।

তিনদিন একটানা চলার পর দূরে নীলপাহাড় দেখা গেলো। রাস্তা ক্রমেই দুর্গম ও বন্ধুর হয়ে উঠছে, মাঝ-মাঝেই পথে পড়ছে পাহাড়ি জলধারা, নদী না-বলেই অনেকগুলোকে পাহাড়ি সোঁতা বলাই ভালো। এদের বেশির ভাগেরই নাম এ-যাবৎ কোনো মানচিত্রে ওঠেনি, ফলে জাক পাণ্ডয়ল নতুন-নতুন নদী আবিষ্কার করার নেশায় মেতে উঠেছেন, টুকে নিচ্ছেন তার খাতায়, মানচিত্রের খশড়া তৈরি করছেন, লিখে রাখছেন পাশে মানচিত্রের এক ইঞ্চি সমান অত মাইল। যে-নদীগুলোর কথা তিনি আগেই বইতে পড়েছেন, সেগুলো দেখে আর-কেউ বলার আগে, সসাৎসাহে নিজেই চেষ্টা করে বলে দিচ্ছেন নামগুলো। তাদের যাবার পথ কাটাকুটি করে আড়াআড়ি গেছে মস্ত-একটা পথ, রীতিমতো রাস্তাই বানানো হয়েছে যেন, দেখেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন : আরে, এ-যে দেখছি লস আনহেলেসে যাবার রাস্তাটা।

সত্যি নাকি? কাতাপাসকে জিগেস করে যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন লর্ড গ্লেনারভন।

হ্যাঁ, তার অভ্যাসমাফিক ছোট উত্তরটা দিয়েই কাতাপাস কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেনি, বরং উলটে জাক পাঞ্চয়লের দিকে ঘুরে জানতে চেয়েছে : এদিকটায় এর আগে কখনও এসেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ ভারিক্কিচালে জবাব দিয়েছেন পাঞয়ল।

দলবল নিয়ে, খচ্চরের পিঠে চড়ে?

না। একাই। চেয়ারে বসে থেকেই।

কাতাপাস এমন উত্তর শুনে একটু তাজ্জব হয়েই পাঞয়লের মুখের পানে তাকিয়েছে, ফ্যালফ্যাল করেই তাকিয়েছে। কথাটার মানে তার মাথায় ঢোকেনি। সে-বেচারি কী করে বুঝবে যে কোনো পড়ার ঘরে বসে-বসে বইয়ের পাতা উলটে যাওয়াও যে কারু-কারু পক্ষে সত্যির চেয়েও বেশি, আরো-সত্যি, ভৌগোলিক অভিযান।

অবশ্য কথাটা তলিয়ে বোঝবার জন্যে কাতাপাস খুব-একটা চেষ্টাও করেনি তখন। কেননা সত্যিকার দুর্গম পথের যাত্রা তো শুরু হলো এই এখন। চলাটা আর আগের মতো সহজ নেই, বেশ কষ্টকর। এ-সব পথে যাদের চলাফেরা করে অভ্যাস নেই তাদের কাছে রীতিমতো কঠিনই ঠেকবে। আর তার নীট ফল হবে এই যে চলার গতি কমে যাবে অনেকটাই। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চড়াই ভেঙে-ওটা আদপেই সহজ কাজ নয়। প্রথম-প্রথম আবার পা ফসকে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে-আর কত-যে হোঁচট খেতে

হয় তার তো কোনো লেখাজোখা নেই। আন্দেয়াস-এর গিরিপথ পেরুবার জন্যে শেষ অর্দি অনেক ভেবে কাতাপাস্ ঠিক করেছে আতুকো গিরিসংকট দিয়েই যাবে-তার কারণ সেটা পড়েছে নাকবরাবর, আর কে না জানে যে কোনো সিধে সরলরেখাই হলো হ্রস্বতম পথ, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একটাই-এবং সেটা বেশ বড়োগোছেরই মুশকিল। এই বিষম পথ ধরে খচ্চররা যায় না, আর এতটাই দুর্গম যে সিধে পথে গিয়ে সময় বাঁচাবার ফন্দিটাও হয়তো ভেসে যাবে। সেইজন্যেই গোড়ায় কাতাপাস্ এ-পথ দিয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু পাঞয়লের ভৌগোলিক জ্ঞানেই সবাই নেচে উঠেছে। এটাই যদি শর্টকাট হয়, যদি কম পথ পেরুতে হয়, তবে এই পথেই যেতে হবে। সকলের একগুয়েমি দেখে কাতাপাস্কে শেষটায় এ-পথ দিয়ে যাবার প্রস্তাবেই রাজি হতে হয়েছে। ভেবেছে, নিজেরা খচ্চরের পিঠের বোঝা ভাগাভাগি করে নিয়ে একটু হালকা করে নিলে বুঝি এই সরু পথটা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চলে যেতে পারবে; অনেকটা সেভাবে চলেছেও তারা, কিন্তু শেষটায় এমন-একটা জায়গায় এসে পড়েছে যে খচ্চররা সে-রাস্তা পেরিয়ে যেতেই পারবে না, আর জীবজন্তুরা সহজেই টের পেয়ে যায়, কী করে যেন তারা বুঝে ফেলেছে এ-পথ দিয়ে যেতে গেলেই তারা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। তারাও জেদ ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, একপাও যাবে না আর। একটা কারণও অবশ্য আছে : দক্ষিণ গোলার্ধে সবই তো উত্তর গোলার্ধের চাইতে একেবারেই উলটো। এখনই এখানে বসন্ত-পাহাড়ের গায়ের জমানো তুষার এখনই মাঝে-মাঝে গলে যেতে থাকে-আর পাহাড় থেকে ধস নামে। মাটি নরম হয়ে যায়, আলাগা হয়ে যায়, খসে পড়ে। সেইজন্যেই কাতাপাস্ এতটা অনিচ্ছুক। এবার আর কাতাপাস্ কোনো অনুরোধ উপরোধ শোনেনি। তার খচ্চরগুলো আর সাঙাৎদের নিয়ে সেখান থেকেই সেলাম ঠুকে বিদায় নিয়েছে। যাবার আগে সে বলেছে, সবাই যদি তিনদিনের পথ পেছিয়ে যায়, তবে একটা ঘোরাপথ

দিয়ে সে তাদের নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু লর্ড গ্লেনারভনরা রাজি হননিঃ এতটা এসে আর পেছিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। অগত্যা কাতাপাস্ তার সাগরেদদের নিয়ে বিদায় নিয়েছে, আর এঁরা নিজেরাই মালপত্র ভাগাভাগি করে নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠেছেন-ভাগ্যিস, সঙ্গে ডানকান জাহাজের বিশ্বস্ত খালাশি তিনজন ছিলো।

পথে অনেক জন্তুজানোয়ার তাদের চোখে পড়েছে। এসব জন্তুজানোয়ারের অনেকগুলোই তাদের অচেনা। তবে এমন-কোনো শুওর তারা চোখে দ্যাখেননি যাদের নাভিকুণ্ডলী ছিলো তাদের পিঠে, কিংবা এমন পাখিও দ্যাখেননি যাদের পা নেই, অথবা মেয়ে-পাখিগুলো ডিম পেড়ে তা দিচ্ছে পুরুষপাখিগুলোর পিঠে, কিংবা এমন প্রাণীও দ্যাখেননি যাদের বৃদ্ধি আচমকা থেমে গিয়েছে আর তারা সব এর-ওর-তার কাছ থেকে শরীরের সব জিনিশ নিয়েছে-যেমন তাদের মুণ্ডু আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরগুলো উটের, পাগুলো হরিণীর, আর চিহি-চিহি ডাকটা ঘোড়ার। সারা রাস্তা বকবক করতে-করতে এসেছেন পাএয়ল। বলেছেন ক্রিস্তোবাল কোলোনরা-পিগাফেত্তারা-কেবল গুল ঝেড়েছেন, আর নয়তো মেক্সাল খেয়ে নেশার ঝেকে আজব-সব জীবজন্তু দেখেছেন। এই দুর্গম পথে জীবজন্তুর দেখা পাওয়াই তো বিস্ময়কর-তার ওপর আবার এ-সব কিস্তৃত জীব, যা মানুষ শুধু চোখে দ্যাখে কল্পনায়-কল্পনার লাগামছেঁড়া উড়ালে। জানেন, পাএয়লের মুখে ছিলো একটাই বুলি, এইসব আজগুবি জিনিশ লিখে এঁরা সবাই আমাদের-আধুনিক ভৌগোলিকদের-জীবনটাই দুর্বিষহ করে তুলেছেন। এঁদের বিশ্বাস করলে তো নিজের ওপর থেকেই বিশ্বাস হাপিশ হয়ে যাবে।

যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে হাওয়া লঘু হয়ে আসছে, হালকা, আর নিশ্বাস নিতে গিয়ে অস্থির-অস্থির লাগছে, বুকের খাঁচাটাই যেন ফেটে যাবে, মাড়ি ফেটে বেরিয়ে এসেছে রক্ত, ঠোঁট

ফেটে গিয়েছে। রবার্ট এমনি কাহিল হয়ে পড়েছে যে শেষটায় ডানকান এর একজন খালাসিকে তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। অবশেষে-ঠিক কখন, খেয়াল করার মতো অবস্থা তখন কারু নেই-তখন কেউ খাড়া হয়ে হাঁটতেও পারছে না আর, প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই এগুতে হচ্ছে, এমনি অবস্থায়, অবশেষে-দূরে ছোট-একটা ফুটকির মতো দেখা গেলো কার একটা পোড়ামাটির বাড়ি, আদোবা বাড়ি বলে তাকে এখানকার স্থানীয় লোকেরা।

আন্দেয়াসের চিরতুষারের মধ্যে প্রায় যেন চাপা পড়ে গিয়েছিলো এই আদোবা। কিন্তু ফৌজের লোকেদের নজরদারি খুব তীক্ষ্ণ হয় বলেই বোধহয় মেজর ম্যাকন্যাসের চোখেই পড়েছিলো কুঁড়েবাড়িটা।

কোনোরকমে তুষার সাফ করে চাই-চাই জমাট তুষার সরিয়ে সেখানেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করা হলো। ইন্ডিয়ানরা ভালোই জানে পোড়ামাটি দিয়ে কেমন করে দেয়াল বানাতে শীত ঠেকানো যায়, তাই তুষারের মধ্যে আদোবা বাড়িগুলো মোটামুটি স্বচ্ছন্দ একটা আস্তানা দেয়।

তখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিলো চূড়ার আড়ালে। এদিকে এখনও সুগু-জাগ্রত কত আগ্নেয়গিরি আছে। দক্ষিণের আগ্নেয়গিরির মুখটার ওপর আগুনের হলকা, লেলিহান লোল রক্তজিহ্বা, আর তারই প্রতিফলন ঝিকিয়ে উঠেছে বরফের স্কুপের ওপর, আর সেই সঙ্গে ঝলসাচ্ছে ডুবে-যেতে-থাকা সূর্যের শেষরশ্মিগুলো। ভয়ংকরের সম্ভাষণ যে এমন নয়নাভিরাম রূপ নিতে পারে, তা চোখে না-দেখলে হয়তো কেউই বিশ্বাস করতো না। কোনো আশঙ্কারও যে এমন সৌন্দর্য হয়, তা কে জানতো?

ভীষণ শ্রান্ত লাগছিলো সকলের। ঠিক হয়েছিলো, তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নেবে সবাই। কিন্তু খেতে বসেই সবাই কি-রকম আঁৎকে উঠলেন। বাইরে ঐ ধূপধাপ আওয়াজ কিসের? এমন প্রচণ্ড আওয়াজ? তুষার ধসে পড়ছে নাকি চূড়া থেকে? খাওয়া মাথায় উঠলো, সবাই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

না, তুষারধস নয়-জন্তুর দল। তীব্রগতিতে ছুটে আসছে, পালে-পালে। দূকপাতহীন তাদের ধাবমান পায়ের তলায় পড়লে আর দেখতে হবে না-সেখানেই ভবলীলা সাজ হবে। দেখেই সবাই মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। মেজর ম্যাকন্যাব্স ঘর থেকে ছুটে বেরুবার সময় তার শয়ন-স্বপনের সঙ্গী বন্দুকটা সঙ্গে আনতে ভোলেননি। তিনি তার বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন, জন্তুদের পালের মধ্য থেকে একটি জন্তু মাটিতে আছড়ে পড়লো, বাকি সবাই দূপাতহীন ধূপধাপ করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেলো।

তাদের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন পাণ্ডয়ল। জন্তুগুলোকে ছুটে আসতে দেখে তিনিই সর্বাঙ্গে ছিটকে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, চশমা খুলে পড়ে গিয়েছিলো পাশে। হাড়ে চশমাটা খুঁজে নিয়ে নাকের ডগায় বসিয়ে দিয়ে মৃত জন্তুটাকে নিরীক্ষণ করেই তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে চৈঁচিয়ে উঠলেন : আরে! গুয়ানাকো! বাঃ! তোফা!

গুয়ানাকো? সে আবার কী? ততক্ষণে রবার্টও উঠে বসেছে।

গুয়ানাকো দক্ষিণ আমেরিকার লামাগোছের জীব। ওপরে ঐ নরম হালকা পাটকিলে লোমগুলো দেখেছো? খুব ভালোজাতের পশম হয় ওতে। গুয়ানাকোরা উটের বংশেরই

কেউ হবে-তাদেরই জ্ঞাতিগুপ্তির কেউ, তবে কুঁজ নেই। কিন্তু এর মাংস খেতে ভারি ভালো-খুবই সুস্বাদু।

আপনি জানলেন কী করে? আগে চেখে দেখেছেন বুঝি?

না, চেখে দেখিনি, তবে বইয়ে পড়েছি। চককার হলো, জারানো শুখামাংসের বদলে গুয়ানাকোর মাংসই খাওয়া যাবে। আমিই রসুই পাকাবো কিন্তু।

সঙ্গে-সঙ্গে মাংস কাটাকুটি করে রান্নার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেলো। একটু আগেই ক্লান্তি লাগছিলো সকলের, এখন এই উত্তেজনার পর টাটকা মাংস খাবার লোভে সবাই যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

রান্না তো হলো, কিন্তু মুখে দিয়েই-থুঃ থুঃ! শক্ত আঁশের তৈরি ছিবড়ে যেন, রসকষহীন, একেবারেই বিস্বাদ।

পাণ্ডয়ল তার কেতাবি বিদ্যার এমন সমূহ উৎখাত দেখে একটু যেন ভাবনাতেই পড়লেন। কিন্তু একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করে দিতে তার আবার বেশিক্ষণ লাগে না কি? লাফিয়ে উঠে বললেন : ওহো, বুঝেছি! অ্যাদুর থেকে ছুটে এসেছিলো বলে মাংসটা এমন খারাপ লাগছে-শুধু শুকনো পেশী বলেই মনে হচ্ছে-গুয়ানাকোর মাংস খেতে তখনই ভালো লাগে যখন সে স্থির থাকে-

কিন্তু এতগুলো গুয়ানাকো দল বেঁধে এমনভাবে ছুটে আসছিলো কেন? রবার্ট জিগেস করলে : তারাকি এমনি প্রাণের ভয়ে পড়িমরি করে সবসময় ছোট্ট নাকি?

নিশ্চয়ই ছোটো না সবসময়। তবে এখন কেন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসছিলো, সেটা কেমন-একটা ধাঁধার মতোই ঠেকলো, কী-একটা অজানা রহস্য আছে যেন এর ভেতর।

তখনই অবশ্য ধাঁধাটার কোনো সমাধান হলো না। রহস্যটা ভেদ করা গেলো অনেক রাতে। গুম গুম গুম...প্রচণ্ড গড়িয়ে-যেতে-থাকা গুম গুম শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো।

ভূমিকম্প না কি? আদোবা বাড়িটা অমন দুলছে কেন?

ঘুম ভেঙে আঁৎকে জেগে উঠে আতঙ্ক আর হতভম্ব দশার এক মিশ্র অনুভূতি তখন সকলের। দেখা গেলো দরজার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে অন্ধকার! তার মানে?

তার মানে ধস নেমেছে।

আদোবা বাড়িটা সমেত পাহাড়ের একটা মস্ত অংশ প্রচণ্ড বেগে নেমে চলেছে নিচে।

কতক্ষণ যে সবাই ভয়ে চোখ বন্ধ করে ছিলো কেউ জানে না-মাঝে-মাঝে একটা থমথমে মুহূর্তকেও মনে হয় অনেকটা সময়। কিন্তু যতক্ষণই কেটে থাকুক না কেন, সংবিৎ ফিরলো আকাশবাতাসফাটানো একটা ভয়াবহ আওয়াজে। ঘরের মধ্যে কে কোনদিকে ছিটকে পড়লো ঠিক নেই। কারু মাথা ঠুকে গেলো দেয়ালে, কারু-বা হাত-পা

পড়লো বেকায়দায়। আর...কী-যে হচ্ছে সেটা বোঝবার মতো সজাগ মনও কারু যেন ছিলো না।

সকলের আগে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেজর ম্যাকন্যা-সামরিক বাহিনীতে নবীশী করার পর কেউ হয়তো অন্যদের চাইতে সহজেই সমস্ত ধকল, সমস্ত ঝড়ঝাঁপটা সহিতে পারে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলেন মাটিতে-পড়ে-থাকা অন্যদের চিৎ-উপুড় শরীরগুলো।

কে যেন নেই-?

ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন ম্যাকন্যাস। না, সকলেই আছে, কিন্তু শুধু রবার্টকেই কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় গেলো তবে রবার্ট? ঘরশুঙ্কু সবাই ছিটকে, ঢাল বেয়ে, ধসের সঙ্গে নিচে নেমে এসেছে। রবার্ট কি তখন ঘরে ছিলো না? কোথায় গিয়েছিলো ঘর ছেড়ে-রাত-বিরেতে? রবার্টকে সঙ্গে না-নিয়ে কাণ্ডেন গ্রান্টের কাছে গিয়ে তারা মুখ দেখাবেন কী করে? কে-একজন বললে, ধস নামার একটু আগেই রবার্টকে দেখা গিয়েছিলো ঘাসের চাপড়া সজোরে জাপটে থাকতে! অর্থাৎ : বাঁ দিকে অন্তত দু-তিন মাইল জমি খুঁজে দেখা দরকার। কিন্তু তারও আগে প্রশ্ন : এখন তারা এ-কোথায় ছিটকে এসে পড়েছেন?

আলেয়াসের পুবদিকের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে লর্ড গ্লেনারভনের দল চিলে থেকে সরাসরি চলে এসেছেন আরহেতিনায়-আলেয়াসের শিখরে চিরতুষার থেকে একেবারে বিস্তীর্ণ সবুজে। তাজ্জব কাণ্ড! এমনই আশ্চর্য যে কয়েকদিনের পথ কেউ যেন আরব্য উপন্যাসের

জাদুগালচেয় করে উড়ে নিয়ে এসে পার করে দিয়েছে। অবশ্য জাদুগালচেয় করে শূন্য পাড়ি দেবার মতো মসৃণ-নিরাপদ ছিলো না ব্যাপারটা, তবে ভূমিকম্পে যখন ধস নেমেছিলো তখন একটা মস্ত ধসই তাদের আদোবা বাড়িশুদ্ধ অমনভাবে অতটা পথ-পার করে নিচে নামিয়ে এনেছে-প্রায় আলগোছেই বলা যায়। ফটফটে শাদা বরফের বিস্তারের পর এখানে চারদিকে যেন সবুজের উৎসবের একটা ঢল নেমেছে-চোখ না-ধাঁধিয়ে দিয়ে চোখ যেন জুড়িয়েই দিচ্ছে সেই সবুজ।

কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে-করতে প্রকৃতির এই আশ্চর্য কীর্তি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের নেই এখন। প্রথম কাজ-এবং এইমুহূর্তে একমাত্র কাজ-যে-করেই হোক রবার্টকে খুঁজে বার-করা। অথচ চারপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজেও রবার্টের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না। আস্ত, গোটা দিনটা কেটে গেলো-কিন্তু কোথাও তার কোনো হৃদিশ নেই, এমনকী এমন-কোনো সূত্র অন্নি কোথাও নেই যার সাহায্যে অন্তত একটা আন্দাজ করা যায় যে রবার্ট কোথায় আছে। বিষম বিমর্ষ হয়ে পড়লেন লর্ড গ্লেনারভন : দায়িত্বটা তারই, কী বলবেন গিয়ে তিনি মেরিকে? নিরুদ্দিষ্ট বাবাকে খুঁজতে এসে ছেলেও না-পাত্তা। তাছাড়া অপঘাত মৃত্যুরও একটা সম্ভাবনা আছে-কিন্তু ধস নেমে রবার্ট যদি মরেও গিয়ে থাকে, তবে তার মৃতদেহটা কোথাও নিশ্চয়ই থাকবে। লর্ড গ্লেনারভন কিন্তু সারারাত ধরে খুঁজে চললেন, পাহাড়ের ঢালে, সমতলে কখনও নাম ধরে চেষ্টা ডাকেন, কখনও হতাশায় গুম হয়ে যান-কিন্তু তাঁর ডাকাডাকিতে কারুই কোনো সাড়া আসে না।

পরদিন সকাল কেটে গিয়ে এলো দুপুর-কিন্তু লর্ড গ্লেনারভন কিছুতেই এ-জায়গাটা ছেড়ে নড়তে চান না। যদি রবার্ট নিজে খোঁজ নিতে এদিকে আসে? বেঁচে আছে তত বেচারা?

কিন্তু এই জনশূন্য নিঃঝুম জায়গায় কতক্ষণই বা কাটাবেন তাঁরা? খাবারও ফুরিয়ে এসেছে-শুকনো জারানো মাংস যা ছিলো তা কোথায় ছিটকে পড়েছে। বিস্বাদ বলে গুয়ানাকোর মাংসও তারা তখন রাখেননি। এই অবস্থায় অন্তত খাবারের খোঁজেও এখানকার পাট উঠিয়ে যেতে হয়-না-হলে সবাই যে অনাহারে মরবে!

মেজর ম্যাকন্যাও বিষম মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রবার্ট ছাড়া এখানে তো অন্য আরো অনেকে আছে। অভিযানের নেতা হিশেবে গ্লেনারভনের তো তাদের কথাও ভাবা উচিত। ম্যাক্সাবস নিজের মনের ভাব চেপে একটু কড়া সুরেই বললেন : আর না-এবার এখান থেকে চলো।

হ্যাঁ, যাবো তো বটেই, তবে আর একটু—

এমন সময়ে আকাশে ঐ কার বিশাল ছায়া? দ্রুত ধাবমান-এই দিকেই?

ভালো করে তাকিয়ে বোঝা গেলো : কগুর : লাতিন আমেরিকার আকাশের রাজা, বিশাল পাখি কর!

পাণ্ডয়ল তাকিয়েই বলে উঠলেন :এ তো দক্ষিণ আমেরিকার গৃধ্রী-কগুর-বিশাল এই পাখির একটা পোশাকি কেতাবি নাম আছে অবশ্য-ভুলতুর গ্রাইফাস-এ তো থাকে আন্দেয়াসের ওপর, মাথা আর ঘাড়ে কোনো লোম বা পালক নেই। আর সারা গায়ের পালক কেমন নিরেস কালো, শুধু গলাটা শাদামতো, ডানায় মাঝে-মাঝে শাদা ছোপ থাকে। ইনকারা তো কগুরের পূজো করে প্রায়-তাদের পুরাণে-উপকথার এর কথা কত আছে! এমন শিকারি পাখি আইরির ঈগলও নয়-হাজার-হাজার ফুট ওপর থেকেও

দেখতে পায় নিচে কোথায় ছোট শিকার ঘুরছে। ছোঁ মেরে নিচে নেমেই আস্ত-সব ভেড়া, ছাগল, গুয়ানাকো উড়িয়ে নিয়ে যায় পাহাড়চূড়ায় নিজের আস্তানায়।-

পাওয়ল হয়তো তার পুঁথিপড়া বিদ্যে জাহির করেই চলতেন, কিন্তু অন্যরা তখন চোখ ছানাবড়া করে দেখছেন কেমন করে সেই বিশাল কণ্ডর বৃত্তের মতো গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে নামছে নিচে, বাঁ দিকে। তবে কি শিকারের জন্যেই তার এই বিদ্যুৎক্ষিপ্ত ছোঁ? কে এই শিকার? রবার্ট?

ম্যাকন্যাবস তাঁর বন্দুক বাগিয়ে টিপ করছিলেন, কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই পাহাড়ের আড়ালে সেই কণ্ডর উধাও হয়ে গিয়েছে। সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো সে যেদিকে গেছে, সেদিকে। একটু পরেই তাকে দেখা গেলো আবার, সোঁ করে ওপরে উঠেছে, তার থাবায় বুলছে কে-একজন, ছটফট করছে। প্রায় চোখের পলকেই সে দুশো-আড়াইশো ফুট ওঠে গেছে ওপরে।

লর্ড গ্লেনারভনও বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছিলেন, গুলি ছুঁড়তে গিয়ে তার হাত কাঁপছে তখন, যদি ঐ দেহটা রবার্ট হয়,যদিতার গায়ে গিয়ে গুলি লাগে!ম্যাকন্যাবসততক্ষণে ঘোড়ায় চাপ দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু ঘোড়া টেপবার আগেই দূর থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এলো। সোজা গিয়ে গুলি লেগেছে করের গায়ে। জখম, গুলি-বেঁধা কণ্ডর থাবার বোঝা নিয়েই ঘুরে-ঘুরে আস্তে এসে নেমে পড়েছে নদীর ধারে।

পড়িমরি করে ছুটে গেলেন সবাই। করের ঠিক মাথায় গিয়ে গুলি লেগেছে। বন্দুক যেই ছুঁড়ে থাকুক, তার লক্ষ্য ছিলো অব্যর্থ! আর কণ্ডরের ডানার পালকের মধ্যে নিঃস্বাস

অচেতন পড়ে আছে রবার্টের মাথা। কঁপা হাতে রবার্টকে টেনে বার করে নিয়ে এলেন লর্ড গ্লেনারভন। বুকে কান পেতে শুনতে পেলেন অস্ফুট ক্ষীণ ধুকধুক আওয়াজ। অমনি আবেগে চৈঁচিয়ে উঠলেন, বেঁচে আছে-প্রাণের সাড়া আছে এখনও-বেঁচে আছে!

ম্যাকন্যাব্স গিয়ে চট করে পাহাড়ি নদী থেকে জল এনে রবার্টের চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলেন।

আস্তে-আস্তে চোখ মেলে তাকালে রবার্ট, কেমন ঘোর-লাগা দৃষ্টি, যেন কিছুই সে এখনও বুঝতে পারছে না। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদেই ফ্যালেন বুঝি গ্লেনারভন। তিনি জ্ঞান হারাননি বটে, কিন্তু তারও মাথার মধ্যেটা কেমন করছে, কিছুই বুঝতে পারছেন না যেন তিনি।

গুলিটা তো তারা করেননি-তবে গুলিটা করলে কে? কার এমন অচঞ্চল হাত, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা?

তার উত্তর অবশ্য পাওয়া গেলো তক্ষুনি। হাত-পঁচিশ দূরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো তাকে। যেন পাথরে-খোদাই-করা, পাহাড়ের গায়ে-বসানো কোনো কিংবদন্তির রাজা।

ছ-ফিটের ওপর লম্বা ঋজু সটান দেহ, কেশরের মতো চুলের ঢাল ফিতে দিয়ে বাঁধা, কপালে শাদা রং লেপা, মুখে লাল রং, দু-চোখের পাশে কালো-রঙের ছোপ। গায়ে পশুলোমের কুর্তা, পায়ে মোটা চামড়ার বুটজুতো, হাঁটু অন্ধি ফিতে দিয়ে বাঁধা।

তার পায়ের কাছে পড়ে আছে বন্দুক।

তাকাবামাত্র বোঝা যায় কী-প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তার। চোখমুখ থেকে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে।

চমকটা ভাঙতেই লর্ড গ্লেনারভন এগিয়ে গিয়ে তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন-তার বিহ্বল দৃষ্টি, আর মুখের ভাবই কৃতজ্ঞতা এমনভাবে ফুটিয়ে রেখেছে কারুই সেটা বুঝতে দেরি হয় না। গিরি আন্দেয়াসের এই রাজারও তা বুঝতে দেরি হয়নি।

পাএয়লও তখন এগিয়ে এসে তড়বড় করে এম্পানিওলে কত-কী বলে ফেলেছেন। কিন্তু সে-সব কথার কিছু যে এই রাজা বুঝতে পেরেছে এমন-কোনো ইঙ্গিত অবশ্য পাওয়া গেলো না। মেজর ম্যাকন্যাবস তার ভাঙা-ভাঙা এম্পানিওলে একটা কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলেন এই বিশাল মানুষটা এম্পানিওল জানে। আর তাই পাএয়ল যখন কথার তুবড়ি ছুটিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন সংলাপ হবে-কথার জবাবে কথা, কিন্তু পাএয়ল অনেক চেষ্টা করেও তাকে তার কোনো কথা বঝাতে পারলেন না।

কিছুই বুঝছে না কেন আপনার কথা? মেজর ম্যাকন্যাসের গলার সুরে এবার একটু ব্যঙ্গের সুর! এখনও এম্পানিওল উচ্চারণ আপনার রপ্ত হয়নি? আপনি কি এখনও ফরাশিতে এম্পানিওল বলে যাচ্ছেন?

পাএয়ল এতক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছিলেন, মেজরের কথা শুনে একটা বাক্যের মাঝখানেই থেমে পড়লেন। পকেট থেকে একটা দোমড়ানো বই বার করে বললেন, কেন-যে এত গণ্ডগোল হচ্ছে বুঝতে পেরেছি না তো? বই পড়ে কি আর উচ্চারণ শেখা

যায় না? এত ভালো একখানা বই, ধ্রুপদী-মহাকাব্যই-এই-যে এই দেখুন, উশ লিসিয়াদাস ।

এবার একটু আঁৎকেই উঠলেন লর্ড গ্লেনারভন । এ আপনি করেছেন কী, মঁসিয় পাঞয়ল? এ-যে পোৰ্তুগিজ মহাকাব্য-ভাশকু ডা গামার ভারতবর্ষের পথে বেরিয়ে পড়ার কাহিনী আছে যে এতে-লুইস ভাজ তে কামোয়েঙ্গ-এর লেখা-উনি তো ষোড়শ শতাব্দীর পোৰ্তুগিজ কবি

অ্যাঁ? আঁৎকে উঠলেন স্বয়ং পাঞয়লও, সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবার । সে কী? আমি কি তাহলে এম্পানিওল মনে করে এতদিন শুধু পুৰ্তুগিশই বলে গেছি? তাই তো বলি, আমি এত কথা বলে যাচ্ছি অথচ কেউ কিছু বুঝছে না কেন? যাক, তাতে আর কী হলো-এবার ব্রাজিলে গেলেই আমার এই ভাষা শেখা কাজে দেবে বলেই পাঞয়ল হেসেই কুটিপাটি । বইয়ের ভেতরটা টীকার সাহায্যে তন্নতন্ন করে পড়েছেন-অথচ কখনো খেয়াল করেও দ্যাখেননি ভাশকু ডা গামা কোন দেশের লোক-অথবা বহু-ব্যবহারে-মলিন ও হলুদ-হয়ে যাওয়া বইটা কোন ভাষায় লেখা ।

শেষটায় অবশ্য নির্ভর হলো মূকাভিনয়-আকারে-ইঙ্গিতে, কিঞ্চিৎকণ্ঠনিঃসৃত আওয়াজ ইত্যাদি মারফৎ এই পাহাড়ি মানুষটার নাম জানা গেলো-ইনি না-থাকলে আজই রবার্টের ভবলীলা সাজ হতো । তার নাম নাকি ক্রোনিদো, অর্থাৎ বজ্রশব্দ, সম্ভবত ইন্ডিয়ানদের ভাষা থেকে তর্জমা করেই এই ক্রোনিদো নাম দেয়া হয়েছে । তাকে । পেশায় সে গাইড । আরহেনতিনার বিশাল প্রেয়ারি, যার নাম তাদের ভাষায় পাম্পা, ক্রোনিদো সানন্দের তাদের সঙ্গে গিয়ে পার করে দিয়ে আসতে রাজি হলো । মার্কিন মুলুকে যাদের নাম

কাউবয়, আরুহেনতিনার ভাষায় তারাই গাইচো; ত্রোনিদো গাউচোই ছিলো, বিশাল একটা র্যানচের ভার ছিলো তার ওপর। কিন্তু তার পায়ে বোধহয় কুট করে কামড়েছিলো কোনো ঘুরঘুরে পোকা, একজায়গায়-তা সে যত বিশালই হোক-আটকে না-থেকে সারা পাম্পাস-এ ঘুরে-ঘুরে বেড়াবার জন্যেই সে গাইডের কাজ নিয়েছে। এখানকার বুনা বোঁপঝাড়ের পাতা ঘেঁচে রবার্টের জখমে তার রস লেপে দিয়ে সে রবার্টকে কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঙ্গা করে তুললো। তারপর সবাই এত উত্তেজনার পর একটু বিশ্রাম করে যখন সুস্থ হয়ে উঠেছে, তখন সে তাদের সবাইকে নিয়ে গেলো মাইল-চারেক দূরের এক পুয়েবলোতে-ছোট জনপদ, গ্রামই বলা যায়, ছোটো-ছোটো আদোবা বাড়ি, তাতে বাস চাষীদের, প্রধানত ভুটাই ফলায় তারা-আর ঘোড়ায় চড়ে পাম্পায় টহল দিয়ে বেড়ায়। তাদের সঙ্গে দরাদরি করে অভিযাত্রীদের সে কিনিয়ে দিলে সাতটা টগবগে ঘোড়া। নিজে সে অবশ্য কোনো ঘোড়া কিনলো না-তার দরকার নেই, নিজের ডেরায় তার আস্তাবল আছে, তবে বনে যখন শিকারে বেরোয় তখন সে কোনো ঘোড়া সঙ্গে নেয় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখা গেলো পুর্তুগিশ ভাষার চর্চা আপাতত মূলতুবি রেখে জাক পাঞ্চয়ল ত্রোনিদোর কাছে এস্পানিওল ভাষা শিখতে লেগে গিয়েছেন-কাস্তিইয়ের রাজা-রাজড়ার আভিজাত্যে ভরা আধো-আধো থ-থ ভরা এস্পানিওল নয়-লাতিন আমেরিকার কোকিস্তাদোরেরা এস্পানিওলকে সংস্কার করে অনেকটাই নিজেদের মতো করে নিয়েছে পাঞ্চয়ল এখন শিখতে শুরু করেছেন তাদেরই ভাষা।

আট

পাম্পার বিশালে

পরদিনই ক্রোনিদোর নির্দেশমতো অভিযাত্রীরা আরো-পুবের দিকে রওনা হয়ে পড়লেন।

পথে বেরিয়েই বোঝা গেলো ক্রোনিদো তার জন্যে কোনো ঘোড়া এখন চায়নি কেন। জঙ্গলের কাছে এসে মুখ থেকে বার করলে লম্বা একটানা এক অদ্ভুত আওয়াজ, লম্বা একটানা শিস যেন-আর অমনি জঙ্গলের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো আরহেনতিনার এক আশ্চর্যসুন্দর ঘোড়া, পেশল-মসৃণ দেহ, যেন গতিকেই কেউ একটা চামড়ার খাপে পুরে দিয়েছে, সে যখন কদম-কদম হাঁটে, তখনই তার বলিষ্ঠ পেশীগুলো রোদুরে হালকা ঢেউয়ের মতো নেচে-নেচে ওঠে।

ঘোড়া ছিলো বলেই যতক্ষণ সূর্য মাথার ওপর রইলো, ততক্ষণ ঘোড়া ছুটিয়ে-জোরে নয়, মোটামুটি দুলকিচালে চলেই-পেরিয়ে-আসা গেলো আটত্রিশ মাইল পথ। রাতের বেলায় এক নদীর ধারে ছাউনি ফেলে সবাই মিলে খাওয়াদাওয়া করা হলো, ঠিক হলো পরদিন ভোরেই ফের রওনা হওয়া হবে।

পরদিন দুপুর অর্ধি আগের দিনের মতোই তারা এগিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো দূর থেকে ধোঁয়ার মতো কী-একটা তীব্র ঘূর্ণি তুলে এগিয়ে আসছে। শুকনো হাওয়ার ঝড়। তোড়ে বয়ে যায় এই হাওয়া পাম্পার ওপর দিয়ে। প্রায় লু-র মতোই তপ্ত। অন্তত ব্যারোমিটারে পারদের চড়চড় করে ওপরে-ওঠা দেখে পাঞয়লের তা-ই মনে হলো।

পাঞয়লের মুখে তাই বলে কোনো শঙ্কার ছাপ নেই, বরং অন্যদেরও তিনি আশ্বাস দিলেন, বললেন, ভয় নেই। পারা যদি নিচের দিকে নামতো তবে বোঝা যেতে যে

হারিকেন শুরু হয়ে গেছে-সেই ঘূর্ণিঝড় তিনদিনের আগে থামতো কি না সন্দেহ। পথে যা-ই পেতো তাকেই উড়িয়ে দিয়ে দূরে আছড়ে ফেলতো। কিন্তু এ নেহাৎই শুকনো হাওয়ার খেলা, একটুক্ষণ সব তোলপাড় করবে, তারপর যেমন আচমকা এসেছিলো তেমনি আচমকা চলে যাবে। ব্যারোমিটারে যখন পারা উঠছে, তখন বোঝা যাবে এই ঝড় থেমে যাবে শিগগিরই-কয়েক ঘন্টার মধ্যেই।

আপনি জানলেন কী করে?

হুঁ-হুঁ, তার জন্যে কেতাব পড়তে হয়। অভিযাত্রীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

যা পড়েন সব মনে থাকে নাকি আপনার? আপনি কি নিজেই জ্যান্ত-একটা বই হয়ে উঠেছেন?

পাণ্ডায়লের মনে হলো এ-কথাটা আসলে তার মস্ত প্রশংসা বই আর-কিছু নয়। খুশি হয়ে মুচকি হেসে বললেন, বেশ, যা বললুম তা মিলিয়ে নেবেন।

পুর্তুগিশ ভাষাকে খেয়াল না-করে এম্পানিওল ভেবে চর্চা করে আসছিলেন অ্যাডিন; গল্পের বইতেঠিক যেমন কোনো অন্যমনস্ক অধ্যাপকের কথা পড়া যায়-ঐ সেই যিনি নাকের ডগায় চশমা থাকা সত্ত্বেও নিজের চশমা খুঁজে বেড়ান-তেমনি একটি ভূমিকায় আবারও অনিচ্ছুক ভূমিকা গ্রহণ করে একটু হয়তো-বা মুষড়েই পড়েছিলেন জাক পাণ্ডায়ল। পরে অবশ্য ক্রোনিদোর কাছে এম্পানিওলশিখতে-শিখতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, যাক, এই সুযোগে প্রায় মুফতেই পুর্তুগিশ ভাষাটাও শেখা হয়ে গেলো। কিন্তু তবুযৎকিঞ্চিৎ মনমরাই ছিলেন বইকি পাণ্ডায়ল। এখন এই শুকনো ধুলোর

তুফান সম্বন্ধে তাঁর পুথিপড়া জ্ঞান ফলিয়ে মনে-মনে তিনি আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলেন খানিকটা-তবে একটা ভয় কি মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো না? যদি তার কেতাৰি বিদ্যেটা না-ফলে? কিন্তু ঐ-যে বলেছিলেন জাঁক দেখিয়ে,বেশ, যা বললুম, মিলিয়ে দেখে নেবেন,সেটা কিন্তু শেষ অদি সত্যিই হয়ে গেলো। ঝড়টা অভিযাত্রীদের কাছে এলো সন্ধেবেলায়, আর মিলিয়ে গেলো কয়েক ঘন্টা পরে, রাত একটায়, সবকিছুর ওপর পুরু সরের মতো ধুলোর একটা আস্তর বিছিয়ে রেখে। আর তারপর থেকে তাকে আর পায় কে?তার উৎসাহ তারপর থেকে টগবগ করে ফুটে উঠেছে। এই অজানা বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাড়ি দিতে-দিতে প্রায়-একটা জ্যান্ত বইয়ের মতোই তিনি গাছপালা পাহাড়-পর্বতের নাম শুনিye গেছেন। আর তা শুনে সবচেয়ে অবাক হয়েছে ক্রোনিদো, প্রায় বোমকেই গেছে সে, মুখে অবশ্য কিছু বলেনি-এদিক থেকে সে পাঞয়লের ঠিক উলটো, প্রায় সবসময়েই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে, নেহাৎ দরকার না-হলে টু শব্দটিও করে না আর তাও যখন পাঞয়লকে ভাষা শেখাতে হয়, শুধু তখনই। কিন্তু পরে একটা সময় এসেছে, যখন তাকেও বেশ স্পষ্ট ভাষায় মত দিয়ে একটা কিছু বলতে হয়েছে।

ব্যাপারটা ঘটেছে এইভাবে : সড়ক কারমেনের কাছে এসে যখন শুনেছে যে এ-রাস্তা পেরিয়ে আরো-পুবদিকে যেতে হবে তাদের, সে গম্ভীরভাবে বলে উঠেছে, কিন্তু সেদিকে তো কিছু নেই।

কিছু না-থাকলেও যে তাদের যেতে হবে, এ-কথা বুঝিয়ে বলবার ভার পড়েছে তখন পাঞয়লের ওপর। গোড়ায় কিঞ্চিৎ বাণীবিনিময় হয়েছে বটে, তবে তাতে তেমন সুবিধে হয়নি, পাঞয়লের ভৌগোলিক জ্ঞান যতই থাকুক এম্পানিওল ভাষার জ্ঞান ভাসা-ভাসা, তাই শেষ অদি তাঁকে বালির ওপর ছবি এঁকে বোঝাতে হয়েছে তাদের ইচ্ছেটা কী।

এঁকে দেখাতে হয়েছে রাস্তার এদিকটায় সূর্য ডুবে যাচ্ছে, আর ওদিকটায় সূর্য উঠছে, সেই সঙ্গে সচিত্র বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে তাকে অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নিতে হয়েছে, মুখ দিয়ে দু-চারটে আওয়াজও করতে হয়েছে। গোড়ায় কিছু না-বুঝে ফ্যালফ্যাল করে ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকেছে ক্রোনিদো, তারপর গম্ভীরভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেও ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে না-পেরে মাথা চুলকেছে কেবল। তখন পাএয়ল যেদিকটায় সূর্য উঠছে এঁকেছিলেন সেদিকটাতেই পাশে এঁকে দেখিয়েছেন একটা গাছের গায়ে একজন লোক দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এবার আর ক্রোনিদোর নিশ্চয়ই ছবির কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। মুখ তুলে বলেছে : বুঝেছি। পুবদিকে কেউ-একজন বন্দী হয়ে আছে। সে কি আপনাদের লোক? আপনারা তাকে খুঁজে বার করতে চাচ্ছেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, রবার্টকে দেখিয়ে বলেছেন পাএয়ল, যাকে খুঁজতে যাচ্ছি তিনি এর বাবা।

ক্রোনিদোর বজ্রকণ্ঠের মুখটা তখন সহানুভূতিতে কোমল হয়ে এসেছে। তবে মুখে সে কিছুই বলেনি।

পাএয়ল তখন জিগেস করেছেন : এখানে কি ইন্ডিয়ানরা কাউকে কয়েদ করে রেখেছে বলে শুনেছো?

হ্যাঁ, আর অমনি সবাই চমকে উঠেছে ক্রোনিদোর কথা শুনে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সিংহের মতো অকুতোভয় আর বিশালহৃদয় এক শ্বেতাঙ্গকে বন্দী করে রেখেছে এখানকার ইন্ডিয়ানদের একটা দল-না, না, তারা কেচুয়াও নয়, আইমারাও নয়-অন্য-একটা ছোটো উপজাতি। কিন্তু সে তো বছর দুই আগেকার ব্যাপার। সে যদিও বলেছে এর বেশি আর-কিছু তার

জানা নেই, তবু তার মুখের ভাব দেখে সবাই আন্দাজ করেছে যে যে-কথাটা সে বলতে চায়নি, তা এই : অ্যাডিন পরেও সে-বন্দী কি আর বেঁচে আছেন?

তাদের সব আশা এই অনুক্ত আশঙ্কায় বেশখানিকটা ধাক্কা খেয়েছে বটে, তবু অভিযাত্রীরা কেউ হাল ছেড়ে দেননি। বরং, সে যে জানে একজন-কেউ এখানে বন্দী হয়েছিলো, এই তথ্যটাই তাদের উৎসাহ আরো চাগিয়ে দিয়েছে। এতদিনে তারা একটিবারও তো এমন-কোনো কথাও শোনেননি-এখন তো জানা গেছে যে অন্তত আশপাশে কোথাও ইণ্ডিয়ানদের একটি উপজাতি একজন শ্বেতাঙ্গকে বন্দী করে রেখেছে, আর তিনিই নিশ্চয়ই কাণ্ডেন গ্রান্ট! ফলে প্রচণ্ড তোড়জোড় করে নবোদ্যমে এগিয়ে গেছেন তারা, পরের দিন পেরিয়েছেন, কলোরাডো নদী, ইন্ডিয়ানদের তৈরি চামড়ার তৈরি ঝুলন্ত সেতুটা পেরিয়ে।

যে-কোনো যাত্রাতেই কখনও-কখনও এমন সময় এসে পড়ে, যখন তেমন-কিছুই ঘটে না। ধু নিয়মমাফিক এগিয়ে যেতে হয়, কখনও পথের একঘেয়েমিতে নিরুৎসাহিত হতে হয় না। কয়েকদিন একটানা চলে তারা গিয়ে পৌঁছেছেন মস্ত একটা হ্রদের ধারে, বছরকম খনিজ পদার্থ মেশানো তার জলে, ফলে সে-জলমোটেই মিষ্টি নয়, বরং কেমন একটা কটু অম্লকষায় স্বাদ তার জলের, সেইজন্যেই না কি এ-দেশের ভাষায় এই হ্রদের নাম : যে-জলাশয়ের জল তেতো।

যদি ভাবা গিয়ে থাকে যে রবার্টের ফাড়াতে যাবার পর আর ক্রোনিদোর সঙ্গে ভাব হয়ে যাবার পর, অভিযানকারীদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তবে বিষম ভুল করা। হবে। জাক পাঞ্চয়লের ফোড়ন সত্ত্বেও পরের কয়েকদিন কিন্তু অভিযানকারীদের আর দুর্ভোগের

সীমা ছিলো না। পাশা, অর্থাৎ লাতিন আমেরিকার বিশেষত আহেনতিনার-প্রেয়ারি, সব জায়গায় কিন্তু একরকম নয়। কোথাও সে সবুজে সবুজ, তৃণভূমির বিশাল বিস্তার, কোথাও-বা গেরিধূসর, সবুজের একফোঁটাও কোনো চিহ্ন নেই, যেন কোনো মরুভূমিই আচমকা পথ ভুল করে এই তৃণভূমিতে ঢুকে পড়ে আর বেরুতে চাইছে না। শুধু তা-ই নয়, সমভূমি যেমন আছে, মাইলের পর মাইল একইরকম, তেমনি আছে বন্ধুর রক্ষ জমি, উবড়ো-খাবড়ো, অসমতল রুঢ়-কর্কশ মাটি। যদি-বা ইউরোপ থেকে আসার পর এমন সবুজ দেখে গোড়ায় সকলের চোখ। জুড়িয়ে গিয়েছিলো, মুখে আর লাতিন আমেরিকার ভূদৃশ্যের প্রশংসা ধরছিলো না, দু-দিন পরেই যখন রক্ষধূসর গিরিভূমি নিস্তারহীন ছড়িয়ে গেলো, আর পানীয় জলের অভাবে শুধু কণ্ঠনালীই নয়, ধুলোমাখা শরীরগুলোও একুট ঠাণ্ডাজলের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো, তখন পাম্প সম্বন্ধে গোড়ার ধারণাটা বদলাতে বাধ্য হলো সবাই। গাউচো অর্থাৎ এখানকার কাউবয়রা যখন পনচোয় শরীর ঢেকে ঘোড়ায় চড়ে মাইলের পর মাইল টহল দিয়ে বেড়ায়, তখন তারা তাদের চলার পথে গভীর-সব কূপ খুঁড়ে জল বার করে নেয় : তারা জমির ধরন দেখেই টের পেয়ে যায় কোনখানে মাটি খুঁড়লে জল মিলবে! আর গাউচোরা এই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত বলেই প্রস্তুত ও সুসজ্জিত হয়ে আসে-কাণ্ডেন গ্রান্টের সন্ধানে বেরিয়ে-পড়া লর্ড গ্লেনারভনের দল কিন্তু পাম্প সম্বন্ধে কিছুই না-জেনে, কোনোভাবেই তৈরি না-হয়ে, এখানে ঢুকে পড়েছেন। পরের জলাশয় অনেক দূরে, এখানে আশপাশে এমনকী তেতো জলেরও কোনো কূপ নেই।

শেষটায় প্রায় যেন ধুকতে-ধুকতেই চলছিলো ক্লান্ত, অবসন্ন, অভিযাত্রীর দল। ঘোড়াগুলো অন্ধি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আছে। যাত্রার শুরুতে তাদের যে দুর্জয় গতি ছিলো, সেটা এখন প্রায় স্মৃতি মাত্র-অর্থাৎ এই দুর্গম অঞ্চলটা যে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবেন, তারও কোনো

জো নেই। শুধু ক্রোনিদো আর তার তেজিয়ান ঘোড়াটাই সুখেদুঃখেনির্বিকার ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে চলেছে।

এরই মধ্যে একদিন হাওয়ায় ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া গেলো। আচমকা হা-হা করে হেসে-ওঠা লেলিহান দাবানল নয়, মানুষের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড। অন্তত সেটাই ছিলো তাদের পথপ্রদর্শকের অভিমত : বেঁটে ঝোঁপগুলোয়, আগাছার বনে, প্রচুর পোকামাকড় থাকে-এ আগুন জ্বালিয়েছে গাউচোরা, পোকা মারবে বলে-তবে তা প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর মাইল দূরে হবে। এখানে সমতল প্রান্তর বলে অনেক দূর থেকেই গন্ধ আসছে। শুধু পোকামাকড় নেই ঝোপে-ঝোপে, জায়গায়-জায়গায় আছে মশার ঝক। পোকামাকড়ের কথা শুনে পাএয়ল তাঁর বিদ্যে জাহির করতে গিয়েছিলেন, পুথিপড়া জ্ঞান ফলিয়ে ফিরিস্তি দিতে বসেছিলেন কত অসংখ্য ধরনের পোকামাকড় পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু মশার কামড়ে তার বিদ্যেবাগিশ শরীরখানা যখন চাক-চাক হয়ে ফুলে গেলো, মেজর ম্যাকন্যাক্স ফোড়ন কেটেছিলেন : সে কী! হাজার ধরনের পোকামাকড় তো নয়, নিছক একজাতের তুচ্ছ মশা, তার কামড়েই আপনি অমন নাজেহাল হয়ে পড়লেন! পাএয়ল শুধু চিচি করে বলেছিলেন : মশার কামড়ে ঘাবড়ে যাচ্ছি কি সাথে। এখানকার মশারা পড়েছি ম্যালেরিয়া রোগ বয়ে নিয়ে বেড়ায়। আরেকদিন গাউচোদের একটা ছোটোদলের মুখোমুখি পড়েছিলেন তাঁরা, বেশিরভাগই মেস্তিসো, দো-আঁশলা, শ্বেতাঙ্গ আর ইন্ডিয়ানদের মিশেল। তারা দূর থেকে এই দলটাকে দেখে অন্যধার দিয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে পিঠটান দিলে; পাএয়লের অনুমান, তারা নির্ঘাৎ এঁদের দস্যুদল বলে ভেবেছে। মেজর ম্যাকন্যাসের মন অবিশ্যি এ-কথায় আদপেই সায় দিতে চায়নি। তিনি বরং খুনশুটি করে নানারকম ফোড়ন কেটে পাএয়লকে চটিয়ে দিতে চাইলেন। তাতে অন্তত পথের কষ্ট একটু লাঘব হবে। এ-সব কথাকাটাকাটিতেই সকলে অন্তত সারাক্ষণই ক্লান্তির কথা ভাববে না।

পাণ্ডয়ল প্রায় ফেটেই পড়েছিলেন তার ফকুড়িতে, মেজাজ হয়ে উঠেছিলো তিরিফি-যেটা একটু আশ্চর্যই, কেননা মানুষটি এমনিতে ভারি দিলখোলা, সদাশয়, একটু মজারও আছেন (যদিও নিজে টের পান না তিনি কতটা মজার মানুষ)।

আর হা-হা করে বয়ে যায় রোদুরে-তাতা উদ্দাম হাওয়া, ধুলোর ঝড় তোলে। তবু আশায় বুক বেঁধে সবাই চলেছে কখন পৌঁছুবে পরবর্তী জলাশয়ে-লেক সালিনার তীরে।

কিন্তু পথশ্রমে আর তৃষ্ণায় জেরবার হয়ে লেক সালিনায় এসে দেখা গেলো, শুকনো মরা খাত, একফোঁটা জল নেই, গরমে সব জল শুষে নিয়েছে কেউ যেন এক গণ্ডুষে, খাতটায় মাটি পড়ে আছে ফুটিফাটা! এবার তাহলে খরা কী-রকম ভয়াল হয়েছিলো? এককালে তো বড়োলোক কোনকিস্তাদোরেরা বুয়েনোস আইরেস থেকে এই জলাশয়ের জল নিয়ে যেতো, যেহেতু এই জলে খনিজ পদার্থ আছে, চিকিৎসকদের মতে তা নাকি প্রায় মৃতসঞ্জীবনী-এত স্বাস্থ্যদায়ক, বলকারক। রোদুরের-আঁচে এখন কি না সেই জলাশয়ের জল শুষে গিয়েছে। শুধু কোথাও-কোথাও কাদামাখানো এক-আধফোঁটা জল চিকচিক করছে, শুধু যেন আয়নার মতো কতগুলো হতাশ মুখকে ফিরিয়ে দেখাবে বলেই, শুধু ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন এই ক-ফোঁটা জল বয়ে গেছে-তলানি।

জল পাবে প্রত্যাশা করে এসেছিলেন বলেই জলাশয়ের তলদেশটাকে তাদের কাছে ঠেকলো খরামাটির অটুহাসির মতো। আর সেই সময়ে তাদের কাছে একটা নতুন উপায় বালালে তাদের পথপ্রদর্শক। সে বললে দলটাকে দু-ভাগে ভাগ হয়ে দু-দিকে যেতে হবে। একদল যাবে ৩৭° ডিগ্রি সমান্তর ধরে নাকবরাবর, সোজা সামনে-তিরিশ-বত্রিশ মাইল দূরে একটা ছোট নদী আছে, গুয়ামিনি, তাকে লক্ষ্য করে। সে-দলটায় লর্ড গ্লেনারভন

আর রবার্টের সঙ্গে রইলো পাম্পারই বজ্রনিদাদ-ক্রোনিদো। অন্যদলটা যাবে ঘোরাপথে, মাইল-পাঁচাত্তর যেতে হবে তাদের, ঘোরাপথ হলেও দক্ষিণগামী এই পথটা সহজতর। অতটা পথ ঘুরে যাবে বলেই পথ বেঁকে গিয়ে দল দুটিকে মিলিয়ে দেবে একসময়।

পরের দিন ভোরবেলায়, রোদ তেতে ওঠবার আগেই, বেরিয়ে পড়লো সবাই। ঘোড়ার টের পায় কোথায় কোন দিকে জল আছে। হাওয়ায় যেন জলের সোঁদা গন্ধ পায় তারা। ক্রোনিদোর ঘোড়াই শূঁকে-কে শেষটায় বেলাতিনটে নাগাদ তাদের নিয়ে এলো গুয়ামিনি নদীর ধারে-প্রায় মরীয়ার মতো চেষ্টা করেই ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন তাঁরা, তাই বেলা পড়ে যাবার আগেই এসে পৌঁছেছেন নদীর ধারে। অবশেষে, তৃষ্ণার শান্তি : জলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জল খেয়ে বাঁচলো সবাই-ঘোড়া আর মানুষের মধ্যে জলপানের ধরনে কোনো তফাত রইলো না। পাম্পা বোধহয় একসময় এইভাবেই আধুনিক মানুষকে আদিম মানুষে বদলে দেয়-উবু হয়ে বসে, বা শুয়েই বলা যায়, সেই দূর-অতীতের মানুষের মতোই জলপান করলেন লর্ড গ্লেনারভনরা।

জল যেই অবসন্ন মানুষগুলোর সাড় ফিরিয়ে আনলে, অমনি মনে হলো একদিন ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও হয়নি-তৃষ্ণার জল ছিলো না বলে তখন কারু নজরই ছিলো না ভোজ কী জুটলো। এবার মনে হলো অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে যদি কোনো শিকার জোটে-তবে নিছক অপেক্ষা করেই সময় কাটাতে হবে না তাদের, বরং অন্যদের জন্যে যদি কোনো ভরিভোজের ব্যবস্থা করা যায় তবে সকলকেই তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে-বিশেষত ক্রোনিদো যখন জানালে এখানে জল আছে বলেই আশপাশে জীবজন্তুর দেখা মিলবে-এর আগে তো কেবল গেছে ধু-ধু শুকনো খরায়-ফাটা জমি।

শিকারের নামে রবার্ট নেচে উঠেছিলো। তারই উৎসাহে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন লর্ড গ্লেনারভন। কিছুদূর যাবার পরই দেখা গেলো পিপীলিকাভুকদের-আর্মাদিলো-বর্মের মতো কঠিন আঁশেভরা ছোটো-ছোটো জীব-ছোটো-ছোটো কীটপতঙ্গ খেয়েই তারা বাঁচে, প্রধান খাদ্য অবশ্য পিঁপড়েই, যেজন্যে নাম পিপীলিকাভুক; তবে এদের শিকার করা ভারি কঠিন, একটু ভয় পেলেই তারা গুটিয়ে যায় একটা উলের বলের মতো, আর বর্মের মতো কঠিন আঁশ চারপাশে একটা ঢাকা তৈরি করে তোলে। ক্রোনিদো বলেছিলো, এই কঠিন আঁশের তলায় আছে সুস্বাদু নরম মাংস-লাতিন আমেরিকার এই জীব ভয় পেলেই তার বর্মের বলের মধ্যে ঢুকে পড়ে গড়িয়ে গিয়ে গর্তে ঢোকে, বিদ্যুৎবেগে, অতএব দেখামাত্র গুলি করতে হবে। অনেকবার চেষ্টার পর রবার্ট শেষকালে একটি আর্মাদিলো শিকার করতে পেরেছিলো। সেই মাংসে তাদের দিব্যি ভোজ হয়ে গেলো, কিন্তু তবু অন্যদের কোনো দেখা নেই। এদিকে রাত হয়ে আসছে।

ক্রোনিদো বলেছিলো জল যেহেতু আছে, অতএব থাকার কোনো আস্থানাও যা-হোক মিলে যাবে। আর মিলেও গেলো অবশ্যি : একটা ভাঙাচোরা র্যান্চের কোর্য়ালে-সেই-যেখানে র্যান্চের জীবজন্তু রাখা হয়, খোঁয়াড়ই আর-কি একধরনের। গাছের গুঁড়ি, ডাল, কাঠের ফালি-সব দিয়ে তৈরি করা, ওপরে একটা ছাউনি আছে, তিনদিক বন্ধ, আরেকদিকে আড়কাঠ দিয়ে আটকানো দরজা, আড়কাঠগুলো গেছে সমান্তরভাবে, সেগুলো তুলে নেয়া যায়, অমনি সামনেটা পুরো হাট করে খোলা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় তারা একে বলে রামাদা। অর্থাৎ, একদিক দিয়ে, এখানে শোয়া মানে খোলা জায়গাতেই শোয়া, তবে একদিক থেকে। নিশ্চিত। পরিত্যক্ত, ভাঙা র্যান, কেউ কোথাও নেই; তাছাড়া রামাদার মাথার ওপর তো ছাউনি আছে একখানা। শুতে যাবার আগে কিছু কাঠ জোগাড় করে জড়ো করে রাখলে তারা-কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে, পরে

রান্নাবান্নার কাজে সুবিধে হবে। কিছু খড় অদি জুটে গেলো তাদের, খড়ের বিছানায় আয়েস করে শোবামাত্র গাঢ় ঘুম, এই ক-দিনের অবিরাম পরিশ্রমের পর শরীর ভেঙে অবসাদ নেমেছিলো, তাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে মোটেই কোনো সময় লাগেনি।

কিন্তু নিশুত রাতে, তখন মাবারাত পেরিয়ে গেছে বোধহয়, কেমন-একটা অস্বস্তিতে ক্রোনিদোর ঘুমটা ভেঙে গেলো। অন্যরা ঘুমিয়ে প্রায় কাদা, চারপাশে অন্ধকার; ক্রোনিদো ঠিক বুঝতে পারলে না অমনভাবে হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেছে কেন। তার জীবনটা শিকারির, রাত-বিরেতে অজানা-অচেনা বনে-বাদাড়ে তাকে গুতে হয় দরকার হলে, ঘুমটা তার স্বভাবতই পালা-যেন ঘুমের মধ্যেও তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় সারাক্ষণ সজাগ থাকে। অনেকক্ষণ ধরে চুপটি করে সে কোর্যালের খুঁটিগুলোর ফাঁক দিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। উঁহ, না, কিছুরই কোনো সাড়া নেই। কিন্তু তবু তার ঘুম এলো না। তার ইন্দ্রিয়বোধ প্রখর, সজাগ-তারাই তাকে আগে থেকে হুঁশিয়ার করে দেয়। তার অবচেতন মন ঘুমের মধ্যেও যেন কোনো বিপদের গন্ধ পেয়েছে।

ঘোড়াগুলোর মধ্যে তারই ঘোড়াটি শুধু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে-যেন ইশারা পেলেই ছুটবে ক্ষিপ্ৰগতিতে-তার চটকা ভেঙে যাবে। অন্য ঘোড়া দুটো মাটিতে নেতিয়ে শুয়ে আছে-তাদের সম্ভবত এতটা ধকল সহ্য করা অভ্যেস নেই।

ক্রোনিদো উৎকর্ণ হয়ে শুয়ে রইলো, অনেকক্ষণ-বোধহয় একঘন্টা হবে-শুয়ে রইলো মানে, রইলো ঠিক আধশোয়া অবস্থায়, যে-কোনো মুহূর্তে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠবে, প্রয়োজন বোধ করলে। এই ঘুম আর জাগরণের মধ্যে অস্পষ্টতার মাঝখানে হাজার ক্লান্ত থাকলেও সে কিন্তু সুপ্রস্তুত।

হঠাৎ, দূরে, আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ছোটো-ছোটো কতকগুলো আলোর ফোঁটা। এমন সময় ক্রোনিদোর ঘোড়াটাও কেমন অদ্ভুত ছটফট করে উঠলো। বিপদের গন্ধ সেও পেয়েছে।

অন্ধকারে, ঘাসের মধ্যে অস্ফুট সর-সর আওয়াজ-কারা যেন সরে-সরে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন তারই মধ্যে একসঙ্গে গল্ল করে উঠলো বুনো খ্যাপা কুকুর আর নেকড়ে। এই অদ্ভুত গর্জন শুনেই ক্রোনিদো তার বন্দুক তুলে অন্ধকার লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়লো-আর বন্দুকের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরেই আবার সব আগের মতো নিঃশ্বাস হয়ে এলো। কিন্তু ততক্ষণে, বন্দুকের আওয়াজ শুনে, ধড়মড় করে উঠে বসেছেন লর্ড গ্লেনারভন, আর রবার্টও তথৈবচ।

ক্রোনিদো শুধু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, জাগুয়ার!

অর্থাৎ ট্রপিক্যাল আমেরিকার সেই বৃহৎ বনবিড়াল, যে লেপার্ডের চাইতেই যে আকারে বড়ো ও পৃথুল তা-ই নয়, তার চাইতেও ধূর্ত ও শক্তিশালী, খয়রির সঙ্গে হলদে মেশানো পেশল গায়ে কালো-কানো ফুটফুট ছোপ।

ক্রোনিদোর কথাটাকে যেন প্রমাণ করে দিতেই আবার শুরু হয়ে গেছে রাগী গরগর আওয়াজ। যেন দল বেঁধে এসেছে কত জাগুয়ার, আর খিদেয় হন্যে হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুঝেই যে পারে সামনে এগিয়ে আসতে চাচ্ছে।

একটু আশ্চর্যই। এরা এমনিতে আসে নিঃশব্দে, চুপি-চুপি ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপর, অব্যর্থ কৌশলী লাফে, ছিঁড়ে খায় শিকারকে, তারপর, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়।

এই রেযারেষি করে গরগর করে নিজেদের জানান দিয়ে কখন এসে চড়াও হয়েছে তখন বোঝাই যায় কতটা ক্ষুধিত এরা, কতটা বুভুক্ষু, আর তাই, কতটা হিংস্র হয়ে উঠেছে এখন।

কিন্তু এখন এ নিয়ে ভাবার কোনো ফুরসৎ নেই। এই নিশুত রাতের আতঙ্কে যে-করেই হোক ঠেকাতে হবে। প্রথমে যত কাঠকুটো ছিলো, সব জড়ো করে র্যানচের মুখে জ্বালিয়ে দেয়া হলো-এই আগুনের গণ্ডি পেরিয়ে আসতে এরা ভয় পাবে, তাছাড়া অন্ধকার দূর হয়ে যাবে বলে এই মরণদূতগুলোকে চর্মচক্ষে দেখাও যাবে। আর একটু বেশামাল দেখলেই, বেগতিক দেখলেই, অগত্যা চালাতে হলো বন্দুক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কেননা গুলি বেশি নেই, ভয় পেয়ে সব একসঙ্গে মুহূর্মুহ গুলি ছুঁড়ে খরচ করা চলবে না, গুনে-গুনে হিশেব করে খরচ করতে হবে গুলি, সাবধানে-যাতে একটা গুলিও না-ফসকায়, যাকে তাগ করে গুলি করা হবে সরাসরি তার গায়ে যেন তা বেঁধে।

কিন্তু গুলি এত কম ছিলো যে তাও একসময় শেষ হয়ে গেলো। আহত, ত্রুদ্ব, হন্যে, ক্ষুধিত নেকড়েরা তখনও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, গুলিগোলার কোনো পরোয়া না-করেই। ফলে গুলি ফুরিয়ে যেতে শুরু হয়ে গেলো বন্দুকের বাঁট আর ছুরি দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা। আর আগুনের কুণ্ডও ক্রমে, জ্বালানির অভাবে, নিভুনিভু হয়ে আসছে। জাগুয়ারের

দল কিন্তু এবার র্যান্চের পেছন দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছে। পারলে বুঝি খুঁটিগুলো উপড়েই ফ্যালে।

এবার সটান উঠে দাঁড়ালে ক্রোনিদো, তার ঘোড়াটাও এতক্ষণ বেদম অস্থির হয়ে ছটফট করছিলো, নাক দিয়ে নিশ্বাসে ছড়াচ্ছিলো গরম হলকা, চোখ দুটোয় যেন আগুন জ্বলছিলো। লাগাম হাতে নিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে যেই সে চাপতে যাবে, অমনি লর্ড গ্লেনারভন তার হাত চেপে ধরলেন।

অস্থির-একটা মূকাভিনয় মারফৎ ক্রোনিদো বোঝাবার চেষ্টা করলে তাদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখেই নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে না, বরং সে বেরিয়ে গেলে জাগুয়ারেরা ভাববে যে এতক্ষণে বাগে পাওয়া গেছে। শিকারকে, তার পেছন-পেছন ছুট লাগাবে-কিন্তু ক্রোনিদোর ঘোড়া হাওয়ার চাইতেও বুঝি জোরে ছোটে, তাই জাগুয়ারগুলো তার পেছনে প্রাণপণে ছুটে এলেও তার নাগাল ধরতে পারবে না, সে জাগুয়ারগুলোকে প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাবে দূরে, আর তাতে লর্ড গ্লেনারভন আর রবার্ট আপাতত বেঁচে যাবেন।

র্যান্চের মুখটার কাছে তখন জাগুয়ারেরা নেই। কিন্তু ক্রোনিদো আর লর্ড গ্লেনারভন সন্তর্পণে গিয়ে যখন আস্তানার মুখটা দেখছেন, জাগুয়ারেরা কোথায়, সেই সময়ে দুরন্ত ঝড়ের গতিতে ক্রোনিদোর ঘোড়ায় চেপে তাদের পাশ দিয়ে অন্ধকারে ছুটে চলে গেলো রবার্ট, আর পেছন-পেছন অমনি ধেয়ে গেলো হন্যে ও ক্ষুধিত জাগুয়ারেরা।

ক্রোনিদো আর লর্ড গ্লেনারভন শুধু হতভম্ব নন, আঁৎকেও উঠেছেন। এ কী করলে রবার্ট?

এদিকে ভোর হতে তখনও ঘন্টা দু-এক বাকি। কী-যে করবেন, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না লর্ড গ্লেনারভন। শুধু ছটফট করা ছাড়া, অধীর হয়ে আলো ফোটবার অপেক্ষা করা ছাড়া, আর কোনোকিছু করণীয় নেই। আলো ফুটতেই আর কালক্ষেপ নয়— দুজনে ঘোড়ায় চেপে পশ্চিমদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

খানিকটা দূর গেছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন পর-পর কতগুলো বন্দুকের আওয়াজ। তাকিয়ে দ্যাখেন, পাএয়লরা ছুটে আসছেন, আর তাদের সকলের পুরোভাগে স্বয়ং রবার্ট, তাকে দেখে অক্ষতই মনে হয়, গায়ে আঁচড়টুকুও লাগে নি।

লর্ড গ্লেনারভন স্বস্তির শ্বাস ফেলে রবার্টকে জড়িয়ে ধরলেন। জিগেস করলেন, তুমি অমনভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিলে কেন, রবার্ট?

অমনি, চটপট, সোজা জবাব এলো : বা-রে, ক্রোনিদো এর আগে একবার আমায় বাঁচায়নি? আমায় তো তার একটা প্রতিদান দিতে হয়। তাছাড়া আপনাকেও নিরাপদ রাখা কর্তব্য আমার : কারণ আপনিই তো চলেছেন আমার বাবাকে উদ্ধার করতে?

এহেন যুক্তির কাছে আর কোনো কথাই চলে না, তবে লর্ড গ্লেনারভনের দায়িত্ববোধের মধ্যে রবার্টের এই দুর্দান্ত কাণ্ডটা কাটার মতো খচখচ করে বিঁধছিলো। এই কিশোরের যদি কিছু হয়, তবে তার দায় তো তাকেই সামলাতে হবে। পরে কখনও রবার্টকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে আচ্ছা করে ধমকে দেবেন ভেবে তখন আর এ নিয়ে তিনি

কোনো উচ্চবাচ্যই করলেন না, কেননা এই সমূহ বিপদ থেকে এভাবে উদ্ধার পেয়ে সবাই তখন উচ্ছ্বাসে প্রায় যেন ভেসে যাচ্ছে-বলাই বাহুল্য, পাণ্ডুরলের উচ্ছ্বাসটাই অন্যসকলের চাইতে যৎকিঞ্চিৎ বেশি।

উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটু রাশ টেনে ধরবার পরেই সবাই দল বেঁধে ফিরে এলেন র্যান্চে। গত রাতের হুলুস্থলু যুদ্ধে বেশ কিছু জাগুয়ার অক্লা পেয়েছে-কিন্তু র্যান্চের খুঁটিগুলোকে তারা খুব-একটা অক্ষত রাখেনি। হামলাটা যেমন প্রচণ্ড আর ভয়ংকর হয়েছিলো, তেমনি তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টাটাও হয়েছিলো প্রচণ্ড আর জীবনপণ। কত-যে জাগুয়ার এসেছিলো কে জানে, আর তাদের সঙ্গে লড়েছিলো কি না মাত্র তিনজনে-যতই মরীয়া হয়ে লড়াই করুক, সংখ্যায় যে তারা নগণ্যই ছিলো, সে-কথাটা অস্বীকার করবে কে।

অন্যদের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ মাংস তুলে রেখেছিলো ত্রোনিদো। তাই দিয়েই হলো প্রাতরাশ, বেশ আয়েশ করেই খাওয়া গেলো, তারিয়ে-তারিয়ে, কিন্তু তাতে কি আর সকলের খিদে মেটে! অর্থাৎ উত্তেজনার ধকলটা একটু কমলে ফের তাদের খাদ্যসংগ্রহের কাজটায় মনোযোগ দিতে হবে।

সেই-কবে অক্টোবরের চোদ্দ অরিখে, তারা বেরিয়ে পড়েছিলেন তালকাউয়ানো থেকে। তারপর দিনের পর দিন কেটেছে, কিন্তু আরহেনতিনার এই বিশাল তৃণভূমি যেন আর ফুরোয়ই না। প্রায় একটানাই পথ চলেছেন তারা। বন্য জন্তুর অতর্কিত উপদ্রবে আর হামলায় দু-একবার তাদের থমকে পড়তে হয়েছে বটে, কিন্তু সে নেহাৎই সাময়িকভাবে। তাছাড়া আর-কারু সঙ্গেই তাদের দেখা হয়নি। অথচ সেটাই বরং একটা প্রহেলিকা। পথের মাঝে-মাঝে ইন্ডিয়ানদের বসতি চোখে না-পড়ুক, দলছুট কোনো ইন্ডিয়ানের

সঙ্গেও তাদের দেখা হয়নি। অথচ এসব অঞ্চলে নাকি আহেতিনার ইন্ডিয়ানদের দেখা পাওয়া যায় প্রায়ই। শুধু একবার তিন জন সশস্ত্র ঘোড়সোয়ারকে দেখা গিয়েছিলো দূর থেকে, আর তারা ছিলো ইন্ডিয়ান-কিন্তু ঐ দূর থেকেই যা দেখা-কেননা তাদের দেখেই অন্যদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তারা ঝড়ের বেগে চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলো। এরা কি তবে ইন্ডিয়ান ছিলো না? ছিলো দো-আঁশলা, ক্রেয়োল বা মেস্তিসো, আর গাউচো বা কাউবয় হিশেবেই যারা খেতখামার সামলায়? পাঞয়লের মতে অবশ্য এরা মোটেই গাউচো নয়, বরং বান্দিতো, দস্যুতার চোখে সবাইকেই বোধহয় ডাকাতির মতো দেখায়।

তেসরা নভেম্বর পাম্পার অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছুবার পর ক্রোনিদো পরামর্শ দিলে, আরো ষাট মাইল পথ পেরিয়ে ফোর্ট ইনডিপেনডেন্সে গিয়ে খোঁজ করা যাক, কাপ্তেন গ্রান্টকে যারা পাকড়ে কয়েদ করে রেখেছে সেই ইন্ডিয়ানদের কোনো খোঁজ মেলে কি না। প্রস্তাবটা সকলেরই মনে ধরলো। এখানে র্যান্চের মধ্যে খবরদারির চিহ্ন বেশ চোখে পড়লো। এই বিশাল তৃণভূমিতে পালে-পালে গোরুমেষভেড়া চরে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেকটা জন্তুর গায়ে গরম লোহার ছ্যাকা দিয়ে মালিকের নাম মোহর করে দাগানো, আর তাদের আগলে আর সামলে নিয়ে বেড়াচ্ছে কুকুর। শিক্ষিত কুকুর এ-সব, ভারি ওস্তাদ, নিজের কাজ ভালোই জানে। কখনও-কখনও এমনও হয় যে দু-চারজন মাত্র গাউচো থাকে কোনো র্যান্চে, তবে তাদের সঙ্গী থাকে দুর্দান্ত সব ঘোড়া আর অনেকগুলো করে পোষমানানো শেখানোপড়ানো কুকুর।

ফোর্ট ইনডিপেনডেন্স বা আজাদগড় সমুদ্র থেকে হাজারফিট উঁচুতে। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, যাতে শত্রুর আক্রমণ ঠেকানো যায়। এককালে যখন এটা তৈরি হয়েছিলো তখন লাতিন

আমেরিকার রাজনৈতিক ভূগোল অনবরত ভোল পালটাচ্ছে-তখন মুহূর্মুহু চলেছে যুদ্ধবিগ্রহ, আর যতবারই হাত পালটাক সবসময়েই ছিলো একটা সাজো-সাজো রব।

অভিযাত্রীরা অবশ্য এখন আজাদগড়ে পৌঁছে একবারেই হতভম্ব হয়ে গেলেন।

কেল্লার ভেতরে বেশ উৎসাহভরে এখন যারা কুচকাওয়াজ করছে তারা প্রায় সবাই ছেলেমানুষ। উনিশ-কুড়ি বছরের চাইতে বড়ো-কেউ নেই-কিন্তু দলে-দলে আছে ছোটো ছেলে, তাদের বয়স সাত-আট থেকে শুরু। ছোটোদের পরনে পনচা, কোমরে বেল্ট দিয়ে বাঁধা। মস্ত লম্বা তলোয়ারগুলো কোনো-কোনো ছেলের নিজের দৈর্ঘ্যের চাইতেও দীর্ঘ হবে, তাছাড়া আছে রুক, আর সে-সব সমেতই তারা ফরাশি কেতায় কুচকাওয়াজ করে চলেছে। বয়েস যার যে-রকমই হোক না কেন, সকলেরই গড়ন আর মুখচোখ একই রকম, সম্ভবত একই বাড়ির ছেলে। আর এরা যদি সবাই ভাই-ভাই হয়, তবে তাদের কুচকাওয়াজ করাচ্ছে সবচেয়ে বড়োভাই-সেই-ই স্বভাবতই এই ইউনিটের সর্দার। এ-রকম ইউনিট নাকি অনেক আছে এখানে-পাণ্ডয়লের পণ্ডিতি বয়ান-কেননা এখানে একেকটা পরিবারে অনেক সন্তান জন্মায়, তবে পাণ্ডয়লের পড়া বিদ্যের বুলি কি না, তাতে একচিলতে নুন ছিটিয়ে নিতে হয় সবসময়।

ফোট ইনডিপেনডেন্স বা আজাদগড়ের তত্ত্বাবধানের দায় সার্জেন্ট মানুয়েলের ওপর। জন্মেছিলেন ফ্রান্সে, কিন্তু এখন এখানকার মেয়ে বিয়ে করে তিনি এখানকারই একজন হয়ে গেছেন-কস্মিনকালেও আর ইওরোপে ফেরবার মল্লব নেই তার।

সার্জেন্ট মানুয়েল মানুষটা খোলামেলা, দিলদরিয়া, হাসিখুশি।

উঁহু, না কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ তিনি রাখেন না। তাঁর নামই তিনি নাকি বাপের জন্মে শোনেনি। তবে বেশ-কয়েক বছর আগে একজন ইতালীয় আর একজন ফরাশিকে ধরে আনে ইন্ডিয়ানরা। ইতালীয়টির হস্তিত্ব আর বদমায়েশি দেখে তাকে সাজা দেয়া হয় : প্রাণদণ্ড। তবে ফরাশি ভাগ্যস্বেষী বা ফরচুনহানটার বা সম্পদশিকারি পালিয়ে যান। না-না, এঁদের কেউই ইংরেজ ছিলেন না-গ্রেটব্রিটেনের এঁরা কেউ নন!

এদিকটায় যে ইণ্ডিয়ানদের কেন দেখা যাচ্ছে না, সেই ধাঁধারও একটা সমাধান বাৎলে দিলেন সার্জেন্ট মানুয়েল। পারাগুয়াইয়ের সঙ্গে বুয়েনোস আইরেসের একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলেছে-ইন্ডিয়ানরা সবাই গেছে সেখানেই-কেউ লড়াই করতে, কেউ-বা লুঠপাট করার সুযোগ খুঁজতে।

সার্জেন্ট মানুয়েলের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেলো। কাপ্তেন গ্রান্ট এখানকার ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দী হননি-অর্থাৎ এখান থেকে অ্যাটলান্টিকের তীর অর্ধ পুরো তল্লাটটাতেই তার দেখা আর পাওয়া যাবে না। এই মূলুকেই নেই তিনি।

পাণ্ডয়ল বললেন : ঐ চিরকুটটা আরেকবার ভালো করে দেখা দরকার। কাপ্তেন গ্রান্ট আদপেই কোনোদিন এই নতুন মহাদেশের মাটিতে তার পা রেখেছেন কি না সন্দেহ। এই বিশাল পাম্পায় যখন নেই, তখন গোটা লাতিন আমেরিকাতেই নেই। অথচ কোথায় আছেন, তার হদিশ দেয়া আছে এই চিরকুটটাতেই। ধাঁধার মতো ঠেকছে বটে, তবে সব ধাঁধারই তো সমাধান হয়। এর সমাধান যদি করতে না-পারি, তাহলে আমার নাম আর জাক পাণ্ডয়লই নয়!

তার এমন লম্বাইচওড়াই আশ্বাস সত্ত্বেও অবশ্য রবার্ট কী-রকম যেন মিইয়ে গেলো।
এত-দূরে নূতন জগতে এসেও বাবার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

নয়

খ্যাপাজল আর পাখির বাসা

আজাদগড় থেকে টানা দেড়শো মাইল গেলেই-অ্যাটলান্টিক।

এতটা পথ যখন পেরিয়ে আসা গেছে, তখন ঐ বাকি দেড়শো মাইল পেরুতেও তেমন
কী আর ঝামেলা হতে পারে? বিশেষত এখন যখন ধরেই নেয়া গেছে যে কাণ্টন গ্রান্ট
আর যেখানেই থাকুন এই নূতন জগতে যখন নেই, তখন নানা স্থানে-অস্থানে থেমে গিয়ে
তার খোঁজ না-করলেও হয়তো চলবে! ফলে এই দেড়শো মাইল নিশ্চয়ই অনায়াসেই
পেরিয়ে যাওয়া যাবে।

তবে লোকে ভাবে এক, আর তাতে বাদ সাধেন প্রকৃতিঠাকরুন। এই দেড়শো মাইলের
মধ্যেই যে এমন বিপদ তাদের জন্যে ওৎ পেতে বসেছিলো, তা কে জানতো। পথের
মাঝখানে ছোটো-ছোটো সব খরগোশকে হুড়মুড় করে লাফিয়ে-লাফিয়ে পালিয়ে যেতে
দেখে কারু-কারু অবশ্য সন্দেহ হয়েছিলো যে কিছু-একটা ঘটতে চলেছে। এরা টের
পায়, এই ছোটো জীবগুলো-কেমন করে, কে জানে। তাছাড়া বিশাল পাম্পা যেন কেমন
ভেজা-ভেজা স্যাৎসেঁতে ঠেকছিলো গোড়া থেকেই। মাঝে-মাঝে জল জমে আছে-জলাশয়

নয়, অথচ মাটি একটু ঢালু হলেই কেমন যেন জল আটকে গেছে। আস্ত জায়গাটাই যেন একটা প্রকাণ্ড জলাভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। আর এ-সব হঠাৎ-গজানো জলাভূমি যে বেশ-বিপজ্জনক তার প্রমাণও পাওয়া গেলো এক জায়গায় : মাটির মধ্য থেকে গাছের গুঁড়ির মতো উঠে আছে রাশি-রাশি শিং : অর্থাৎ এই জলাভূমির আবার কোথাও-কোথাও চোরাবালিতেও ভর্তি : নিশ্চয়ই একদঙ্গল ষাঁড় এখান দিয়ে যাবার সময় চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছে : শুধু তাদের শিংগুলোই জানান দিচ্ছে কীভাবে এই অনিচ্ছুক বুনো ষাঁড়গুলোকে জীবন্ত সমাধি মেনে নিতে হয়েছে। না কি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে?

এই শিংগুলো দেখবার পর থেকেই সবাই কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছে। এমনকী ক্রোনিন্দো অন্দি গুম হয়ে আছে, যেন ভারি উদ্ভিন্ন। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক ডানদিকে বামদিকে ছুটে-ছুটে যাচ্ছে, ঘাড় উঁচিয়ে কী-সব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছে, কপালে ভাঁজ আর ভ্রুকুটি। শেষটায় সে একসময় পাণ্ডয়লকেই খুলে বললে তার দুশ্চিন্তার কারণ। এ-তল্লাটে এ-সময়টায় সাধারণত অত ভোবা, পুকুর বা জলা থাকে না। এখন পর-পর শুধু এ-সব ছোটোখাটো জলাই বা চোখে পড়ছে কেন?

রাত কাটাবার জন্যে সবাই মিলে আশ্রয় নিয়েছিলো একটা ফাঁকা, পরিত্যক্ত র্যান্চে। সারাদিন পথচলার ধকল গেছে। তার ওপর মাথার মধ্যে যদি সারাক্ষণ কোনো অজানা বিপদের আশঙ্কা হানা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাহলেও খুব কাহিল লাগে। খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঘুম ভাঙলো তুমুল বৃষ্টির জন্যে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, যেন মহাপ্লাবনের আগের রাত। ঘোড়াগুলো কেমন যেন দাপাচ্ছিলো, অনবরত পা ঠুকছিলো। অর্থাৎ কোনো কারণে তারা ভারি অস্থির হয়ে পড়েছে, এই ভোররাতির বৃষ্টি মাথায়

করেই বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে। এরাও নিশ্চয়ই আগে থেকেই বিপদের গন্ধ পায়-নইলে হঠাৎ এমনভাবে পা ঠুকবে কেন অস্থির আর দামাল!

ব্রোনিদো সব্বাইকে জানালে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে-লক্ষণ খুব-একটা সুবিধের ঠেকছে না।

ঐ ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই দলটা বেরিয়ে পড়লো। পথে এর মধ্যেই জল জমে যেতে শুরু করেছে, ঘোড়ার খুর ডুবে যাচ্ছে জলে, কিন্তু তবু তারা নিজে থেকেই, কেউ চেতিয়ে না-দিলেও, তীব্রবেগে ছুটে চলেছে উত্তরে।

আর তাদের এই তাড়ার কারণটা-চোখে না-পড়লেও-কানে শোনা গেলো পরক্ষণেই। পেছন থেকে কানে ভেসে এলো গভীর গম্ভীর গুমগুম শব্দ, যেন কোথাও বাজ গড়িয়ে যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে দলে-দলে ছুটে এলো কতরকম জীবজন্তু, জলে ছপছপ করে ছুটে চলেছে তারা, খাদ্য-খাদকেও এখন কোনো ভেদাভেদ নেই, সবাই যেন কোনো-এক বিষম ভয়ে একসঙ্গে এখন ছুটে পালাচ্ছে নিরাপত্তার সন্ধানে। শুধু যে ডাঙার জীবজন্তু তা-ই নয়, মাথার ওপর দিয়ে আর্ত সুরে ডাকতে-ডাকতে উড়ে চলেছে কত-রকম পাখি।

ঘোড়াগুলো তীব্রগতিতে ছুটেছে উত্তরদিকে-ঐ জন্তুদের মতোই। এখন একটু ভাববারও ফুরসৎ নেই। যে-হারে পথে জল বাড়ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে এ-নিছকই বাদলার জল নয়, আরো-বেশিকিছু আছে সেইসঙ্গে। নিশ্চয়ই কূল ছাপিয়ে ছুটে আসছে নদী-বান

ডেকেছে, ঝলকবান, চমকবান, হয়তো বাঁধও ভেঙেছে। হু-হু করে জল বেড়ে যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো এবার যেন সাঁত্রে পেরুচ্ছে, কদম-কদম ছুটতে পারছে না আর।

প্রায় শ-খানেক গজ দূরে ছিলো মস্ত-একটা আখরোটগাছ, আর তার ওপর এসে যখন আছড়ে পড়লো বানের জল, প্রায় তার আন্ধেকটা ডুবিয়ে দিয়েই, তখনই বোঝা গেলো এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ কতটা ভয়াবহ। ঘোড়াগুলো ভেসেই গেলো, ছিটকে পড়লো আরোহীরা জলে; শুধু ক্রোনিদোর ওস্তাদ ঘোড়াটাই জলের সঙ্গে অনবরত যুঝে চলেছে, আর তার কেশর ধরে ভেসে চলেছে রবার্ট, আর পাণ্ডয়লের জামার কলার ধরে সাঁত্রে চলেছেন লর্ড গ্লেনারভন। পাণ্ডয়ল কিছু-একটা বলবার জন্যে মুখ খুলেছিলেন, সম্ভবত বলতে চাচ্ছিলেন, ভয় কী-ঘাবড়াবেন না-আমি তো আছি সঙ্গে, কিন্তু মুখে একরাশ খ্যাপাজল ঢুকে যাওয়ায় আশ্বাস দেবার বদলে শুধু খাবিই খেলেন, আরেকটু হলেই হয়তো বেকায়দায় জল ঢুকে যেতো গলায়।

আখরোট গাছটার কাছে এসে ক্রোনিদো এক-এক করে সবাইকে গাছের ডালে তুলে দিলে। নিচে, ফেনিয়ে, চর্কি দিয়ে জল ছুটছে, আর ক্রোনিদোর ঘোড়া এইবার সেই জলের তোড়ে কাবু হয়ে ভেসে গেলো উত্তরে। তা-ই দেখে আর একমুহূর্তও সবুর করেনি ক্রোনিদো, সোজা ফের গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ খ্যাপাজলে, প্রাণপণে সাঁতার কেটে গিয়ে নাগাল ধরেছে তার ঘোড়ার, আঁকড়ে ধরেছে তার গলা, আর পরক্ষণেই ঘূর্ণিতোলা খ্যাপাজল ঘোড়া আর মানুষ দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে দূরে, উত্তরে।

সেই মেঘলা ভোরবেলায় সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু দেখলেন ক্রোনিদোর ভেসে-যাওয়া। এখন তাদের কোনো বাহন নেই, পথপ্রদর্শক নেই, তল্লিতল্লা নেই, ঠাণ্ডাও লাগছে একটু, এই অচেনা বিদেশ-বিজনে এসেই কি তবে শেষকালে এমনভাবে তাদের অভিযান শেষ হয়ে গেলো? কাণ্ডন গ্রান্টের কোনো সন্ধান তো পাওয়াই গেলো না, এখন উলটে তারা নিজেরা এসে পড়েছেন বিষম বিপদের মাঝখানে, এই তালত্যাগা গাছটার মগডালের কাছে, আর নিচে খ্যাপজল থৈ-থৈ করছে, ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে ছুটছে।

ভাগিংশ গাছটা প্রায় একশোফিট উঁচু, আর তার গুঁড়িটাও প্রকাণ্ড-আর ডালপালাগুলো প্রায় ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, শূন্যে। তার জটিল বুরি আর শেকড় মাটির তলায় অনেকটা ছড়িয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে বলেই বাঁচোয়া, নইলে এ-গাছটাও কখন বানের ধাক্কায় ভেঙে পড়তো! এখনও যে উপড়ে পড়েনি, তা হয়তো এইজন্যেই যে গাছটা অনেককালের পুরোনো আর প্রকাণ্ড-হয়তো এককালে কোনাকিস্তাদোররা এখানে যে-তাণ্ডব তালিয়েছিলো তারও সে সাক্ষী।

নিচে খ্যাপাজল যেভাবে থৈ-থৈ করছে, তাতে মনে হতে পারত, এ বুঝি বানের জল নয়, সমুদ্রেরই কোনো খাঁড়ি। এত-বড়ো গাছটা পর্যন্ত জলের ধাক্কায় থরথর করে কাঁপছে। নিচে, জলে ভেসে যাচ্ছে র্যান্চের ছাদ, ওপোনো গাছপালা, মরা জীবজন্তু। ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছিলো একটা গাছ-তার ওপর আশ্রয় নিয়েছে কত-যে জাণ্ডয়ার, এখন আর তাদের গরগর আওয়াজে হিংস্র আক্রোশ নেই, বরং সে-আওয়াজ এখন কেমন যেন কাহিল, ক্ষীণ, আর্ত।

লর্ড গ্লেনারভন বেশকিছুক্ষণ লক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে এলেন, জল এখানে বেশ গভীর বটে, আর তোড়ও ভয়ংকর, তবে জল আর বাড়ছে না-অর্থাৎ বন্যার প্রথম ধাক্কায় যা হবার হয়ে গিয়েছে, এরপর আর যদি বৃষ্টি না-পড়ে তবে এ-জল বাড়বার আর সম্ভবনা নেই। কিন্তু এ-জায়গাটা একটা ডেকচির মতো ঢালু-দু-পাশে উঁচু জমি, মাঝখানে এই ঢাল, সেইজন্যেই জল এখানে অত গভীর, তাছাড়া জল যদি আর নাও বাড়ে, এই জল সরতে অনেক সময় লেগে যাবে। অর্থাৎ এই গাছকে আশ্রয় করে তাদের যে কতটা সময় কাটাতে হবে কে জানে!

হিশেব করে লর্ড গ্লেনারভন যতটা বুঝতে পেরেছেন, তাতে মনে হচ্ছে অ্যাটলান্টিক এখান থেকে আর মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে। মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে ডানকান তাদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। কিন্তু শুধু-যে এই চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করা এখন একেবারেই অসম্ভব তা-ই নয়, ডানকানেও কোনো খবর পাঠাবার কোনো উপায় নেই।

তার ওপর এখন, এক্ষুনি, আরো-একটা সমস্যার সমাধান করা জরুরি। সেটা হচ্ছে খাবার।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স জলে জবজবে-ভেজা ব্যাগ তুলে দেখালেন। তাতে যা খাবার আছে, তাতে হয়তো দিন-দুই চলে যাবে। কিন্তু তারপর? এ-জল যে কবে নামবে, কে জানে। দু-দিন পরে তাদের খাদ্যের সমস্যা মিটবে কী করে?

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, গাছে তো বেশ ক-টা পাখির বাসা আছে দেখছি। বড়ো পাখিগুলো পালিয়েছে বটে, তবে তাদের ছানাপোনাগুলো আছে, ডিমও আছে। তাতেও নিশ্চয়ই কয়েকটা দিন চলে যাবে।

তাহলেও গোড়া থেকেই আমাদের সাবধান হয়ে খাবার খরচ করতে হবে-রীশন করে দেয়া ছাড়া উপায় নেই, মেজর ম্যাকন্যাব্স বললেন। তবে ক্রোনিন্দো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটা মস্ত উপকার করে গেছে। তাতে হয়তো একটু সুরাহা হবে

কী? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন লর্ড গ্লেনারভন।

এই-যে, গুলিভর্তি এই ম্যাগাজিনটা সে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে-আর এটা জলে ভেজেনি।

চমৎকার। তাছাড়া আমাদের দুজনের কাছেই তো রিভলভার আছে?

হ্যাঁ। এবার জলটা নামলেই হয়।

পাওয়েল একবার নাক সিটকোলেন। খাবার যা আছে, তা তো কাঁচা। রান্না না-করে খেলেই তো দফরাফা হবে-অসুখবিশুখ বাঁধিয়ে বসবো সবাই।

কাঁচা খাবার খাবেন কেন? ঝলসে নিলেই হবে?

ঝলসে যে নেবেন, আগুন জ্বালবেন কী করে?

ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করুন, এম্মুনি নিজের চোখেই রন্ধনপ্রক্রিয়া দেখতে পাবেন।

মগডাল থেকে বেছে-বেছে অপেক্ষাকৃত শুকনো পাতা জড়ো করা হলো নিচের ডালে।
বৃষ্টিধোয়া ফটফটে আকাশে ততক্ষণে সূর্য উঠেছে-বৃষ্টি ধরতেই মেঘও সরে গেছে। এখন
দেখে কে বলবে যে কাল রাতে এই আকাশই অমন-একটা দুর্যোগ তৈরি করেছিলো।
দূরবিনের পরকলার মধ্যে ধরা হলো রোদুর, সূর্যের রশ্মি, পরক্ষণেই নিচের ডালের
শুকনো পাতায় আগুন ধরে গেলো।

প্রথম কাজ তো কোনোরকমে এই আগুনের আঁচে ভেজা জামাকাপড় শুকিয়ে নেয়া।
তারপর খাবারগুলো ঝলসে নিয়ে বেশ হিশেব করেই খেয়ে নিলে সবাই। আর জঠরানল
প্রশমিত হতেই পাণ্ডায়ল দূরবিনটা হাতে করে উঠে পড়লেন মগডালে, সেটা নাকি তাঁর
অবজারভেটরি, মানমন্দির, সেখান থেকে তিনি এখন দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করবেন।

কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হৃদিশই তো এই নূতন জগতে পাওয়া গেলো না-এখন তাহলে
তারা তার খোঁজে আর-কোথায় যাবেন?

নিচের ডালে বসে এই নিয়েই বলাবলি করছিলেন তারা।

মেজর ম্যাকন্যাসের সুচিন্তিত অভিমত : সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর ধরেই না-হয় বরাবর
যাওয়া যাক-তবে পথে কী পড়বে সেটাও জানা দরকার-

তাহলে মঁসিয় পাণ্ডায়লকে জিগেস করা যাক-

মঁসিয় পাঞয়ল তখন মগডালে বসে দুরবিনে চোখ এঁটে আছেন। সেখান থেকেই তিনি হেঁকে বললেন-সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরে কী আছে? সেটা বলবার জন্যে নিচে নামবার কোনোই দরকার নেই। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর আমেরিকা থেকে বেরিয়ে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপটা পেরিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপের দু-ডিগ্রি দক্ষিণ দিয়ে ভারত মহাসাগরে আমস্টারডাম দ্বীপ আর সেন্ট পলস দ্বীপের পাশ পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মাথার ওপর দিয়ে

আস্তু ভূগোলেবই আওড়াতে গিয়ে মাঝপথেই থেমে গেলেন পাঞয়ল। আঁ? কী ব্যাপার? ভৌগোলিক কি তবে জ্ঞান হারিয়ে বাক্যহারা?

না তো। কেননা পরক্ষণেই শোনা গেছে বিষম-একটা বিদঘুটে চিৎকার। তারপরেই দুমদাম আওয়াজ করে কী যেন আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো ঐ মগডাল থেকে।

সাড়ে-সর্বনাশ। এ আবার কী? হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছেন নাকি জাক পাঞ্চয়ল? মেজর ম্যাকন্যাব্‌স যদি হাত বাড়িয়ে ধরে না-ফেলতেন তবে সত্যিই জলে পড়ে যেতেন পাঞয়ল : তিনি তখন ডিগবাজি খেতে-খেতে মগডাল থেকে নিচে আছড়ে পড়ছিলেন।

কী ব্যাপার, বলুন তো? ফের বুঝি ভুলে গিয়েছিলেন কোথায় আছেন?

ঠিক তাই। ভুলবো না? নিজের আহাম্মকিতে আমি যে নিজেই জ্ঞানগম্য হারিয়ে ফেলেছিলুম!

পাণ্ডয়ল সত্যি আহাম্মক কি না, সে নিয়ে একটা তর্ক তোলাই যায়। তবে অকস্মাৎ তার এই আত্মজ্ঞান লাভের কারণ কী?

ভাবুন একবার! কাণ্ডেন গ্রান্টকে আমরা কি না এমন জায়গায় ফুঁড়ে বেড়াচ্ছি যেখানে তিনি নেই-আদপেই তিনি এ-তল্লাটে আসেননি। কস্মিনকালেও না!

পাণ্ডয়ল কি তবে এত বিপদ-আপদে সত্যি সব জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছেন? মাথাটাই বিলকুল গেছে নাকি? এ আবার কেমনতরো কথা?

কিন্তু পাণ্ডয়লের মাথার পোকা নতুন করে আর তাকে কামড়ায়নি-তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। সোজাসুজি স্পষ্ট গলায় তিনি ঘোষণা করলেন : মুশকিল আসানের ঐ তিন তলবটা আমরা সবাই তিন-তিনবার ভুল পড়েছি। Austral একটা গোটা শব্দ নয়- Australia শব্দটার ভগ্নাংশ-জলে ঐ i আর a মুছে গিয়েছে—

গ্লেনারভন আপত্তি তুললেন। ভুল পড়বো কেন? অস্ট্রেলিয়া তো আসলে একটা দ্বীপই—

আপনারা কী বলেন, তাতে কিছু এসে-যায় না। ভৌগোলিক মাত্রেই বলবে অস্ট্রেলিয়া আস্ত-একটা মহাদেশ?

তাই বুঝি? পাণ্ডয়লের বক্তৃতাটা সবে শুরু হতে যাচ্ছিলো, গ্লেনারভন সেটা চট করে থামিয়ে দিলেন। বেশ, তাহলে এবার অস্ট্রেলিয়াতেই যাওয়া যাক। ব্বাস, একটি মোক্ষম কথাতেই সব আলোচনা খতম।

আলোচনা খতম বটে, কিন্তু বলবামাত্রই কি আর যাওয়া যায়? ডানকান এখন কোথায়? আরো চল্লিশ মাইল পথ যেতে হবে যে-আর তাও যাওয়া যাবে না, যতক্ষণ এখানে জল থৈ-থৈ করবে।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। চারটে বাজে।

রবার্ট এতক্ষণ মনমরা হয়ে বসেছিলো, কাণ্ডের গ্রাণ্টের কোনো হৃদিশ না-পেয়ে বেচারার মুখ দিয়ে একটাও কথা সরছিলো না। এবার সেই পাণ্ডায়লের মুখ থেকে অস্ট্রেলিয়ার কথা বেরলো, অমনি আবার নতুন উৎসাহের সঞ্চারে সে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠলো। সব আশা তাহলে এখনও শেষ হয়ে যায়নি। চাঙ্গা হয়ে সে লাফিয়ে উঠে পড়লো-এই একটা-গাছ-দিয়েই-তৈরি জঙ্গলটায় এবার সে শিকারে গেলো-মেরে নিয়ে এলো গোটা-কয় ছোটো পাখি। সেইসঙ্গে পাখির বাসা থেকে হাতসাফাই করে আনলে বেশকিছু ডিম। উঁচ আর সুতো দিয়ে বঁড়শি বানিয়ে কিছু মাছও ধরা হলো জল থেকে।

রসুইখানার ভার এবার জাক পাণ্ডায়ল নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। কে না জানে ফরাশিরা রান্নায় ওস্তাদ। আর তিনি তো আপাদমস্তক ফরাশি একজন-না, কি? রান্নার বাসনকোসন নানাবিধ ফোড়নের মশলা এ-সব বিনাই সেদিন সন্ধ্যায় তিনি যা-একখানা উপাদেয় ভোজ রাঁধলেন-অথবা, বলা যায়, পাতায় মুড়ে ঝলসালেন-আর তার এমনই তার যে তা যেন সকলেরই মুখে লেগে রইলো।

জল না-কমা অর্থাৎ এই গাছের মধ্যেই কাটাতে হবে তাঁদের। ভ্যাপসা গরম পড়েছে, দারুণ গুমোট, আকাশে ঝুলে আছে থমথমে ভারি মেঘ, এত নিচু যেন এই কাছের

ডগাটাই ছোঁয়। হাঁসফাস করতে-করতে তারই মধ্যে চলেছে আচ্ছা, গুল্লগুল্লব, পাণ্ডায়লের দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা। যে-কোনো বিষয় পেলেই হলো : প্রায় সবজাত্তার ভঙ্গিতেই পাণ্ডায়ল সেই বিষয় নিয়ে সাতকাহন শুনিয়ে দিতে পারেন।

সন্ধ্যের সময় কিন্তু ঐ নিচু ভারি মেঘ সরে গেলো, আর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ফুটফুটে আকাশ, যেখানে অগুনতি তারা ঝকঝক করছে। সেইসঙ্গে গুমোটের ভাবটা কেটে গিয়ে ফুরফুরে একটু হাওয়াও দিচ্ছে। গাছের ডালের বাসায় জাঁকিয়ে বসে রবার্টকে এবার পাণ্ডায়ল তারাদের নিয়েই মস্ত-একটা বক্তৃতা কেঁদে শোনালেন। পাতাগোনিয়ার কবিদের কল্পনায় অরিয়ন নক্ষত্র রূপ নিয়েছে তিনটে বোলাস আর একটা ল্যাসোর। কেউ যেন তাদের মহাশূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে গোটা-কয় তারাকে পাকড়াবার জন্যে। অর্থাৎ মাটির শিকার সরাসরি কবিকল্পনায় উঠে গিয়েছে আকাশে।

পাণ্ডায়লের বক্তৃতা যখন জমে উঠেছে-রসিকতা, টীকা-টিপ্পনীসমেত-এমন সময় হঠাৎ পূবদিকে দিগন্তের কাছে কালো একটা ফুটকির মতো কী দেখা গেলো, সেটা একটু বাদেই বড়ো হয়ে যেন মাটির একটা ঢেলা হয়ে উঠেছে। একটু-একটু করে এগিয়ে এসে সে ঝিকঝিক-ঝিকঝিক তারাদের ঢেকে দিতে গেলো। আর তারই সঙ্গে তাল রেখেই যেন ঐ ফুরফুরে হাওয়াটাও মরে গেলো। আবার কী-রকম থমথমে গুমোটে সবকিছু হাঁসাস করতে লাগলো। নিচে বানের জল থম মেরে আছে। যেন একটা গেরিমাটির আয়নার উপরিতল।

কেউ কোনো মন্তব্য করার আগেই, নক্ষত্রতত্ত্বের প্রসঙ্গ পালটে ফেলে, পাণ্ডায়ল বলে উঠলেন : লক্ষণ মোটেই ভালো না। সাংঘাতিক একটা বজ্রবিদ্যুতে ভরা ঝড় আসছে।

প্রচণ্ড-সব বাজ পড়বে পর-পর। আর আমাদের দশাও তাতে সঙিন হয়ে উঠবে-কেননা এদিকটায় তো গাছ বলতে আমাদের এটাই-আর সব গাছবেই তো বন্যার জল উপড়ে ফেলেছে। এ-গাছটার ওপর বাজ না-পড়লেই হয়।

পাণ্ডয়ল যেন কোনো গানের আসরের কনডাকটর। তাঁর কথাই যেন ছিলো ইঙ্গিত। তার কথা শেষ হতে-না-হতেই শুরু হয়ে গেলো গুমগুম আওয়াজ, আর সেইসঙ্গে জলের ওপর হঠাৎ দেখা দিলে অগুনতি আলোর ফোঁটা। ফসফর নাকি?

পাণ্ডয়ল বুঁকে ফস করে হাত বাড়িয়ে জল থেকে টপ করে একটা আলোর ফোঁটা ধরে ফেললেন। এ-যে দেখছি তুকে-তুকো!

তুকো-তুকো মানে? জোনাকি?

হ্যাঁ, জোনাকিও বলতে পারো-তবে এদের ভাষায় এই ফসফর-পোকা হলো জ্যান্তহিরে। এই দ্যাখো, লম্বায় প্রায় ইঞ্চিটাক। এখানকার মেয়েরা এদের ধরে-ধরে মালা গাঁথে, গলায় পরে, খোঁপায় গোঁজে।

ফসফরের আলোয় পাণ্ডয়লের হাতের ঘড়িতে দেখা গেলো রাত বাজে দশটা।

যেন দিনক্ষণ দেখেই তক্ষুনি ঝড়টা ফেটে পড়লো। আকাশ চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ, ঘন-ঘন, যেন আগুনের ল্যাসো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কেউ আস্ত আকাশটাকেই পাকড়াবার চেষ্টা করছে। আর তারই সঙ্গে তাল রেখেই গুমগুমগুম করে গড়িয়ে যাচ্ছে বাজ। আর সেইসঙ্গে নামলো মুষলধারে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি-কী বড়ো-বড়ো ফোঁটা, যেন গায়ে এসে

বেঁধে। কুঁকড়িমুকড়ি হয়ে পাতার আড়ালে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেন সবাই, কিন্তু তাতেও কি আর এই মুষলধারে বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

সবে সবাই পাতার ঘন বুনোনের আড়ালে গুটিগুটি হয়ে বসেছে, এমন সময় আকাশের আগুন নেমে এলো গাছটাতেই। প্রথমে যেন বিদ্যুতের একটা গোলা ছোট্টাছুটি করলে ডাল থেকে ডালে, আর ভেজা পাতায় আগুন লেগে উঠলো কালোধোঁয়ার কুণ্ডলী। তারপর বারকয়েক চর্কিপাক খেয়ে সেই বিদ্যুতের গোলাটা প্রচণ্ড আওয়াজ করে ফেটে গেলো— আওয়াজটা এত-জোরে আর এত-কাছে হলো যে মনে হলো গোলাটা ঠিক যেন মাথার মধ্যে ফেটেছে। বোঁ করে ঘুরে-ওঠা মাথার হকচকানো দশা কমে যাবার আগেই দেখা গেলো, পাণ্ডুল যে-ভয় করেছিলেন, তা-ই হয়েছে; গাছে আগুন ধরে গিয়েছে। আগুন যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে নামছে ডাল থেকে ডালে, পুড়ে যাচ্ছে শুকনো পাতা, ডালপালা, পাখির বাসা—সবকিছু।

ভয় পেয়ে সবাই সরে এলেন আগুনের কাছ থেকে, পুর্বদিকে।

এবার আর কারু রেহাই নেই।

নিচে বানের জলে ঘূর্ণি লেগেছে, ওপরে আগুন জ্বলছে লেলিহান।

উইলিয়ামের গায়ে আগুনের হলকা ছাকা দিতেই সে লাফিয়ে নেমে পড়েছিলো জলে। কিন্তু পরক্ষণেই সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে এলো তার কানফাটানো চিৎকার : অ্যালিগেটর! অ্যালিগেটর!

কুমিরের ভয়াল দোসর এই অ্যালিগেটরদের এ-দেশে কে না ভয় পায়? গাছের তলায় বেশ কয়েকটা-দশ-বারোটা হবে বোধহয়-অ্যালিগেটর জলের মধ্যে গা ভাসিয়ে আছে-ওৎ পেতেই আছে-কখন তাদের খাদ্য টুপ করে খসে পড়ে গাছ থেকে, সেই, অপেক্ষাতেই আছে।

হঠাৎ দক্ষিণদিক থেকে এলো পাহাড়প্রমাণ একটা মস্ত ঢেউ, আর এত ধকল সামলাবার পর, এতক্ষণে এই-এতবড়ো গাছটা মড়মড় করে উপড়ে গেলো। জলে পড়তেই আগুন নিভে গেলো, অ্যালিগেটরগুলোও ছিটকে গেলো একপাশে, শুধু একটা একটু তেড়িবেড়ি করে ধেয়ে এসেছিলো, শেষে জ্বলন্ত ডালটা তুলে একজন নাবিক তার গায়ে গায়ের জোরে হাঁকাতেই অ্যালিগেটরটা ছিটকে পড়লো জলে, আর তার ল্যাজের আছড়ানিতে যেন জলে হুলস্থূল বেধে গেলো-যদি অবশ্য হুলস্থূলের তখনও কিছু বাকি থেকে থাকে।

এই এতবড়ো গাছটাই এখন তাদের ভেলা। হাওয়ার দাপটে এই মস্ত বিশাল বেনোজলের ওপর দিয়ে ভেসে চললো গাছটা-কতক্ষণ কে জানে-অন্তত বলসে মরার ভয় নেই-এখন কোনোক্রমে শুকনো ডাঙায় গিয়ে পৌঁছুতে পারলে হয়।

তারপর একসময় বৃষ্টিও ধরে এলো, সেই মুষলধারের বদলে এখন মিহি ফিনফিনে বৃষ্টির একটা পর্দা ঝাপসা করে রেখেছে সব। আখরোট গাছের ভেলা ভেসেই চলেছে।

শেষরাতের দিকে, তখন সম্ভবত তিনটে বাজে, ভেলাটা যেন মাটির গায়ে ধাক্কা খেলে। তারপরেই ঘষটে-ঘষটে চললো কিছুক্ষণ, প্রায় কুড়িপঁচিশ মিনিট বাদে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো এই অদ্ভুত ভেলাটা।

ফুটিটা সবচেয়ে বেশি পাণ্ডেলেরই। মাটি! মাটি! দুড়দাড় করে সবাই লাফিয়ে নামলে মাটিতে। আর নেমেই-এ কী তাজ্জব দৃশ্য।

সামনেই দাঁড়িয়ে ক্রোনিদো, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে তার ঘোড়া খুর ঠুকছে।

ক্রোনিদো পাণ্ডেলের ঠিক উলটো-সাত চড়েও রা কাড়তে চায় না। তবু দু-চার কথায় সে যা বললে তার সারাংশ হলো, বেনোজলের তোড়ে সবাই একসময়-না, একসময় যে এদিকটাতেই ভেসে আসবে, তা সে আন্দাজ করেছিলো। তাই একটা পরিত্যক্ত র্যান্চে সে সকলের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে।

সেখানেই বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলে সবাই। সকাল হলেই ফের রওনা হতে হবে অ্যাটলান্টিকের পানে।

অ্যাটলান্টিকের তীরে এসে পরদিন যখন পৌঁছুনোনা গেলো, তখন রাত করে এসেছে, জোর হাওয়া দিচ্ছে, হয়তো আরো-একখানা পূর্বাভাস। তীরে ডানকান নেই। সে ভাসছে ডাঙা থেকে দূরে, জলের ওপর। তীরে যে নেই, তার কারণ ঝড়ের প্রকোপে ডাঙায় ঘা খেয়ে ডানকান বেদম জখম হয়ে যেতে পারে, তাই সাবধানের মার নেই ভেবে তাকে বারদরিয়ার কাছে নিয়ে-যাওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ আজ রাতটা তীরেই তাদের কাটিয়ে দিতে হবে, ঐ চড়ায়।

অ্যাটলান্টিকে পৌঁছে গেছে, ঐ-যে দূরে ছায়ার মতো ডানকানকে দেখা যাচ্ছে, এ-কথা ভেবে অন্যদের মনে যতই স্বস্তির ভাব দেখা দিক, লর্ড গ্লেনারভনের মনে কিন্তু

একফোঁটাও স্বস্তি নেই-তিনি সারারাত ছটফট করেই কাটালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পা দেবার পর থেকেই পর-পর যত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবর্তে তারা পাক খেয়েছেন, তাতে ডানকানে পা না-দেয়া অর্থাৎ তিনি মোটেই স্বস্তি পাবেন না। আবার অতর্কিতে কোনদিক থেকে কী বিপদ আসে কে জানে!

ভোরের আলো ফুটতেই কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেলো ডানকানকে। আর দেখেই আকাশ লক্ষ্য করে পর-পর তিনবার বন্দুক ছুঁড়লো ক্রোনিদো-সংকেত। আর তারপরেই ডানকানের ডেক থেকে তোপের আওয়াজ এলো-কামান দেগে সংকেতের উত্তর দিচ্ছে। পরক্ষণেই ডানকান থেকে ভাসিয়ে দেয়া হলো একটা নৌকো।

ক্রোনিদো কিছুতেই তার স্বদেশ ছেড়ে যাবে না-সে এই আরহেনতিনাতেই থাকবে। ক্রোনিদো ছাড়া আর-সবাই উঠে পড়লেন ডানকানের নৌকোয়। শুধু রবার্ট নৌকোয় গিয়ে ওঠবার আগে ক্রোনিদো একবার তার হাত চেপে ধরলো। অস্বুট স্বরে বললে, আর তুমি কিশোর নও এখন, বড়ো হয়ে গেছে!

নৌকো যতক্ষণ-না অভিযাত্রীদের নিয়ে গিয়ে ডানকানে ভিড়লো, ক্রোনিদো পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো তীরে। সবাই একে-একে ডানকানে উঠে যেতেই, সে তার তেজি ঘোড়াটার পিঠে লাফিয়ে উঠলো, তারপর ডানকানের দিক থেকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সবেগে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে হয়তো পাম্পারই উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়

নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে

এক

stra মানে কি Australia?

পুরো রাস্তাটা যে সবাই মিলে হন্যে হয়ে, সব বিপদ-আপদ মাথায় করে, ছুটে বেড়িয়েছেন, সবটাই কিনা মিথ্যেমিথ্যে, শুধু-একটা বুনোহাঁসের পেছনে ছোটাই যেন সার হলো!

কোথায় দক্ষিণ আমেরিকা, আর কোনখানেই বা মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া! কোথায় যেতে গিয়ে কোনখানে! আর সব কি না গুগুলিপিটা ভুল পড়ে! শুধু বর্ণপরিচয় থাকলেই তো হয় না, সব সংকেতের গোপন অর্থটা বার করবার মতো বুদ্ধি বা এলেমও থাকা চাই! এমনিতেই তো যে-কোনো হেঁয়ালির জট খুলতে চাওয়ার ব্যাপারটাই কঠিন-তার ওপর মুশকিল আসানের এই-যে তিন-তিনটে তলব নানা ভাষায় পাওয়া গেছে তার অনেক হরফই তো জলে ধুয়ে-মুছে উধাও হয়ে গেছে! প্রথমত অসম্পূর্ণ শব্দগুলো-(অসম্পূর্ণ তো ছিলো না, জলই তাদের খেয়ে গেছে)-ঠিকঠাক পূরণ করতে হবে, না-হলে আর ধরা যাবে কী করে, কাপ্তেন গ্রান্ট সত্যি-সত্যি কোন্ হদিশ দিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন!

মঁসিয় পাঞয়ল অপ্রতিরোধ্য : এত-সহজে যদি দমে যাবার পাত্র হতেন তাহলে এই ক্রমবর্ধমান জগৎটির হাল-হকিকৎ সম্বন্ধে এত-বড়ো একজন বিশারদ তিনি হয়ে

উঠতেন কী করে? অতএব, আবারও তিনি নতুন করে আদ্যোপান্ত লিখে ফেলেছেন এই ক্রিপ্টোগ্রামের অর্থ, তবে ক্রিপ্টোগ্রামটি হয়তো কোনোকালেই ক্রিপ্টোগ্রাম হতে চায়নি, এই বোতলে-ভাসানো চিঠি তো আসলে ছিলো সাহায্য পাবার, উদ্ধার হবার ব্যাকুল অনুরোধ, শুধু জল এসে কিছু কথা মুছে দিয়েছে বলেই এখন হয়তো তাকে মনে হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাম বা গুপ্তলিপি, প্রতিবার নতুন করে অভিনিবেশ দেবার পর মঁসিয় পাঞয়ল প্রতিবারই যার নতুন অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন, এ যেন সেই ব্যাসকুট যা বারে-বারেই নব-নব তাৎপর্যে ভরে যায়। অতএব, এখন নতুন করে এই ব্যাসকুটের মর্মোদ্ধার করার পর তার হতাশ কিন্তু উৎসুক শ্রোতাদের তিনি নাটকীয় ভঙ্গিতে পুরো জবানটাই-অন্তত তিনি যা ধরতে পেরেছেন-পড়ে শোনালেন :

১৮৬২ সালের ৭ জুন গ্লাসগোর ত্রিমাস্তুল রণতরী ব্রিটানিয়া অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে সলিল সমাধি লাভ করেছে। দুজন নাবিক আর কাপ্তেন গ্রান্ট কোনোক্রমে মহাদেশের ডাঙায় গিয়ে উঠেছেন, এবং উঠে পড়েই বর্বর ও নিষ্ঠুর আদিবাসীদের পাশ্চাত্য পড়েছেন-এখন তারা তাদের হাতেই বন্দী। এই কাগজটা তারা...দ্রাঘিমা এবং ৩৭°১১ অক্ষাংশে বোতলে করে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সেখানে জাহাজডুবি হয়েছে, সেখানে সাহায্য পাঠান।

মেজর ম্যাকন্যাব্স কাজের লোক, অল্পকথার মানুষ। তার জীবনের সারকথা : কথা কম কাজ বেশি। কিন্তু এবার তারও মনে হলো যৎকিঞ্চিৎ উচ্চবাচ্য না-করলে আবারও হয়তো আলেয়ার পেছনে ছুটতে হবে। তিনি বলে উঠলেন, সবুর! সবুর! একমিনিট। দুম করে একেবারে অস্ট্রেলিয়া যাবার আগে আমাদের বোধহয় আরো-একটু সবকিছু তলিয়ে ভেবে দেখা উচিত। আমরা তো আগের বারে চিরকুটটার ভুল অর্থ করেছিলুম-এবার যে

আবার একটা ডাহা-ভুল করছি না তা-ই বা কে জানে! এবার বরং আরো হুঁশিয়ার হয়ে আটঘাট বেঁধে আমাদের ঠিক করে নিতে হবে-

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তার কথাটা শেষ করতে পারলে তো? তার পাণ্ডিত্যের ওপর কারু কটাক্ষ সহ্য করার পাত্র অন্তত মঁসিয় পাঞয়ল নন। তিনি প্রায় তিড়িংবিড়িং করে জ্বলে উঠে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন : কবুল করি, আগের বার আমার ভুল হয়েছিলো। কিন্তু ভুল তো মানুষমাত্রেরই করে-আর সে-ভুল আবার শুধরেও নেয় মানুষই। শুধু যারা হাঁদার হৃদ, তারাই পুরোনো ভুলটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

উঁহু-উঁহু, আমি মোটেই অত চটে যাবার কথা বলিনি। কথা বলবেন বলে যখন স্থির করেছেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তখন তিনি কথাই বলবেন। অতটা মাথাগরম করার মতো কিছুই আমি বলিনি। ৩৭°১১ অক্ষরেখা ঠিক-ঠিক কোন-কোন দেশের ওপর দিয়ে গেছে, আগে বরং সেটাই খতিয়ে দেখা যাক। আমার কথার বিনীত মর্মার্থ ছিলো এটাই।

এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষরেখা যেখান দিয়ে গেছে, সেখানে বেশিরভাগ জায়গাতেই আছে জল। জানেনই তো, পৃথিবীতে ডাঙার চাইতে জলের ভাগই অনেক-বেশি। এই-যে, এই দেখুন, দক্ষিণ আমেরিকার পরেই পড়ছে ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপটা-কিন্তু ধন্ধে-ফেলা চিরকুটটায় এই দ্বীপের কোনো নামগন্ধও নেই। ফলে তাকে আপাতত বাদ দেয়া যেতেই পারে। তারপর আসছে ভারত মহাসাগরে ওলন্দাজদের ঘাঁটি-আমস্টারডাম আইল্যান্ডস-তারও কোনো নামগন্ধ নেই এই চিরকুটে। তারপর আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সরাসরি অস্ট্রেলিয়াতে ইংরেজিতে লেখা চিরকুটটায় আছে stra আর

ফরাশিতে লেখা চিরকুটটায় আছে austral-এ-দুটোই Australia-র কথা বলছে সেটা বুঝতে মগজে ধূসর পদার্থ বেশি লাগে না।

ততঃকিম্?

অস্ট্রেলিয়ার পর, এই-যে, এই দেখুন নিউ-জিল্যান্ড-সে মোটেই কোনো মহাদেশ নয়- সাউথ আইল্যান্ড আর নর্থ আইল্যান্ড এই দুইকে মিলিয়েই এই নবসিঙ্কুসৈকত গড়ে উঠেছে। কিন্তু তারও তো কোনো উল্লেখই নেই কোনো চিরকুটে।

ঠিক আছে। না-হয় নিউজিল্যান্ডকেও বাদ দেয়া গেলো।

তবেই দেখুন-দক্ষিণ আমেরিকা আর নিউজিল্যান্ডের মাঝখানে এই অথৈ-সমুদ্রের মাঝখানে ঐ সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষরেখায় পড়ছে কেবল আরেকটা প্রায় খাঁ-খাঁ মরুভূমির মতো দ্বীপ-মারিয়া তেরেসা। কিন্তু এই মারিয়া তেরেসার নামের উল্লেখও তো চিরকুটে কোথাও পাচ্ছি না। তাহলে নিজেরাই ঠিক করে বলুন, কোথায় যাবেন, কোথায় যাওয়া সমীচীন হবে।

হুম, তাহলে তো দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া যাবার তোড়জোড় করাই ভালো।

অমনি এককথায় সবাই রাজি। বেশ, চলো তবে অস্ট্রেলিয়ায়।

হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া যাওয়াই উচিত, তবে পথে আমস্টারডাম আইল্যান্ডস আর ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দ্বীপে জাহাজ ভিড়িয়ে এই খোঁজটা অন্তত নেয়া দরকার ব্রিটানিয়া সে-সব দ্বীপে

কখনও থেমেছিলো কি না, মেজর ম্যাকন্যাসের মাথা কিন্তু সকলের এত উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যেও দিবির ঠাণ্ডা আছে-সত্যি-সত্যি কী করা উচিত, সে-কথাটা এই ভবি সহজে ভোলেন না।

সে আর বেশি কথা কী, লর্ড গ্লেনারভন বললেন, ঐ দ্বীপগুলো তো পথেই পড়বে- সেখানে জাহাজ ভিড়িয়ে খোঁজখবর নেবার জন্যে আমাদের তো একেবারে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়তে হবে না।

এবং এই সিদ্ধান্তই মনঃপূত হলো সকলের। এবং ডানকান ছুটলো পুরোদমে, গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া হলেও অন্য দ্বীপগুলোর বুড়ি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেতে হবে তাকে। আর কারুই যেহেতু আর একফোঁটাও তর সহিছিলো না, প্রায় একটা নজিরই গড়ে দিলে ডানকান, দশদিনেই পেরিয়ে এলো ২১০০ মাইল দূর থেকে, দিগন্তে মেঘের মধ্যে ঝাপসা ভেসে উঠলো সমুদ্রতল থেকে সাতহাজার ফিট উঁচু ত্রিস্তান ডা কুনিয়ার গিরিচূড়া।

ত্রিস্তান ডা কুনিয়া দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের কতগুলো দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে, ব্রিটিশ উপনিবেশ সেন্ট হেলেনার সে অংশ, আর সেই সেন্ট হেলেনার রাজধানী হলো জেমসটাউন। ত্রিস্তান ডা কুনিয়া নাম থেকেই মালুম হয় এটা এককালে ছিলো পর্তুগালের উপনিবেশ-কিন্তু সাম্রাজ্য নিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যখন খেয়োখেয়ি লেগে গিয়েছিলো, তখন অস্ট্রেলিয়া দখল করার কাছাকাছি সময়েই ইংরেজরা এই দ্বীপগুলো পর্তুগিসদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নেয়। হোক-না ছোটো-ছোটো দ্বীপ-দ্বীপ না-বলে বলা ভালো হয়তো সমুদ্রের জল থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সেই-কবে মাথা তুলে দাঁড়ানো

পাহাড়ের চূড়ো, কিন্তু সাম্রাজ্য বানাবার রাস্কুসে খিদে এই আগ্নেয়েগিরির চূড়োগুলোকেই বা খামকা আর-কারু কাছে ছেড়ে দেবে কেন?

এই ছোট গিরিপাহাড়দ্বীপে সচরাচর যেহেতু নেহাৎ বেকাদায় না-পড়লে কোনো জাহাজই ভেড়ে না, তাই ডানকান স্বেচ্ছায়, তার পরিকল্পনামাফিক এখানে এসে তত্ত্বতালাশি নেবে বলেই থেমেছে শুনে, এখানকার গবর্নর প্রায় যেন গদ হয়েই খাতির করলেন লর্ড গ্লেনারভনকে। এই ছোট নামকাওয়াস্তে দ্বীপটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অদি সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন তাদের নৌকায় করে দ্বীপের চারপাশও ঘুরে-আসা হলো, কিন্তু না, মঁসিয় পাণ্ডয়ের আন্দাজই সম্ভবত ঠিক, কাপ্তেন গ্রান্ট বা ব্রিটানিয়ার কোনো খোঁজই পাওয়া গেলো না এখানে।

যখন বোঝা গেলো এখানে ব্রিটানিয়ার খোঁজ পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তখন সে-রাতিরেই দ্বীপ থেকে নোঙর তুললো ডানকান, এবং আবার ভাসলো অথৈ জলে, অকূলপাথারে, পরবর্তী থামবার জায়গা আমস্টারডাম দ্বীপ।

মাঝখানে একবার কয়লা নেবার জন্যে থামতে হয়েছিলো ডানকানকে, কিন্তু সে শুধু কয়লা নেবার জন্যেই-অন্য কোনো কাজ ছিলো না তার, কোনো গুলুকসন্ধান নেবার কথাও ওঠেনি। আমস্টারডাম দ্বীপগুলোয় পৌঁছবার আগে অদি কোথাও কোনো খবর নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য এই তথাকথিত আমস্টারডামেও কাউকে কিছু জিগেস করার কোনো মানে নেই। এই ২৯০০ মাইল পাড়ি দেবার পর এই বাহারে নামের দ্বীপটায় পৌঁছে দেখা গেলো, এই একরত্তি ডাঙাকে দ্বীপ না-বলে দ্বীপের কোনো লিলিপুশন সংস্করণ বলাই চলে। কিংবা হয়তো দূর থেকে দেখে কারু ভ্রম হতে পারে যে

এ বুঝি কোনো তিমিঙ্গিলের পিঠ-জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বুঝি রোদ পোহাচ্ছে। শুধু একটুক্ষণের জন্যেই সেখানে নোঙর ফেলেছিলো ডানকান। কেননা খোঁজখবর নিতে কোনো সময়ই বোধকরি লাগলো না-যেন ঘড়ির কাটার মধ্য থেকে কয়েকটা মুহূর্তকে বগলদাবা করে বার করে নিয়ে গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ সারা হলো-যেন ঘড়ির কাঁটা তাতে ঘোরেইনি। কেননা দ্বীপের বাসিন্দা বলতে কুললে তিনজন লোক, একজন ফরাশি আর দুজন দোআঁশলা, মুলাটো, কালাআদমি। তিনজনেই এককথায় জানিয়ে দিলে, উঁহু, কই, ব্রিটানিয়া তো কস্মিনকালেও এখানে থামেনি-কিংবা ঐ জাহাজের কেউই দ্বীপে কখনও পা দেয়নি।

উচিত ছিলো, এ-কথা শোনবামাত্র তক্ষুনি ফের নোঙর গোটানো, কিন্তু এবার যেহেতু শেষ-ভরসা অস্ট্রেলিয়াতেই পাড়ি জমাতে হবে, সেইখানেই বোধহয় সব্বাই এখানে একটুখেমে নিয়ে বুকের মধ্যে সাহস আর আশা সঞ্চয় করে নিতে যাচ্ছিলো।

তাছাড়া ছিলো-তো, অফুরন্ত আমোদের খনি, জাক পাঞ্চয়লের শ্রীমুখনিঃসৃত অনর্গল বুকনি। মাঝে-মাঝে তথ্য আর কল্পনায় সবকিছু তালগোল পাকিয়ে না-ফেললে জাক পাঞ্চয়লকে হয়তো বলাই যেতো জীবন্ত একখানা বিশ্বকোষ, যে-রকম বিশ্বকোষ প্রণয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন ভোলতেয়াররা। সেই যবে থেকে ইয়ন হার্ট আর জেরার্ড মেকাটোর নামে দুই ওলন্দাজ চমৎকার বাঁধাই করে মানচিত্রের একটি সংগ্রহ বার করেছিলেন (মঁসিয় পাঞ্চয়লের এমনকী সালতারিখও দিব্বি মনে থাকে-সেটা নাকি ছিলো ১৬৩৬ সাল), তারপর থেকে কতই যে কাটোগ্রাফার অর্থাৎ মানচিত্রআঁকিয়েরা আসর আঁকিয়ে বসতে শুরু করেছিলেন। সেই প্রথম সংগ্রহটার মুখপত্রে ছিলো বিশালদেহী অ্যাটলাসের ছবি, গ্রিকপুরাণের সেই দেবতা, যে কাঁধে করে বয়ে রেখেছিলো

আস্ত পৃথিবীটাই। সেই থেকেই নাকি মানচিত্রের বইয়ের নাম হয়ে গেলো অ্যাটলাস। তো, এই অ্যাটলাস সেই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরের পর বেরিয়েই চললো; যত-যত লোক ভৌগোলিক অভিযানে বেরিয়েছিলো তাদের আঁকা নকশা দেখে-দেখে কাটোগ্রাফাররা নিজেদের কেরামতি দেখিয়েই চললেন-কোথায় পাহাড়, কোথায় নদী, কোথায় সাগর, কোথায় ডাঙা, কোথায় আগ্নেয়গিরি আর কোনখানেই-বা মরুভূমি, কোথায় দুর্গম নিবিড় বনানী আর কোথায়ই-বা জনপদ-সব আস্তে-আস্তে যেন লোকের চোখের সামনে খুলে যেতে লাগলো। আস্ত পৃথিবীটাই যেন ক্রমে বড়ো হয়ে যেতে লাগলো, বেড়ে যেতে লাগলো-আবিষ্কৃত হলো এমনকী আস্ত নতুন মহাদেশও।

মঁসিয় পাএওয়ল যখন কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে এসব কথা বলতে শুরু করেন, সবাই তখন তাকে ঘিরে বসে হাঁ করে তার কথা শোনে, আর তার জ্ঞানের পরিধি দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। গত কদিন ধরে তিনি অস্ট্রেলিয়াকে নিয়েই পড়েছিলেন। কারা-কারা অস্ট্রেলিয়া গিয়েছেন, কোথায়-কোথায় পড়েছিলো তাদের পদধূলি, কী তারা দেখেছেন আউটব্যাকে- কেননা অস্ট্রেলিয়ায় জনবসতি নাকি শুধুই সমুদ্রের তীর ঘেঁসে, তারপর ভেতরে মাইলের পর মাইল গেছে বিশাল জমি, পাহাড় পর্বত গাছপালা জীবজন্তু সবই নাকি অন্যরকম- আর সেই বিশাল ভিতরদেশকেই-মজার না?-তারা বলে আউটব্যাক-বাইরে, পেছনে। এমন কোনো নাম যার মগজ থেকে বেরিয়েছিলো, তার কল্পনার বাহাদুরি ছিলো মানতেই হয়। মঁসিয় পাএওয়ল যখন একে-একে অভিযানকারীদের নাম বলতে লাগলেন, নির্ভুল সালতারিখ শুদ্ধ, তখন ঐ ছিটগ্রস্ত পণ্ডিতের ওপর বেশ সম্ভ্রমই বোধ হতে থাকে সকলের। অস্ট্রেলিয়ার কিছুই নয় ইওরোপের মতো-কিছুই নয় মানে তার গাছপালা জীবজন্তু সবই অন্যরকম, এমনকী দক্ষিণ গোলার্ধে বলে তার আকাশটা অন্যরকম, উলটোরকম, তারাগুলো আকাশের পটে যেন ঠিক উলটে দিয়েছে কেউ, এমনকী উলটে

দিয়েছে ঋতুগুলোকেও। ইওরোপে যখন হি-হি হিম শীত, সেখানে তখন বিকট দমবন্ধ করা গরম। ফলে বড়োদিনে যখন ইওরোপ গান গায় হোয়াইট ক্রিসমাসের, বরফে ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে স্লেজে করে আসছে সান্তা ক্লস, বা সন্ত নিকলাউস, তখন গরমে এখানকার লোকের প্রাণ আইচাই যাই-যাই, বেচারী সান্তা ক্লস তার গরম জামাকাপড় খুলে হাঁসফাস করতে-করতে যেন দরদর করে ঘামে।

সান্তা ক্লসের দুর্দশাটা এমন মজার ভাবে বর্ণনা করেন জাক পাঞ্চওয়ল যে রবার্ট আর মেরি তো হেসেই কুটিপাটি, অন্যরাও মুচকি-মুচকি হাসেন বটে, আর এতে একদিক থেকে ভালোই হয়-ছেলেমেয়েরা অন্তত সাময়িকভাবে ভুলে যায় কেন তারা এই অভিযানে বেরিয়েছে, কাণ্ডের গ্রান্টের কথাটা তখন যেন মনের কোনো চিলতে খুপরিতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

কিন্তু এতসবের মধ্যেও চিরকুটটাকে নিয়ে প্রায়ই মাথা খাটায় সবাই মিলে। সত্যি কি মর্মোদ্ধার করা গেছে এই আত্মোদ্ধারের আহ্বানের-চিরকুটগুলো নিয়ে যত বসা যায় ততই মনে হয় সেগুলো যেন গভীর, গভীরতর রহস্যে ভরে যাচ্ছে, ধাঁধাটা যেন এমন জটপাকানো যে তার ভেতর বুঝি সহজে কোনো আলো ফেলাই যাবে না। যেমন, এই যে খটকাটা জেগেছে, তার উত্তরটা কী? পেরুর উপকূল ছেড়ে বেরুবার পর এক-সপ্তাহের মধ্যেই জুনমাসের সাত তারিখে কি ব্রিটানিয়া ভারত মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারে?

খোদ পাঞ্চওয়লও সবজাস্তা হয়েও কেমন-একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। একদিন তাই সরাসরি কাণ্ডের জন ম্যাঙ্গলকেই তিনি জিগেস করে বসলেন, আমরা যে-সমুদ্রপথ

দিয়ে যাচ্ছি সেই সমুদ্র দিয়ে কি কোনো জাহাজ একমাসেই গিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুতে পারে?

দেখতে হবে জাহাজের এনজিনের জোর কতটা-কত অশ্বশক্তি আছে, বুঝি প্রায় না-ভেবেই উত্তর দিয়েছেন কাণ্টেন, দিনরাত একটানা যদি চলে, চব্বিশ ঘন্টায় যদি দশমাইল পথ পেরুতে পারে, তবে একমাসেই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যেতে পারে বৈ কি!

তাহলে চিরকুটগুলোয় নিশ্চয়ই 7 তারিখের আগে 1 অথবা 2 ছিলো-জল লেগে মুছে গিয়েছে। তার মানে, আমি বলতে চাচ্ছি, কাণ্টেন গ্রান্ট সম্ভবত 17 অথবা 27 তারিখ গিয়ে পৌঁছেছিলেন ভারত মহাসাগরে।

হুম, এটা হলেও হতে পারে। এই সম্ভাবনাটার কথা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না, কমকথার মানুষ মেজর ম্যাকন্যাক্স-এর মুখ থেকে আজকাল যে নানারকম সদুজ্জিকর্ণামৃত বেরোয়, এই মন্তব্যটা তারই আরেকটা নজির।

জাক পাঞ্চওয়ল অমনি সবজাত্তার ভূমিকায় পুনর্বীর অবতীর্ণ হলেন। মাঝখানে যে একটা প্রশ্ন করে তিনি এমন দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন যে এমনকী তারও সবকিছু জানা নেই, সম্ভবত সেই ঘাটতিটা পুষিয়ে নেবার জন্যেই বোধকরি। এমন-সব সারগর্ভ উক্তি করে চললেন পর-পর, তাতে তার জ্ঞানের বহর দেখে সর্ব্বাই প্রায় কুপোকাৎ। কেমন, যেন একটা হীনম্মন্যতারই বোধ জেগে ওঠে, যদি দেখা যায় আরেকজন-কেউ-মানুষই তো বটে-একটা স্বয়ংচল স্বয়ংক্রিয় বিশ্বকোষই হয়ে উঠেছে।

শেষটায় মেজর ম্যাকন্যাব্স আর তুবড়ির মতো ছোট জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সহ্য করতে না-পেরে হেসেই যদিও কথাটা বললেন বটে, তবু তার মধ্যে দিয়ে একটু জাতিবিদ্বেষ ফুটে বেরুলো বৈকি। ফরাশি সেনাদের ধরাচুড়ো পরার পর অনেকটা ব্যাঙের মতো দেখায়, সেইজন্যেই কি তাদের ফ্রগস বা ব্যাঙ বলে? নাকি ব্যাঙের ঠ্যাঙ তাদের একটা মুখরোচক খাদ্য বলেই তাদের ফ্রগসবলে? তার উত্তর অবিশ্যি মেজর ম্যাকন্যাব্স নিজেই জানেন না। কিন্তু একবার যখন পাণ্ডয়লের কথার তোড় একটু কমে এসেছে, তিনি ফাঁক বুঝে, তাকে খানিকটা তিয়ে দেবার জন্যেই হয়তো, জিগেস করে বসলেন, আচ্ছা, মঁসিয় পাণ্ডয়ল, এটা কি আপনি বলতে পারবেন অস্ট্রেলিয়ায় কেন ফরাশিদের এত রমরমা? ইংরেজরা কেন ফরাশিদের হাতেই দখলদারি ছেড়ে দিয়ে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সটকে পড়েছে?

পাণ্ডয়ল বুঝি আচমকা এমন প্রশ্ন শুনে একটু অপ্রস্তুতই বোধ করেছেন। খতমত খেয়ে বলেছেন : কেন?

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাঙের ডাক শুনে ভয়ে আঁৎকে উঠে ইংরেজ কাপ্তেনরা জাহাজ নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন বলে-আর-ককখনও অনেকদিন ওমুখো হয়নি। সেই-ফাঁকে ঐ ব্যাঙের লোভেই ফরাশিরা, তাদের স্বজাতির খোঁজে এসে, এখানে বেশ জম্পেশ করে জমিয়ে বসেছে।

হেসে ফেলেছেন জাক পাণ্ডয়ল, তবে একটু আপত্তি জানাতেও ছাড়েননি। ইংরেজরা না-হয় চারপাশে সাম্রাজ্য ছড়িয়ে বসে অন্যসব লোকদের সম্বন্ধেই নাক শিটকোয়, তাদের আর মানুষ বলেই মনে করে না। কিন্তু আপনি তো স্কট, হাইল্যান্ডের লোক, তাদের

দেখাদেখি আপনি কেন আমাদের ফ্রগবলবেন-আমরা ফরাশিরাও কিন্তু খুব-একটা কুয়োর ব্যাঙ নই-আমরাও পৃথিবীর নানান মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছি।

জ্ঞান বিতরণের ফাঁকে-ফাঁকেই, মওকা পেলেই, মেজর ম্যাকন্যাব্স তাকে একটু তাতিয়ে না-দিয়ে উসকে না-তুলে ছাড়তেন না। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় এ-সব আড্ডায় বরং একঘেয়ে জল দেখে-দেখে বিকল চিত্ত অন্য কোনো বিষয়ে কথাকাটাকাটি শুরু করে দিতে পারে। তাছাড়া মেরি আর রবার্ট যেভাবে মনমরা হয়ে আছে, তাতে তাদেরও এতে কথঞ্চিৎ দুর্ভাবনা বা হতাশা থেকে মুক্তি দেয়া যায়। যতদিন তারা জানতো যে কাণ্টেন গ্রান্ট-এর কোনো হদিশ নেই, মারাই পড়েছেন বুঝি-বা, তারা একরকম করে এই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলো। এখন, যখন আবার কাণ্টেন গ্রান্ট-এর হদিশ পাবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তিনি যে বেঁচে আছেন এমন-একটা সম্ভাবনা যে আর নিছকই কল্পনার স্তরেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, অথচ তবু তিনি যে কোথায় আছেন সত্যি-সত্যি, এবং কীভাবে আছেন, তার কিছুই জানা যাচ্ছে না, তখনই বরং আশা-নিরাশার দোলায় তাদের মন অনবরত পেণ্ডুলামের মতো দোল খেয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই, বিশে ডিসেম্বর, কেপ বানাইলিতে গিয়ে পৌঁছুলো ডানকান। এতদিন কেটে গিয়েছে, দু-দুটো বছর তো বটেই, এর মধ্যে ব্রিটানিয়া জাহাজের ধ্বংসাবশেষ নিশ্চয়ই এখন আর এখানে পড়ে নেই। সব লুণ্ঠপাট হয়েই গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু তো খোঁজখবর কিছু নিতেই হয়। এতদিন নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে তারা কত-কত জায়গায় ফুঁড়ে বেরিয়েছেন, কোনো খবরই পাননি-এখানে ভাঙাচোরা ব্রিটানিয়াকে পাওয়া যাক বা না-যাক, হয়তো লোকমুখে কিছু-একটা খবর পাওয়া যাবে। আর শেষ অব্দি এখানেও যদি কোনো খোঁজ না-মেলে, তাহলে না-হয় ফের ইওরোপেই ফিরে যাবে ডানকান। কেননা

ব্রিটানিয়া এখানকার দরিয়ায় না-ডুবে যদি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে কোথাও সলিলসমাধি লাভ করে থাকে-মঁসিয় জাক পাঞ্চয়লের সুচিন্তিত অভিমত-তাহলে কাণ্ডেন গ্রান্ট নিশ্চয়ই অনেক আগেই ইওরোপে ফিরে যেতেন। পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজদের উপনিবেশ বেশ জাঁকিয়েই বসেছে, সেখান থেকে ইওরোপ ফিরে-যাবার জাহাজও যাতায়াত করে হরদম, ফলে কাণ্ডেন গ্রান্টের পক্ষে কোনো-একটা জাহাজে উঠে-পড়া খুবই সম্ভব। বরং যখন ডানকান যেখানে এসে পৌঁছেছে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে এখনও কোনো বড় বসতি গড়ে ওঠেনি, আউটব্যাক শুরু হয়েছে প্রায় সমুদ্রতীর থেকে একটু-ভিতরে গিয়েই, আর এই আউটব্যাকে খাঁ-খাঁ করছে রুক্ষ উষর তপ্তবালির মরুভূমি।

অনেক ঝঙ্কিঝামেলা পুইয়ে ডাঙায় নেমেই দেখা গেলো দূরে একটা উইন্ডমিলের চাকা হাওয়ায় অনবরত পাক খেয়ে যাচ্ছে। উইন্ডমিল আছে-অর্থাৎ এখানে লোকজনও আছে আশপাশে কোথাও, নিশ্চয়ই ছোটোখাটো হলেও চাষ-আবাদের কোনো-একটা ব্যবস্থা আছে। আর, সত্যি তা-ই, একটু এগুতেই দেখা গেলো খানকয়েক বাড়ি একটা জায়গায় যেন জটলা পাকাচ্ছে, সামনেই সবুজ মাঠ, সেখানে গোরু-ভেড়া চরছে, ঘোড়াও আছে, কাছেই যে খেতখামারের ব্যবস্থা আছে, তারই চিহ্ন হিশেবে আছে একটা গোলাবাড়িও।

এঁদের এগুতে দেখে, সবচেয়ে বড়োবাড়িটা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন একজন প্রৌঢ়, বিশাল দশাসই চেহারা-এত বয়েস হাওয়া সত্ত্বেও কোথাও বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি। তার পেছনে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে ছুটে এসেছে চারটে তাগড়াই কুকুর। প্রৌঢ়ের সঙ্গে-সঙ্গে আরো বেরিয়ে এসেছে চারজন বলিষ্ঠ তরুণ, লাল চুলের ঢল নেমেছে তাদের মাথায়, যেন আগুনের শিখা জ্বলে উঠেছে ঐ ঝাকড়াচুলে। নিশ্চয়ই আয়ারল্যান্ডের মানুষ,

ইংরেজদের অত্যাচারে দেশে তিষ্ঠাতে না-পেরে অজানায় বাঁপ খেয়ে ভাসতে-ভাসতে শেষকালে এরা সবাই এই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতেই এসে পৌঁছেছে।

প্রৌঢ় সরাসরি তাদের সামনে এসে এগিয়ে এলেন। বললেন : স্বাগতম্। ওয়েলকাম-প্যাডি ওমুরের বাড়িতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।

আপনি? হ্যাঁ, আমি আয়ারল্যান্ডেরই লোক। যা অবস্থা, তাতে দেশে থাকলে কবেই না-খেতে পেয়ে মারা যেতুম, এখানে এসে চাষ-আবাদ করে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি। আসুন, ভেতরে আসুন সবাই-তারপর ভালো করে আলাপ করা যাবে। কতকাল যে এখানে বাইরের লোকের পা পড়েনি-মাঝে-মাঝে একেবারে হাঁপ ধরে যায়।

প্রৌঢ় তাদের নিয়ে গেলেন মস্ত-একটা ঘরে, যার মাঝখানে রয়েছে বিশাল-একটা টেবিল, বাসনকোশন খাবারদাবার দেখে মালুম হলো এটাই এই খামারের ডাইনিং হল। বোঝাই গেলো, সবাইকে নিয়ে প্রৌঢ় খেতে বসছিলেন, এবার অভ্যাগতদেরও তাদের সঙ্গেই বসিয়ে দিলেন খাবারটেবিলে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।

আমাদের অপেক্ষায়? বিস্ময়ে লর্ড গ্লেনারভনের বুঝি বাস্তুর্তিই হতে চাচ্ছিলো না।

রোজই অতিথিদের অপেক্ষা করি কিনা-যদি কেউ দৈবাৎ পথভুল করে এখানে এসে পড়ে। আমার দরজা সারাবছর ঐ অনাগত অতিথিদের জন্যে খোলা থাকে। অবশেষে এখন, যা-হোক, আপনারা এসে পৌঁছেছেন।

নির্জনবাসের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই লর্ড গ্লেনারভনের। কিন্তু এ-কথা থেকে এটুকুই শুধু বুঝতে পারলেন যে, সারাদিন না-হয় খেটেখুটে কাজে-কর্মে কাটিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু অবসর সময়ে দুটো কথা কইতে না-পারলে পেট ফেঁপে যায়, বুঝি দম আটকেই যায়, গলার কাছে এত কথা জমে থাকে। ড্যানিয়েল ডি-ফো রবিনসন ক্রুসো-র গল্পটা বোধহয় কেঁদেছিলেন জাহাজডোবা নাবিক আলেকজান্ডার সেলকাককে নিয়ে-কিন্তু ফ্রাইডে যদি না-আসতো তাহলে একদিন একা থাকতে-থাকতে ক্রুসোর দশা যে কী হতো, সেটা ভাবতেই বুক শুকিয়ে যায়।

প্যাডি ওমুর-সেটাই তো এই দিলদরিয়া প্রৌঢ়র নাম, তা-ই না?-অ্যাডিন বাদে অচেনা-কারু সঙ্গে কথা বলতে পেরে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, কথার যেন ফুলঝরি ছুটছে। খেতে-খেতেই নিজের কাহন শোনালেন সাত-সতেরো। তারপর একসময় শুনলেন গ্লেনারভনদের সাগরপাড়ির পেছনকার কাহিনিটা। সারা আমেরিকা ছুঁড়ে বেরিয়েও এখনও তারা কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো সন্ধান পাননি-যেন মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন-এবারে এই অস্ট্রেলিয়াতেও ব্রিটানিয়ার কোনো হদিশ না -পেলে, বাধ্য হয়ে, শেষটায় এই বেচারী ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ঘরের ছেলেকে ঘরেই ফিরে যেতে হবে।

লর্ড গ্লেনারভন যেমনভাবে কাণ্ডেন গ্রান্টের কাহিনিটা কেঁদেছিলেন, তাতে তা সকলেরই মর্মস্পর্শ করেছিলো। শুনতে-শুনতে কখন যে সবাই কাঁটাচামচে নাড়ানো বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে এই করুণ কাহিনীতে মগ্ন হয়ে পড়েছিল, তা কেউই খেয়াল করেনি। হঠাৎ চমক ভাঙলো কার কথায়, স্তব্ধতার জন্যেই সম্ভবত অতর্কিত কথাগুলোকে ঠিক দৈববাণীর মতো শোনালো :

কাপ্তেন গ্রান্ট যদি এখনও বেঁচে থাকেন, তবে অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন!

.

দুই

আকাশবাণী এবং আয়ারটন

যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ করেছে, এমনভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠলেন লর্ড এডওয়ার্ড।

কে? কে এ-কথা বললে? আমি, টেবিলের ওপাশ থেকে শান্ত ধীরগলায় জবাব দিলে
প্যাডি ওমুর-এরই এক সাগরেদ।

আর তার দিকে তাকিয়ে এবার তাজ্জব হওয়ার পালা খোদ প্যাডি ওমুর-এরই। তুমি?
আয়ারটন?

হ্যাঁ। এঁদের মতো আমিও হাইল্যান্ডার-স্কটল্যান্ডেরই মানুষ। ব্রিটানিয়া জাহাজে আমিও
ছিলুম।

এটা যেন দ্বিতীয়-আরেকটা বজ্রাঘাত।

কী বলছে এই লোকটা, এই-যাকে আয়ারটন বলে সম্বোধন করেছেন প্যাডি ওমুর?
ব্রিটানিয়া-য় ছিলো এ? কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে?

মেরি প্রায় যেন মূর্ছাই যাবে!

জন ম্যাঙ্গল, জাক পাঞ্চয়ল, রবার্ট গ্রান্ট-সবাই ততক্ষণে যে-যার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এসে ঘিরে ধরেছেন আয়ারটনকে।

রক্ষ, হটাকটা চেহারা আয়ারটনের, অনেকদিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার জন্যেই বোধ, করি লোনা হাওয়ায় রোদে-জলে গায়ের রঙ প্রায়-তামাতে। ঘন জোড়াভুরু, ঝোঁপের মতো ঢেকে রেখেছে তার তীব্র দুটি চোখকে। দড়ির মতো পাকানো-কিন্তু কঠিন জোয়ান নাবিকশরীরে পেশী ছাড়া যেন আর-কিছুই নেই-মেদবর্জিত বাহুল্যবর্জিত ঋজু শরীর। লম্বা তেমন নয়, কিন্তু প্রকাণ্ড চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ, ক্ষিপ্ত, তেজিয়ান। মুখের মধ্যে একটা বেপরোয়া দুঃসাহসী তেজের ছাপ।

তুমি ছিলে ব্রিটানিয়ায়?লর্ড এডওয়ার্ডের গলার স্বরে একইসঙ্গে যেন বিস্ময়, অবিশ্বাস, আর হঠাৎ-মাথা-চাড়া-দেয়া একটা আশার ভাব।

আমি ছিলাম কোয়ার্টারমাস্টার-আমার ওপরই ভার ছিলো হালের, সিগন্যালের, সারেণ্ডের জাহাজডুবির পর তুমিও কি কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে গিয়ে ডাঙায় উঠেছিলে?

না, আমি হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ডেক থেকে ছিটকে পড়ে যাই জলে—

আমরা যে-চিরকুট পেয়েছি তাতে দুজন নাবিকের কথা লেখা আছে। তুমি তাহলে সে-দুজনের কেউ নও?

না। কিন্তু কোন-চিরকুটের কথা বলছেন? আমি তো কোনো চিরকুটের কথা জানি না। আমি ভেবেছিলাম, আর-সকলের সাথে কাপ্তেন গ্রান্টেরও বুঝি সলিলসমাধি হয়েছে, শুধু আমি একাই কোনোমতে প্রাণে বাঁচতে পেরেছি—

কিন্তু তুমি তো নিজেই এইমাত্র বললে যে কাপ্তেন গ্রান্ট বেঁচে আছেন—

তা তো বলিনি। বলেছি, কাপ্তেন গ্রান্ট যদি এখনও বেঁচে থাকেন—

বলেছো, তবে তিনি অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন!

হ্যাঁ। বেঁচে গিয়ে থাকলে এখানেই কোথাও তিনি আছেন।

এতক্ষণে, ফাঁক পেয়ে, মেজর মাকন্যাস আসল প্রশ্নটা করলেন। ব্রিটানিয়া ঠিক কোনখানে ডুবেছিলো?

আসলে প্রথম প্রশ্নটা এইটেই হওয়া উচিত ছিলো। উত্তেজনায় সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের, তাই এতক্ষণ তিনি উলটোপালটা নানান প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন—তিনি এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি যে কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে ব্রিটানিয়া জাহাজের সেই কপালমন্দ-পাড়িতে ছিলো, এমন-করু সঙ্গে সত্যি তাদের দেখা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার কাছেই, প্রায় তীরে এসে। প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ থেকে আমি ছিটকে পড়ে যাই। জাহাজ নিশ্চয়ই তারপরেই ডুবেছে।

এবার জন ম্যাঙ্গসের আরো-একখানা মোক্ষম প্রশ্ন, এ যদি সত্যি ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টারমাস্টার হয়ে থাকে তবে এ-প্রশ্নের উত্তর তার জানা উচিত। কত অক্ষরেখায়?

সাঁইত্রিশ ডিগ্রি—

পশ্চিম উপকূলে?

না, পূর্ব উপকূলে।

যেমন দুমদাম করে প্রশ্ন আসছে, তেমনি দুমদাম করে আয়ারটন উত্তর দিচ্ছে। উত্তর দিতে একমুহূর্তও দেরি হচ্ছে না তার, একটুও দ্বিধা বা দোনোমনার ভাবও নেই।

সেটা কত তারিখ ছিলো?

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সাতুই জুন-রাতের বেলায়, সেইজন্যেই জলে ছিটকে পড়ার পর গোড়ায় আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনি-তা ছাড়া সমুদ্রেও খ্যাপা তাণ্ডব চলছিলো, বড়ো-বড়ো সব ঢেউ, ঢেউয়ের সঙ্গে যুব্বতে গিয়ে একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছিলাম—

কিন্তু তার স্মৃতিচারণ থামিয়ে দিয়ে ততক্ষণে লর্ড এডওয়ার্ড বলে উঠেছেন, তারিখ তো মিলে যাচ্ছে! এতক্ষণে তার গলায় হর্ষের একটু আভাস এসেছে।

জেরা চললো, তারপরেও, অনেকক্ষণ। কত-যে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলো আয়ারটন, গলার সুরে দ্বিধা নেই, চোখের পাতা কঁপেনি, ককখনও একটু খতমতও খায়নি।

আর যতক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে, সারাক্ষণ প্রায়-পলকহীন চোখে তারই দিকে তাকিয়ে থেকেছে মেরি। এতদিনে বুঝি একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে-বুঝি অবশেষে বাবার সঙ্গে আবার তার দেখা হবে-প্রায় মৃত্যুর মধ্য থেকে ল্যাজারাসের মতো অন্ধকার কুঁড়ে এবার উঠে আসবেন কাণ্টেন গ্রান্ট। ব্রিটানিয়ার একজনের খোঁজ যখন পাওয়া গেছে, তখন অন্যদেরও দেখা মিলতে আর কি বেশি দেরি হতে পারে?

কাণ্টেন ম্যাঙ্গলস আর মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কিন্তু এত-সহজে কোনো অভাবিত উটকো দাবি মেনে নিতে রাজি নন। বিশেষত, সমুদ্রে-যারা-ঘুরে-বেড়ায় তারাই জানে অনেক ভাগ্যশ্রেষ্ঠী ফেরেব্বাজ চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কানাঘুষোয় তারা শুনতে পায় কোথায় কোন জাহাজডুবি হয়েছে, তারপর জাহাজের মালিক বা জাহাজের কাণ্টেনের বাড়ির লোকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে সাতকাহন ফেঁদে এ-ধরনের লোক তাদের নিংড়ে টাকাকড়ি বার করে নেবার চেষ্টা করে থাকে। বিশ্বাসপ্রবণ লোকদের ঠকাবার জন্যে কত লোকই যে ওৎ পেতে থাকে-এ যেন ঝোপে-ঝোপে সব নেকড়ে, উৎপাত বাধাবার জন্যে সবসময়েই প্রস্তুত। ফলে কাণ্টেন আর মেজর আরো-নানা কথা জিগেস করে জেনে নিতে চাচ্ছিলেন, এই আয়ারটন যা-যা বলছে, সে-সব কথা ঠিক কি না। না-যাচাই করে, না-বাজিয়ে নিয়ে চোখবুজে অনায়াসে সবকিছু বিশ্বাস করে নেয়া চলে না। বিশেষত তারা দুজনেই এইদলের মধ্যে সবচেয়ে সন্দেহপ্রবণ, সবচেয়ে পোড়খাওয়া লোক। এটা অন্তত তাদের জানতে বাকি নেই যে সমুদ্রের ধারে বাতাসে যে-সব কথা ভেসে বেড়ায় তাতে সালতারিখ মিলিয়ে কাউকে ধাপ্লা দেয়া খুবই সহজ কাজ।

কিন্তু আয়ারটন যখন ব্রিটানিয়ার এই এতবড়ো সাগরপাড়ি দেবার আগেকার ঘটনা নির্ভুলভাবে সব বলে গেলো, তাদের সন্দেহও আন্তে-আন্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো। তার

কথা থেকে এও বোঝা গেলো যে মেরি আর রবার্টকেও সে চেনে এইটুকু বয়েস থেকেই।

একবার-রবার্টের বয়েস তখন মাত্র দশ হবে-শেরিফকে নিয়ে একটা আপ্যায়নসভার আয়োজন হয়েছিলো জাহাজের ডেকে, ধুমধাম করে ভোজসভা বসেছিলো, এমন সময়ে হঠাৎ রব উঠেছিলো রবার্টকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না-তারপর অনেক খুঁজে দেখা গেলো সে মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে, পাল আঁকড়ে ধরে ল্যাগব্যাগ করে দোল খাচ্ছে শূন্যে।

অমনি রবার্ট সায় দিয়ে উঠলো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই হয়েছিলো। কিন্তু সে-তো কবেকার কথা। তখন আমি ভারি দুষ্ট আর দুরন্ত ছিলাম! এমন ভঙ্গি করে কথাটা সে বললে যেন এখন আর সে অমনতর ডানপিটেটি আর নেই।

এ-রকম একটা নয়, পর-পর অনেকগুলো ছোটোখাটো গল্পই বলে গেলো আয়ারটন। মেরি চোখ গোল-গোল করে হাঁ করে সব কথা শুনছে, আর যতই বাবার কথা শুনছে ততই যেন চোখের কোল ভিজে উঠছে তার। সে প্রায় ধরাগলাতেই জিগেস করলে তার বাবার কথা।

আয়ারটন বললে কাপ্তেন গ্রান্টের নাকি পরিকল্পনা ছিলো পাপুয়া-নিউগিনির পশ্চিম উপকূলে একটা নয়া উপনিবেশের পত্তনি করবেন, তার নাম দেবেন নিউস্কটল্যান্ড, ওলন্দাজরা যেমন কতগুলো দ্বীপের নাম দিয়েছিলো নিউ-আমস্টারডাম। সেবার কাইয়াও পেরিয়ে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে তিনি ইওরোপ ফিরছিলেন-এমন সময় হঠাৎ

আকাশ কালো করে জমলো ঘন মেঘ, আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুরন্ত ঘূর্ণিহাওয়া। ঝড়টা যেমন প্রচণ্ড ছিলো, তেমনি এসেছিলোও আচম্বিতে, অতর্কিতে। এমন দুর্যোগ তা এত বছরের নাবিক জীবনেও আয়ারটন আগে আর-কখনও দ্যাখেনি। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিও নেমেছিলো মুষলধারে-কেউ যেন আকাশ থেকে অবিশ্রাম পিপে-পিপে জল ঢেলে দিচ্ছিলো। দেখতে-না-দেখতে জাহাজের খোলে পর্যন্ত গিয়ে জল ঢুকলো, এতটাই যে জাহাজটা কাৎ হয়ে প্রায় বুঝি ডুবেই যায়। এরই মধ্যে প্রায়-ডুবুডুবু জাহাজ নিয়েই যেন ধুকতে-ধুকতে এগুচ্ছিলো ব্রিটানিয়া, আর বাইশে জুন সেই দুর্যোগের মধ্যেই দূর থেকে আবছা দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল। যখন সবাই ভাবছে এবার বুঝি কোনোরকমে জাহাজটাকে নিরাপদে নিয়ে গিয়ে তীরে ভেড়ানো যাবে, তখন একটা চোরা ডুবোপাহাড়ে ঘা লেগে থরথর করে কেঁপে উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো ব্রিটানিয়া। সেই-তখনই ঐ অতর্কিত ঝাঁকুনিতে আর ঢেউয়ের ঝাঁপটায় আয়ারটন ছিটকে পড়েছিলো জাহাজ থেকে। তারপর থেকে কাণ্ডন গ্রান্ট বা ব্রিটানিয়ার আর-কোনো খবরই পায়নি সে। ধরে নিয়েছিলো, সেখানেই অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলের কাছেই ব্রিটানিয়া ডুবে গিয়েছে-সেই দুর্যোগের মধ্যে আর-কেউই আত্মরক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু এখন খাবারটেবিলের কথাবার্তা থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে, কাণ্ডন গ্রান্ট দুজন সঙ্গীসমেত বেঁচে গিয়েছেন, কিন্তু তার অবস্থা এখন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর-কেননা তাদের পাকড়েছে বুনো আদিবাসীরা, জংলিরা-কথা শুনে সে বুঝতে পেরেছে যে কোনোরকমে একটা বোতলে নিজেদের দুরবস্থার কথা চিরকুটে লিখে কাণ্ডন গ্রান্ট বোতলটা জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

আয়ারটন নিজেও তীরে ভেসে এসে জংলিদের হাতে ধরা পড়েছিলো। তারা তাকে পাকড়ে গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে আটকে রেখেছিলো তার ওপরে নাকি তারা অকথ্য

অত্যাচার করেছে, সে-সব নির্যাতনের চিহ্ন এখনও আছে তার শরীরে। সেখানে দু-বছর বিস্তর দুর্ভোগ পোহাবার পর সে কোনোরকমে প্রাণ হাতে করে পালায়-কেমন করে সে প্রাণে বেঁচেছে, হাজারো বিপদ উপেক্ষা করে এতদূর পথ পাড়ি দিয়েছে সে-ও প্রায়-এক অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর কাহিনী। মাত্র দু-মাস হলল, এখানে প্যাডি ওমুরের খামারে কাজ পেয়ে সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে-এখন অন্তত প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই, খাটবে আর খেয়ে-পরে বাঁচবে-খাটতে সে ডরায় না, কিন্তু এতসব দুর্ভোগের পর এখন একটু নিশ্চিত্ত জীবন চাই তার।

এতক্ষণ সবাই প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই তার এই রগরগে আখ্যান শুনছিলো। কিন্তু তাকে দম ফেলবার কোনো ফুরসৎ না-দিয়েই মেজর ম্যাকন্যাসের হঠাৎ জিগেস করে বসলেন : ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টারমাস্টার ছিলে তুমি? পেটি-অফিসার?

আয়ারটন ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ। বলেই বুঝতে পারলো যে এখনও তাদের সন্দেহ ঘোচেনি। তাই সে আরো জুড়ে দিলে : এত দুর্বিপাকের মধ্যেও আমি কিছু-কিছু কাগজপত্র বাঁচাতে পেরেছি-আর সে-সব আমার সঙ্গেই আছে। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।

শাবুদ এসে হাজির করলে সে প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যেই : কাণ্ডেন গ্রান্টের স্বাক্ষর-সংবলিত চিলতে একটুকরো কাগজ, তাতে এই মর্মে একটা বয়ান যে অমুক মিস্টার আয়ারটন...ব্রিটানিয়া জাহাজের কোয়ার্টারমাস্টারের পদে নিযুক্ত হয়েছে। কাগজটা সে তুলে দিলে মেজর ম্যাকন্যাব্স-এরই হাতে, কেননা তার হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো তিনি খুব-একটা কড়ামেজাজের লোক, আর্মির কোনো কেউকেটা, শাবুদ ছাড়া কোনো কিছু এককথাতেই বিশ্বাস করে ফেলার পাত্তর তিনি নন। কিন্তু যখন এই জিজ্ঞাসাবাদ ও

সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করার প্রক্রিয়াটা চলেছে, তখনই প্যাডি ওমুর একটু মিনমিন করে বলেছিলেন : আয়ারটনকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, মেজর। গত দুমাস ধরে তো একে আমি দেখছি-খুব চটপটে কাজের লোক। জাহাজডুবির কথা সে আগেই আমাকে বলেছিলো-তবে অবশ্য এতটা খুঁটিনাটি সমেত বিশদ করে বলেনি।

মেজর ম্যাকন্যাব্স কাগজের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই সেটা চালান করে দিয়েছিলেন লর্ড এডওয়ার্ডের হাতে। গ্লেনারভনও সেটা আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। তারপর সকলের উদ্দেশ্যেই বললেন :এখন তাহলে কী করা উচিত আমাদের? আচ্ছা, আয়ারটন, তুমিই বলো-এ-অবস্থায় কী করা যায়?

আয়ারটন প্রথমটায় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলে। তারপর বললে : আমাকে যে আপনাদের বিশ্বাস হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার নিজের একটা কথা মনে হচ্ছিলো। আমি যে-রকমভাবে তীরে সাঁতরে উঠে এসে বুনোদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলাম, আমার মনে হয় কাণ্ডেন গ্রান্টেরাও যদি ওরই কাছাকাছি কোথাও ডাঙায় উঠে থাকেন, তাহলে নির্ঘাৎ জংলিদেরই কবলে পড়েছেন। ওঁদের খোঁজ করতে হলে আমাদের গোড়ায় অকুস্থলে যেতে হবে-ঠিক যেখানটায় জাহাজডুবি হয়েছিলো, সেখানে। প্রথম খোঁজখবর সেখান থেকেই শুরু করা উচিত।

একবার কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন : কিন্তু সেটা তো এফুনি করা যাবে না। জাহাজ মেরামত করতে হবে-তাতে খানিকটা সময় লাগবে। বিশেষত এখানে যেহেতু কোনো জাহাজসারাইয়ের উপযুক্ত বন্দর বা কারখানা নেই, আমাদের তাই একটু অসুবিধের মধ্যেই কাজ করতে হবে।

এতক্ষণ জাক পাঞ্চয়ল যে কী করে চুপচাপ বসে-বসে অন্যদের কথাবার্তা বিনাবাক্যব্যয়ে শুনছিলেন, সেটাই আশ্চর্য। তার নিশ্চয়ই কথা বলার জন্যে সারা মুখটাই চুলবুল করছিলো। এতক্ষণ তিনি কেবল উশখুশই করেছেন, কিন্তু লাগসই কোনো কথা ভেবে বার করতে পারেননি। এবার সুযোগ পেয়েই তিনি সরাসরি একটা সিদ্ধান্তই ঘোষণা করে বসলেন-তঁার একার নেয়া সিদ্ধান্ত : তাহলে আমরা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরা বরাবর ডাঙার ওপর দিয়েই যাবো-তাতে এ-অঞ্চলটা সরেজমিন জরিপ করে দেখাও হবে।

কিন্তু ডানকান? জাহাজের নামটার ওপর একটু জোর দিয়েই জিগেস করলে আয়ারটন।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স যদি সঙ্গে থাকেন, তাহলে আমরা সোজা ভিক্টোরিয়া চলে যাবোনা, না, মেলবোর্নেই যাবো-ডানকান যেখানে ঠিকভাবে কারখানায় সারাই হবে, সেখানে। আর মেলবোর্নে তাদের না-পাওয়া গেলে, ডানকানআমাদের তুলে নিয়ে যাবে টুফোন্ডে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, আমাদের সঙ্গে মহিলারাও থাকবেন। পাঞ্চয়ল এ-কথাটা বললেন মেরি আর লেডি হেলেনার দিকে একটি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

আপনি কি ঠাট্টা করছেন নাকি, মঁসিয় পায়ল? লর্ড এডওয়ার্ড একটু বুঝি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতেই বললেন।

ঠাট্টা? উঁহু, মোটেই না। কতটাই বা যেতে হবে, ভাবুন তো? মাত্র তো সাড়ে-তিনশো মাইল পথ। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর বরাবর কোথাও যে বুনোরা আছে, এমন কথা আমি কোনো বৃত্তান্তেই পড়িনি। তেমন-কোনো গভীর জঙ্গলই নেই তো জংলিদের দেখা পাবেন কোথায়? কোনো হিংস্র জন্তুজানোয়ারও নেই-যদিও এখানে এমন-অনেক জীবজন্তু আছে

যা পৃথিবীর অন্য-কোথাও নেই। অনেকটা রাস্তায় রেললাইন আছে, সুসভ্য শ্বেতাজরা আছে (এখানে সুসভ্য কথাটায় বেশ জোরই দিলেন পাএওয়ল, সম্ভবত বুনো বর্বরদের সঙ্গে তাদের ব্যবধানটা কথাটায় চাপ দিয়েই তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন), গাড়িঘোড়া আছে, বাড়িঘর আছে, বাতি আছে, একটা শাসনযন্ত্র অর্থাৎ সরকারি দফতরও আছে। একটা গাড়িতে করেই, রোজ যদি বারো মাইল পথও চলি, তবে খুব বেশি ধকল পোহাতে হবে না-একমাসের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো অস্ট্রেলিয়ার ওমাথায়-আপনারা যেমন এডিনবারা থেকে লণ্ডন যান, এ অনেকটা তারই মতো হবে আর-কি!

এমন-একটা ভঙ্গি করে পাএওয়ল কথাটা বললেন যেন অস্ট্রেলিয়ায় এতটা পথ পাড়ি দেয়া, মোটেই কোনো সমস্যাই নয়।

তাঁর জ্ঞানের বহরকে আস্থা জ্ঞাপন করেই লর্ড এডওয়ার্ড এবার লেডি হেলেনাকে জিগেস করলেন-কী? যাবে নাকি?

লেডি হেলেনা মৃদুহেসে বললেন :এক্ষুনি। এতে তো একটা দেশও দেখা হয়ে যাবে। স্কটল্যান্ডে কতজন ফিরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গল্প শোনায়ে আমাদের? যত স্কট এখানে আসে, তারা তো সবাই এখানে থেকেই যায়। আমরা বরং ফিরে গিয়ে সবাইকে মেলবোর্নের গল্প শোনাতে পারব।

এবার আয়ারটনের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন : আর, আয়ারটন? তুমি?

আয়ারটন কিন্তু তক্ষুনি হ্যাঁ বা না কিছুই বললে না। কী খানিক ভাবলে একটু। তারপর জিগেস করল : কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়ে উঠবেন ডানকানে?

অস্ট্রেলিয়ার এ-মাথা থেকে ও-মাথা ছুঁড়ে ফেলবার আগেই যদি কাণ্টেন গ্রান্টের পাত্তা পাওয়া যায়, তবে মেলবোর্নেই গিয়ে আমরা জাহাজে চাপবো। আর, তা না-হলে, একেবারে পূর্ব-উপকূলে।

আর কাণ্টেন?

তিনি জাহাজ নিয়ে মেলবোর্নে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন।

ঠিক আছে। প্যাডি ওমুর যদি আমায় ছেড়ে দিতে রাজি থাকেন, তবে আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কাণ্টেন গ্রান্টকে খুঁজে পেলে গঁকে গিয়ে বলবো-আই, আই, কাণ্টেন, বান্দা আবার কাজে যোগ দিতে এসেছে।

তার এ-কথা শুনে সবাই এতক্ষণ গভীর-গম্ভীর আলোচনার পর একটু যেন স্বস্তির দেখা পেলেন। কথাটা আয়ারটন এমনভাবে বলেছে যে কাণ্টেন গ্রান্টের সঙ্গে যেন অচিরেই সকলের দেখা হয়ে যাবে।

আয়ারটনকে ছেড়ে দেবার কথায় প্যাডি ওমুর তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন। আয়ারটন চৌকশ, চটপটে, কাজের লোক বটে, তবে এঁদের দরকার আরো-বেশি, আরো-জরুরি।

জাহাজ থেকে ছুতোর নিয়ে এলো তার সব সাজসরঞ্জাম-লর্ড এডওয়ার্ড তক্ষুনি তাকে গাড়ি তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন। এ-সব ব্যাপারে অকারণে ধানাইপানাই করে সময় নষ্ট করা তার ধাতে নেই-সিদ্ধান্ত একবার নিয়ে ফেললে তক্ষুনি সে-কাজটায় লেগে না-পড়লে তিনি যেন স্বস্তি পান না। সমস্ত কাজটা তদারক করার দায়িত্ব নিলে আয়ারটন-সেও তক্ষুনি কাজে লেগে পড়তে চায়। ছ-জোড়া বলদে-টানা কুড়ি ফিট লম্বা চারচাকার গাড়ি হবে-তাতে যাবেন মহিলারা। পুরুষরা সবাই ঘোড়ার পিঠে। গাড়ির মধ্যেই রসুই পাকাবার ব্যবস্থা থাকবে, রসদ থাকবে।

কাজকর্মের প্রাথমিক প্রস্তুতিটা সারাহতেই আয়ারটনকে ডানকানেনিয়ে এলেন লর্ড এডওয়ার্ড। ডানকান মূলত প্রমোদতরী-বিলাসব্যবস্থার কোনো ঘাটতি নেই তাতে-কিন্তু বিলাসের এতসব উপকরণের দিকে আয়ারটনের কোনো ভ্রক্ষেপই নেই। সে সরাসরি এসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো এনজিনঘর, জাহাজের গড়ন, খোল, মাস্তুল, বয়লার। ঘন্টায় সতেরো নট যেতে পারে ডানকান-এ-কথা শুনে এতটাই অবাক হলো যে তার চোখদুটো যেন চকচক করে উঠলো। তাহলে তো সবচেয়ে তেজি সবচেয়ে ক্ষিপ্ত যুদ্ধজাহাজও পাল্লা দিতে পারবে না এই জাহাজের সঙ্গে।

তা তো পারবেই না, একটু গর্বের সুরেই বললেন লর্ড এডওয়ার্ড, ডানকানকে তৈরিই করা হয়েছে দৌড়ের বাজিতে জেতবার জন্যে।

ওজন কত জাহাজের?

দুশো দশ টন।

ঘুরে-ঘুরে সারা জাহাজটাকেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে নিলে আয়ারটন। তার কৌতূহলের যেন শেষ নেই কোনো! দেখে নিলে কোথায় কী হাতিয়ার, কোথায় কী অস্ত্রশস্ত্র আছে। একেবারে-ঝকঝকে একটি অত্যাধুনিক কলকজায় তৈরি জাহাজ, এনজিনের শক্তি কত শুনে সে গোড়ায় যেন কথা বলবার শক্তিই হারিয়ে ফেললো। আজকাল যে এ-রকম শক্তিশালী সব জাহাজ তৈরি হচ্ছে এটা জেনে সে বললে, আমরা যখন ব্রিটানিয়াকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছি, তখন ইওরোপ কিনা এমন-সব জাহাজ বানাচ্ছে যা সবচেয়ে দুরন্ত ঝড়কেও আর ভয় পায় না। ঈশ, যদি এ-রকম একটা জাহাজ থাকতো আমাদের, তাহলে অমনভাবে ঝড়ে-খেপে-যাওয়া সমুদ্রে আমাদের জাহাজডুবিও হতো না-অমন দুর্ভোগও পোহাতে হতো না।

তখন না-হোক, এখন তো এ-জাহাজে তুমি কাজ করতে পারো, তার অমন খুশি দেখে বললেন লর্ড এডওয়ার্ড, হয়তো একদিন তুমিও এ-রকম কোনো জাহাজের কাপ্তেন হয়ে বসতে পারো।

যদি হতে পারি, এমন ভাবে আয়ারটন কথাটা বললে তাতে মনে হলো, এ রকম কোনো জাহাজ হাতে পেলে সে বুঝি স্বর্গসুখও প্রত্যাখ্যান করতে রাজি আছে।

আয়ারটনকে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের। আয়ারটন জাহাজ থেকে নেমে গেলে লর্ড এডওয়ার্ড মন্তব্য করলেন, লোকটা সত্যি খুবই সপ্রতিভ আর বুদ্ধিমান-কাপ্তেন গ্রান্ট সম্ভবত লোক চিনতে পারতেন

তা জানতেন কিনা, কে জানে, বললেন মেজর ম্যাকন্যাব্স, তবে লোকটা বোধহয় অতিরিক্ত-বুদ্ধিমান। এত-বুদ্ধি সইলে হয়! তার বিচ্ছিন্নভাবে মুখকোনো দেখে বোঝা গেলো আয়ারটনকে তার আদপেই পছন্দ হয়নি। খাবারটেবিলেও তিনিই আয়ারটনকে সবচেয়ে-বেশি কুট প্রশ্ন করছিলেন।

গাড়িটা তৈরি হয়ে যেতেই, আর যেন তার সইলো না কারু। ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৪ সালের সকালবেলায় শুরু হলো দক্ষিণ গোলার্ধের এই অন্যমহাদেশটায় তাদের অভিযান। বলদে-টানা গাড়িটায় রইলেন মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনা, আর গাড়োয়ান হলো আয়ারটনই-এদিককার পথঘাট অন্যদের তুলনায় তারই বেশি চেনা। পেছনে চললে সশস্ত্র সাতজন অশ্বারোহী-লর্ড গ্লেনারভন, মেজর ম্যাকন্যা, জাক পাঞ্চওয়ল, রবার্ট গ্রান্ট, কাপ্টেন ম্যাঙ্গ-আর ডানকানেরই দুজন বাছাই-করা নাবিক।

আয়ারটন শুধু একবার বলেছিলো এখানকার পথঘাটে নিরাপত্তার জন্যেই সঙ্গে আরো লোক থাকা দরকার। আরো কয়েকজন নাবিক সঙ্গে থাকলে তার মতে আরো নাকি বেশি-নিশ্চিত হওয়া যেতো। কিন্তু লর্ড এডওয়ার্ড আর কাপ্টেন ম্যাঙ্গল্‌স আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, মেলবোর্নে গিয়ে জাহাজ মেরামতের কাজটা তাড়াতাড়ি সারবার জন্যে বেশি নাবিক থাকা দরকার জাহাজটাতেই। তাছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গেই যেহেতু যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র আছে, তাতে এই সাত অশ্বারোহীই পথে কোনো গণ্ডগোল হলে সব সামলাতে পারবে।

আগেই আলোচনা করে স্থির হয়েছিলো এই দলটা যখন ডাঙায় কাপ্টেন গ্রান্টের খোঁজ নিতে-নিতে মেলবোর্নের দিকে যাবে, তখন টম অস্টিনই জাহাজ নিয়ে যাবে মেলবোর্নের

জাহাজসারাইয়ের ঘাঁটিতে। টম অস্টিন কাজের লোক, দায়িত্ব সম্বন্ধে সে পুরোপুরি সচেতন, আর ভালো নাবিক হবার যেটা সবচেয়ে বড়োণ সেটাও তার আছে-গভীর সংকটের সময়ও সে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে।

তিন

ছুঁড়ে মারলেও যা হাতে ফিরে আসে, ফের

অস্ট্রেলিয়া একটি বিশাল মহাদেশ, কিন্তু এর বেশিরভাগ অংশই জনমানবহীন, কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও-বা দুরারোহ পর্বত, এই যদি উপত্যকার মস্ত অংশ জুড়ে থাকে ঝোঁপঝাড় গাছপালা-পরক্ষণেই বিশাল বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তৃষ্ণায় জিভ চাটে রুম্ব, উষর, ধু-ধু ধুলোর মরুভূমি। লোকালয় যা আছে, সবই সমুদ্রের তীর ঘেঁসে গড়ে-ওঠা উপনিবেশে; সমুদ্রতীর থেকে যতদূরে কেউ যাবে, যত দেশটার ভেতরে ঢুকবে ততই দেখতে পাবে আস্তে-আস্তে বিরল হয়ে আসছে বসতি, ক্রমে চোখে পড়বে যে কোথাও কোনো মানুষজন নেই-এমনকী দেশটার আদি বাসিন্দারা অদি খুব-একটা অভ্যন্তরে যায় না। আর এই ভিতরদেশকেই বলে আউটব্যাক।

এখানে আকাশটা অদি অন্যরকম, ভিন্নরকম। যে-তারা ইওরোপের লোক দ্যাখে আকাশের পুরে, এখানে সেটা ওঠে পশ্চিমে-যেটা দেখা যায় ইওরোপের গ্রীষ্মবসন্তে, সেটা এখানেও দেখা যায় গ্রীষ্মবসন্তে-কিন্তু এখানে যে ঋতুগুলোই উলটে গিয়েছে। তারা রওনা হয়েছেন ডিসেম্বরের শেষে, আর দু-দিন, পরেই বড়োদিন, অথচ এখানে

তাপমানযন্ত্র দেখায় গরম এমনকী ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইটকে ছাপিয়ে গিয়েছে, যেখানে-
যেখানে পথে গাছপালা পড়ে তার পাতাটুকু অন্ধি নড়ছে না, হলকায় যেন ঝিম ধরে
আছে সব, প্রায় যেন থমথমে, নিশ্চল। আর এই ধরনের আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত এই
অভিযাত্রীরা গরমে যেন ধুকতে শুরু করে দিয়েছেন, যেটা হলো হাঁসফাঁস করারও পরের
অবস্থা।

দেশটা গড়ে উঠেছে-আদিবাসিন্দাদের যথাসম্ভব পরিকল্পনামাফিক খতম করে দেবার পর
অথবা আউটব্যাংকে রে-রে করে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পর-ফরচুনহান্টার্সদের দ্বারা, যে-সব
ডাকাবুকো গাটাগোটা লোকেরা নিজেদের নাম বলে ভাগ্যান্বেষী, কেউ হয়ে যায় বুশম্যান,
ঝোঁপ-ঝড়ের দস্যু, অতর্কিত চড়াও হয় জনপদে, আর ছিনিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু-এইসব
বাপেতাড়ানো মায়েখেদানো দুর্দান্ত গুণ্ডার দল। এরা নিজেদের দেশে হয়তো খেতে
পেতো না, জমিদারের অত্যাচারে জেরবার হয়ে যেতো, সংগঠিত প্রতিবাদ করবারও
সাহস হতো না কখনও, কাজেই দু-একটা হাতিয়ার আর নিজের প্রাণটা সম্বল করে এরা
এই দূর-দেশে অন্য-একটা গোলাধেঁই, আরেকটা হেমিস্ফিয়ারেই পাড়ি জমিয়েছে। অন্য-
যারা আছে তারা অধিকাংশই কয়েদি-কেননা ইংরেজ সরকার এই উপনিবেশটা গড়ে
তুলেছে পিনাল কলোনি হিসেবে-ইংলণ্ডের মতো ছোট দ্বীপ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে
নির্বাসনই, কেননা আস্ত-একটা মহাদেশকে তো আর দীপান্তর বলা যায় না-যতরাজ্যের
দুষ্কৃতকারীদের; সেইসঙ্গে রাজনৈতিক কারণে যারা সরকারের চক্ষুশূল, তারাও বাদ
যায়নি-আর অনেকে পালিয়ে এসেছে। স্বেচ্ছায়, যখন শুনেছে সরকারের চরদের
নেকনজর পড়েছে তাদের ওপর। আর এইসব কয়েদিদের দিয়ে বিনামজুরিতে খাঁটিয়ে
নেবার কাজটা করাবার জন্যে আছে নির্মম নিষ্ঠুর যত ওয়ার্ডেন আর ওয়ার্ডারের দল-
ইওরোপ থেকে প্রায়-একটা আস্ত কঠোরনির্মম শাসনব্যবস্থাই পরিকল্পনামাফিক তুলে

এনে বসিয়ে দিয়েছে ইংরেজরা, যাদের রাজত্ব এখন এতই বিশাল, আর এতই ছড়ানো যে সে-রাজত্বে নাকি ককখনো সূর্যও ডোবে না, মনুষ্যত্ব যদি সাগরজলে সমাধি পায় তো সে অন্যকথা। শুধু-যে অচেনা প্রকৃতিই এখানে বিরূপ, তা-ই নয়, মানুষজনগুলোও বুঝি তারই সঙ্গে মানিয়ে হয়ে উঠেছে রুম্ফ, ককর্শ, আর সারাক্ষণ তারা নিজেরাই খাটে অথবা তাদের দিয়ে উদয়াস্ত খাঁটিয়ে নেয়া হয় বলে, পিঠ বাঁকিয়ে সারাক্ষণ নুয়ে ঝুঁকে কাজ করতে হয় বলে তীব্রতী রোদদুরে যাদের ঘাড় চিংড়িমাছের মতো টকটকে-লাল হয়ে গেছে, আর সেইজন্যেই যাদের নাম হয়েছে রেডনেক, আর রেডনেক বললেই বুঝতে হবে যে ঘরে বসে পুথিপত্র পড়ে দর্শন আলোচনা করার কপাল করে তারা জন্মায়নি। শাসনযন্ত্র, স্বাভাবিকভাবেই, এর সঙ্গে মানানসই। রাজপুরুষরা আছে, আর আছে সেপাইশাস্ত্রী, উর্দি, সমরবাহিনী, কানাকাড়া, বিউগল, আর তারই সঙ্গে জড়ানো যাবতীয় আনুষঙ্গিক লেজুড়। পৃথিবীটাকে এখানে উলটে দিয়ে যেন অন্য-গোলার্ধের যাবতীয় বিষয়বস্তুও এখানে এনে পুঁতে দেয়া হয়েছে। তবে প্রকৃতি তো শূন্যতার স্বভাববিরোধী-সে এই মানুষগুলোকে দিয়েই গান গাওয়ায়, ব্যালাড বা গাথা, অভিযাত্রীদের কাহিনী, বীরদের কাহিনী, দস্যুদের কাহিনী, সেই-যে এক দস্যু ছিলো যার নাকি পায়ের আঙুল ছিলো সাতটা-না, তার গোড়ালি অবশ্য ওলটানো ছিলো না।

তাই এই অভিযাত্রীরা বেরুবার আগে আয়ারটন ভয়ে-ভয়ে বলেছিলো, সঙ্গে আরো-কয়েকজন সশস্ত্র নাবিক নিয়ে গেলে হতো না-আত্মরক্ষার সুবিধে হতো যদি অতর্কিতে কোনো ঝোঁপঝপ্পড় থেকে বিপদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো লর্ড গ্লেনারভনের এই বহরটার ওপর। কেননা লোকালয়গুলো এতই দূরে-দূরে যে হঠাৎ আক্রান্ত হলে সাহায্য আসার সম্ভাবনা তো সুদূরপর্যন্ত। কিন্তু লর্ড গ্লেনারভনের হিশেবটা ছিলো অন্যরকম। সাঁইত্রিশ

ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলটা তেমন জনমানবহীন নয়-সমুদ্র দূরে নেই বলেই এখানে একটু পরে-পরেই উপনিবেশের লোকেরা বসতি বসিয়েছে।

অতর্কিতে কোনো হামলা হলে তাকে সামলাবার জন্যে সবাইকেই সবসময় সজাগ থাকতে হবে, অলিখিত নির্দেশটা দেয়া ছিলো এ-রকমই। কিন্তু যে-হামলাটা শুধু আচম্বিত নয়-হয়তো অপ্রত্যাশিতও ছিলো-শুধু হামলার বহর আর বাহারটাই নিশ্চয়ই জানা ছিলো না-সেই হামলাটা যখন এলো তখন তাকে ঠেকাবার ক্ষমতা দেখা গেলো কারুই প্রায় নেই। হামলাটা এলো খুদে-খুদে সব পোকামাকড়ের কাছ থেকে, মশার কাছ থেকে, কামড়ে ফুলিয়ে ঢোল করে দেয় এমন-জাতের মাছির কাছ থেকে। বীলজেবাবকে যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থেঅর্থাৎ বাইবেল-এ পতঙ্গদেব বলেছে, লর্ড অভ দ্য ফ্লাইস বলেছে, তা কি এইজন্যেই? কেননা সেই সকাল থেকে একটানা চলে যখন আউটব্যাকের মধ্যে অর্থাৎ গাছপালাবিহীন বিশাল একটা প্রান্তরে এসে পৌঁছুলো বহর, তখনই প্রথম দেখা হলো পতঙ্গদেবের এইসব অনুচরদের সঙ্গে, এবং প্রথম সাক্ষাতেই তাদের বিকট মাখামাখিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেলো, যেন সর্বাস্থে কতগুলো কাকড়াবিছে কামড়েছে।

তাদের এই নাছোড় আদরে সবাই যখন কারাচ্ছে তখন আয়ারটনের পরামর্শে গায়ে অ্যামোনিয়া ঘসে কোনোরকমে জ্বলুনি একটু কমলো। একে অসহ্য গরম, তারপর এই মশামাছির উৎপাত : সোনার ওপর যেন সোহাগা। ঠা-ঠা রোদুরে একটুও ছায়া নেই কোথাও। গাছপালা থাকলে তো ছায়া থাকবে। সন্দের দিকে অবশ্য তাপমানযন্ত্র একটু দয়া করলো, আর এবার ছোটোখাটো ঝোঁপঝাড়ও দেখা দিতে লাগলো-অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার সেই বিখ্যাত বুশ-যার আড়ালে নাকি লুকিয়ে থাকে ডাকাতরা, এখানকার লোকে যার নাম দিয়েছে বুশ-রেজার, ঝোঁপঝাড়বাজ।

শুধু কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ পাবার তাড়াতেই যেন এই জনমানবহীন প্রান্তর পেরিয়ে এলো বহর, দু-দিন প্রায়-একটানা চলে পেরুলো ষাট মাইল। এই খাঁ-খাঁ প্রান্তরে, ধূ-ধূ মাঠে কোথায় কার কাছে জিগেস করেই বা জানা যাবে কাণ্ডেন গ্রান্টের হৃদিশ কেউ জানে কি না। যতক্ষণ-না কোনো লোকালয় আসে, ততক্ষণ এভাবেই হুড়মুড় করে চলতে হবে তাদের। সবাই ভেবেছিলো মেরি আর রবার্ট বুঝি পথের এই ধকলে একেবারে কাহিল হয়ে পড়বে। কিন্তু একবার যখন আয়ারটন তাদের জানিয়েছে এই অস্ট্রেলিয়ার কাছে এসেই ডুবেছে ব্রিটানিয়া আর কাণ্ডেন গ্রান্ট যদি সলিলসমাধি থেকে বেঁচে থাকেন, তবে এই অস্ট্রেলিয়াতেই নিশ্চয়ই কোথাও আছেন, তারপর থেকেই যেন স্নায়ুর উত্তেজনা তাদের টানটান করে রেখেছে, পথের কোনো কষ্টই তারা গায়ে মাখছে না।

যদি-বা এখনও কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো সন্ধান না-পেয়ে তারা মুষড়ে পড়ে থাকে, তবে অন্যদের মতো তাদেরও আমোদ (না কি প্রমোদ) জোগাবার জন্যে তো আছেনই জাক পাঞ্চওয়ল, আরামকেদারার ভূগোলতাত্ত্বিক, পুঁথির পাতায় যা-যা পড়েছেন, তাতেই যেন অস্ট্রেলিয়া তার একেবারে নখদর্পণে এসে গিয়েছে। এই মহাদেশ সম্বন্ধে যা-সব তাজ্জব কাহিনী তিনি শোনালেন, তার কতটাই যে সত্যি আর কতটাই যে মনগড়া, তা-ই বা বিচার করবে কে?

সে-রাতে যখন ক্রাউন ইন নামে একটা সরাইখানায় বড়োদিনের ভোজের আসর জমেছিলো, সেদিনই গোটা ভোজসভাটাই মাত করে দিয়েছিলেন পাঞ্চওয়ল, এই মহাদেশ সম্বন্ধে বিচিত্র-সব তথ্যশুনিয়ে। এখানকার নাকি সবকিছুই অদ্ভুত-একবার তো তিনি

স্বীকারই করে ফেললেন যে এখানকার জল-মাটি-আকাশ এতই বিস্ময়কর যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা নাকি এখনও এই মহাদেশের ভূসংস্থানের রহস্যটাই ভেদ করতে পারেননি। যেন একটা চ্যাপটা বাটির মতো এই মহাদেশটা, কিনারটা উঁচু, মাঝখানটা নিচু হয়ে এসেছে। মাটি খুঁড়লে এখনও নাকি পাওয়া যায় সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল, জীবাশ্ম-হয়তো বহুকাল আগে কোনো প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই সাগরতল থেকে উঠে এসেছিলো এই দেশ, আর মাটির তলায় এখনও এমন-সব অদ্ভুত চিহ্ন রয়ে গেছে যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আস্ত এই মহাদেশটাই একদিন-সে-যে কতকাল আগে কেউ জানে না-ছিলো সমুদ্রের তলায়। এখন এর নদীগুলো অদি শুকিয়ে যাচ্ছে, কত জায়গায় যে মরা নদীর সোঁতা দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। ক্রমশই বিকট হা করে এগুচ্ছে এর মরুভূমিগুলো, আর জলমাটিআকাশবাতাস থেকে শুষে নিচ্ছে সব আদ্রতা। অথচ এখানে এমন-অনেক গাছ আছে যারা প্রতিবছর তাদের পাতা ঝরায়ে না, শুধু গাছের বাকলগুলো খসে পড়ে-যেন সাপের মতো তারা খোলশ পালটাচ্ছে। অন্যসব দেশে পাতাগুলো সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, এখানে যেন রোদ্দুর এড়াবার জন্যে তারা একটু পাশ ফিরে থাকে-ফলে যেখানে গাছপালা আছে সেখানেও তারা ছায়া দেয় না। এখানকার ঝোঁপঝাড়গুলো বেঁটে-বেঁটে, শুধু ঘাসগুলো মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, এমনই রান্সুসে তাদের বাড়।

আর তারপর যখন জীবজন্তুর কথা পাড়লেন জাক পাঞ্চয়ল, তখন বড়োদিনের ভোজসভা হয়ে উঠলো যেন জীববিদ্যারই ক্লাস। তার ধারণা, অস্ট্রেলিয়ায় যেন চিরকাল ধরে একটা গো অ্যাজ ইউ লাইক অর্থাৎ ভোল পালটে সকলের সামনে অন্য বেশে আবির্ভূত হবার একটা প্রতিযোগিতা চলেছে।

রবার্ট মাঝখানে ফোড়ন কেটেছিলো : তার মানে এখানকার জীবজন্তুরা কি সবসময়েই অন্য জীবজন্তুর চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? তাহলে তো তারা অন্য জীবজন্তুই-যতক্ষণ-না আমরা তাদের সত্যিকার চেহারা কী, সেটা জানতে পারছি-

না, তা বলছি না, তবে আমরা যে-সব জীবজন্তু দেখে অভ্যস্ত, সে-রকম জীবজন্তুর চাইতে অন্যরকম জীবজন্তুরাই বেশি এখানে।

তাহলে তাদের অন্য নাম দিন পণ্ডিতরা-কেন তারা বলবেন যে অমুক জীব তমুক জীবের ভোলটা নিয়ে গিয়ে অন্যভাবে সেজেছে।

এবার মেজর ম্যাকন্যাব্স একটা সুচিন্তিত টিপ্পনী কাটলেন। লোকে যেখানেই যায়, সঙ্গে করে নিয়ে যায় নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি। অর্থাৎ অচেনা জায়গায় তারা সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যায় নিজেদের অ্যাডিনকার চেনা চৌহদ্দিটাই। তুমি যেখানেই যাও, নিজেকে এড়িয়ে তুমি যাবে কোথায়?

জাক পাঞ্চওয়ল এবার তাতে সায় দিয়েছেন। হ্যাঁ, এ-কথাটা ঠিক। কোনো চতুষ্পদ জন্তু যদি মুখটা শান দেয়া ছুরির ফলার মতো ছুঁচলো করে পাখির মতো চঞ্চু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়-

তাহলে সারস আর শেয়ালের নেমন্তন্ন খাবার যে-গল্প ঈশপ এককালে কেঁদেছিলেন, সে-গল্প এখানে মোটেই খাপ খাবে না।

বিখ্যাত পর্যটকরা কত সময়েই কত-কিছু যে নিজের চোখে দেখেছেন বলে দাবি করেছেন, তার আর-কোনো ইয়ত্তা নেই। কেউ দাবি করেছেন তিনি দেখেছেন এমন বিরাট সরীসৃপ যে নাকি অনবরত মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বার করে দিচ্ছে। একজন হলফ করে বলেছেন তিনি নাকি এমন শুওর দেখেছেন যাদের নাভিকুণ্ডলী ছিলো তাদের পিঠে-পেটে নয়। একজন তো এমনও বলেছেন তিনি এমন-সব বেঁটেখাটো জীব দেখেছেন যাদের মুণ্ডু আর কানগুলো খচ্চরের মতো, শরীরটা উটের, পাগুলো হরিণের, আর তারা নাকি ঘোড়ার মতোই চিহি-চিহি ডাকে। কেউ যদি দিব্বি গেলে বলেন তিনি দেখেছেন গ্রিফিন, কিংবা ফিনিক্স পাখি, যদি বলেন জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ড থেকেই তিনি একটা পাখিকে উঠে আসতে দেখেছেন, যে তার ডানা ছড়িয়ে আকাশে উড়ে চলে গেলো, তবে হয় আমরা তার কথা বিশ্বাস করবো, আর নয়তো বলবো গাঁজাখুরি, উদ্ভট, কিন্তুত লর্ড এডওয়ার্ড হয়তো আরো-সব তাজ্জব নমুনা হাজির করতেন নামজাদা-সব পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে, কিন্তু জাক পাঞ্চয়ল তাঁকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই থামিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো আসরের মধ্যে তিনি হাজির থাকতে আর-কেউ যে মধ্যমণির মুখ্য ভূমিকাটা কুক্ষিগত করবে, এটা যেন আদপেই তাঁর মনঃপূত নয়।

প্রকৃতি অন্তত কখনও উদ্ভট-কিছু বানিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করে না। সে জীবজন্তু তৈরি করে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়েই। ফলে সে যদি এমন জীব তৈরি করে যে তার ছানাগুলোর বাসা নিজের শরীরের সঙ্গেই বয়ে নিয়ে যাবে, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে যে মায়ের দেহের সঙ্গে এঁটে না-থাকলে পরিবেশ ঐ ছানাগুলোকে বাঁচতেই দেবে না। ক্যাণ্ডারু যদি তার ছানা রু-দের পেটের মধ্যে থলে বানিয়ে তাতে পুরে রাখে, আর ছানাগুলো যদি ঐ পেটের থলে থেকে মাঝে-মাঝে চোখ ছানাবড়া করে চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে, তবে প্রথম দেখে অপ্রস্তুত-কেউ ব্যাপারটা না-জেনেই ভেবে

বসতে পারে যে সে এমন কোনো জীব দেখেছে যার দু-জোড়া চোখ আছে-একজোড়া কপালে, একজোড়া পেটে। কিংবা কেউ যদি দ্যাখে মরালের মতো কোনো পাখি জলে ভেসে বেড়াচ্ছে অথচ যে-কিনা কুচকুচে কালো তবে সে হয়তো ভাববে কবিরা এতকাল যে কালো মরালের কথা বলে এসেছিলো, সে বুঝি তা-ই দেখেছে। স্থানীয় লোকে যে তার অন্য কোনো নাম দিতে পারে এটা তার মাথাতেই আসবে না।

সুতরাং? রবার্ট মোক্ষম প্রশ্নটা করে বসেছে তখন।

সুতরাং, এটা ধরে নিতেই হবে যে, গোড়ায় লোকে চেনা জীবজন্তুর সঙ্গেই তার আদল খুঁজে বার করে চেনা নামেই ডেকেছে তাদের, বলেছে এটা রাজহাঁস বটে, তবে ধবধবে-শাদা নয়, বরং কালো মরালই এটা। অন্তত এটা তো মানতেই হবে যে অস্ট্রেলিয়া অন্যরকম-তার জীবজন্তুও অন্যরকম হবে। এই-তো আজ বড়োদিন, কিন্তু কোথায় সেই হোয়াইট ক্রিসমাস-ঠাণ্ডা কোথায়, বরফ কোথায়, সান্তারুসের শ্লেজগাড়ি কোথায়। আমরা তো এখন লু-বওয়া তপ্ত হাওয়ায় ধুকছি। এমন সৃষ্টিছাড়া বড়োদিন কেউ কি ক্যারল গাইবে এখন যে হোয়াইট নাইট সাইলেন্ট নাইট যখন রাতচরা পাখিগুলো কেউ ঠকঠক, কেউ সাঁই-সাঁই, কেউ কর্কশ ধাতব স্বরে ডেকে উঠছে-রাত মোটেই চুপচাপও নয়, শাদাও নয়।

এমন অকাট্য প্রমাণের পর অবশ্য সবাই একবাক্যে তখন স্বীকার করে নিয়েছেন যে অস্ট্রেলিয়ার সবকিছুই সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া, উদ্ভট।

ক্রাউন ইন-এ বড়োদিন কাটাবার পর থেকে সমানে এগিয়ে চলেছে বহর-কখনও বিশাল তরুলতাউদ্ভিদবিহীন প্রান্তর, কখনও-বা সেই বেঁটে ঝোঁপঝাড়, অথবা উঁচু-উঁচু ঘাসবন। আর এ-রকমই একটা ঘাসবনের কাছে এসে একদিন দেখা গেছে মস্ত আরেকটা বহর চলেছে ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে-ঘাস খেতে-খেতে। মানুষের সঙ্গে কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে অজস্র গোরুমোষ, কয়েক হাজার ভেড়া, এমনকী সওয়ারবিহীন বেশকিছু ঘোড়াসমেত। এই বিরাট শোভযাত্রা পাশ দিয়ে চলে যেতে অনেকক্ষণ লাগিয়ে দিয়েছে। আয়ারটন জানিয়েছেন এদের নাকি শস্তায় কেনা হয়েছে নীলগিরিতে-অর্থাৎ বুমাউন্টেনে-হাড়জিরজিরে রোগাপটকা সব জীব, উপযুক্ত খাদ্য নাকি সেদিকটায় নেই, এবারকার খরায় সেদিকে সব জ্বলে-পুড়ে গিয়েছে। এখন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে এদের খাইয়ে-দাইয়ে নধর করা হচ্ছে, তারপর মাঠে চরিয়ে তাকৎ ফিরিয়ে এনে বিক্রি করবে চড়া দামে-যাদের খেতখামার আছে তারা এ-সব বেশিদাম দিয়েই কিনে নেবে।

তারপর সামনে পড়লো-এই-প্রথম-এমন-একটা সোঁতা, যাতে সত্যি-সত্যি কুল কুল করে জল বয়ে যাচ্ছে-মরানদী নয়, জলজ্যন্ত নদী-একটা। তার নাম উইমেরা নদী।

অ্যাঙ্গিন পথে পড়েছে মরানদীর খাত, কিংবা সরু সুতোর মতো এইটুকু জলের ধারা। ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে পেরিয়ে যেতে কোনো মুশকিলই হয়নি, বলদে-টানা গাড়িটা অনায়াসেই পেরিয়ে গেছে সেইসব স্রোতোধারা। এবার কিন্তু বলদে-টানা গাড়িটা নদী পার করতে গিয়ে বিস্তর বেগ পেতে হলো, শুধু আয়ারটনের বুদ্ধিমত্তা আর প্রত্নতত্ত্বপন্থমতিত্বই কোনো অপঘাত দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলো বহর। জায়গাটা নাকি সে যখন টহল দিয়ে বেড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়, এ-মোড় থেকে ও-মোড়, তখনই চিনে নিয়েছে।

ফলে সে জানে উইমেরা নদীর কোনখানে জলের ঢল বেশি, কোথায় সেখানে শুধু হাঁটুজল থাকে।

মেজর ম্যাকন্যাব্স অবিশ্যি মাথা নেড়েছেন দু-একবার। আয়ারটন যদি ব্রিটানিয়া জাহাজ থেকে ছিটকে পড়ে থাকে জলে, আর তারপর কাজের ধাক্কায় জীবিকার খোঁজে পুরো অঞ্চলটা চষে ফেলেও থাকে একবার, তবু এখানকার সবকিছু সে তার নিজের হাতের চেটোর মতো এমনই ভালোভাবে চেনে যে মনেই হয় না মাত্র একবারই সে এ-সব অঞ্চলে এসেছিলো।

নদী পেরুবার পর অন্যপারে এসেই আয়ারটন একটু ছুটি চাইলে। এই নদী পেরুতে গিয়ে বলদগুলো বেকায়দায় টান দিয়েছিলো বলে গাড়িটা কয়েক জায়গায় জখম হয়েছে, নড়বোড় করছে, আরেকটু ধকল গেলেই জোড়গুলো হয়তো খুলে আসবে। তাছাড়া কারু-কারু ঘোড়ার নালও খুলে গিয়েছে, সেগুলো লাগাতে হবে। এখান থেকে মাইল-বিশেক দূরে ব্ল্যাকপয়েন্ট নামে একটা রেলস্টেশন আছে, আয়ারটন জানিয়েছে, সেখানে ছোটোখাটো একটা লোকালয় গড়ে উঠেছে। আর সেখানে মিস্ত্রি আছে, ছুতোর, কামার, তাতি থেকে হাতুড়ে ডাক্তার অন্দি। গাড়িটা মেরামত করতে হবে, ঘোড়ার নালও লাগাতে হবে-আমি শুধু যাবো, আর মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে আসবো। সব ঠিকঠাক হলে মাত্র চোদ্দ-পনেরো ঘন্টা লাগবে আমার।

ঠিক আছে, আয়ারটন। লর্ড এডওয়ার্ড বলেছেন, তুমি ফিরে না-আসা অন্দি আমরা সবাই তাবু খাঁটিয়েই বসে থাকবো। তাছাড়া একদিনের রাস্তার ধকলে সবাই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এই উপলক্ষে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে ফের বেশ টাটকা হয়ে নেয়া যাবে।

তাছাড়া সন্ধেও হয়ে এসেছে-এমনিতেই আমাদের এখন না-হোক একটু পরেই তারু খাটাতে হতো ।

আয়ারটন যখন বলছিলো যে তাকে ব্ল্যাকপয়েন্ট স্টেশনে গিয়ে মিস্ত্রি ডেকে আনতে হবে, তখন মেজর ম্যাকন্যাস পাশে দাঁড়িয়েই সব কথাবার্তা শুনছিলেন । এভাবে তার একা-একা, সঙ্গীসাথী বিনাই, তবু ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাবটা ম্যাকন্যাসের মোটেই মনে ধরেনি । কী-একটা বলতে গিয়েও কথাগুলো তিনি যেন গিলে ফেললেন । মিথ্যেমিথ্যে তার সন্দেহের কথাটা উঠিয়ে লাভ কী? তাছাড়া, সত্যি-তো, এ-সন্দেহের পেছনে সত্যিকার-কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ তো তার নেই, শুধু-একটা অনুভূতি, মনের ভেতরে কোথায় যেন অস্পষ্ট-একটা কোণে খচখচ করে কী-একটা কাটা বিঁধছে-আর এ-ধরনের অনুভূতিকে পাত্তা দেয়াটা তার ধাতে নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ নিছক অনুভূতির ওপর নির্ভর করে কোনো রণকৌশল তৈরি করে না, সবসময়েই সেখানে চাই হাতেনাতে কোনো প্রমাণ ।

উদ্বেগটা মেজর ম্যাকন্যাসের যে একারই ছিলো তা নয়, স্বয়ং লর্ড এডওয়ার্ডও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন । কিন্তু তার অস্বস্তির প্রকৃতিটা ছিলো সম্পূর্ণই অন্যরকম । আয়ারটন যদি কোনো মিস্ত্রি না-পায়, তাহলে ভাঙা গাড়ি সারিয়ে নিতে বেশ কিছুদিন সময় নষ্ট হবে । অথচ তিনি চাচ্ছিলেন পারলে এম্ফুনি তার অভিযানটায় বেরিয়ে পড়তে ।

দিন ফুটতে-না-ফুটতেই কিন্তু অস্বস্তিটা কেটে গেলো। মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এলো আয়ারটন, ধূলিধূসর ও ক্লান্ত-সারারাত সে একটুও বিশ্রাম করেনি, সোজা গেছে সে ব্ল্যাকপয়েন্টে, তারপর খোঁজখবর করেই মিস্ত্রিকে নিয়ে ফের ফিরতি রাস্তা ধরেছে ও।

তবে যে-মিস্ত্রিকে সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তাকে দেখতে ঠিক যেন কোনো ডাকাতের মতো। প্রকাণ্ড, দড়িপাকানো চেহারা, সারা শরীরে মেদ বলতে কিছু নেই-শুধু পেশী যেন নেচে বেড়াচ্ছে। লোকটা কথা কম বলে, পারলে হয়তো মুখে কুলুপ এঁটেই থাকতো সারাক্ষণ, কিন্তু কাজ জানে।

কোনো লোককে প্রথম দেখবামাত্র কেন ডাকাত-ডাকাত বলে মনে হয়, এটারও কোনো সদুত্তর জানা নেই লর্ড এডওয়ার্ডের। সম্ভবত সেদিন যখন জাক পাঞ্চয়ল অস্ট্রেলিয়ায় কারা-কারা ভাগ্যের সন্ধানে এসেছে, এ-সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছিলেন, তখনই মনের মধ্যে অবিশ্বাসের একটা বীজ বুনে দেয়া হয়েছে। ইওরোপ থেকে এত-দূরে যারা এসেছে তারা হয় কয়েদি-নয়তো আইনের হাত থেকে পালাবে বলেই এখানে এসেছে, ডাকাবুকো সব লোক, সম্ভবত স্বয়ং লুসিফারকেও ভয় পায় না।

লোকটা যে সত্যি-সত্যি মিস্ত্রি একজন, তা তার কাজ করবার ধরন দেখেই বোঝা গেছে। আড়াই ঘন্টাও লাগেনি, সে পাকাহাতে ওস্তাদের মতো গাড়ি মেরামত করে দিয়েছে।

মেজর ম্যাকন্যবস কিন্তু সবসময়েই সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন, সজাগ চোখে সব খেয়াল করে যাচ্ছিলেন। আর এতটা সজাগভাবে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন বলেই একসময়ে তার চোখে পড়েছে লোকটার কজ্জিটা-সেখানে কোনো-একটা আঁটো বালার মতো একটা কালচে দাগ

ফুটে আছে। কীসের দাগ এটা? লোকটা যখন ঘোড়ার নাল পরাচ্ছে, তখন হঠাৎ নজরে এলো, নালগুলোর তলা থেকে তেকোণা খানিকটা অংশ যেন কেটে নেয়া হয়েছে। অবাক হয়ে গিয়েছে মেজর ম্যাকন্যাব্স তার কারণটা জানতে চাইলেন-আয়ারটন বললে, এখানকার সব ঘোড়ার মালিকরাই তাদের ঘোড়ার নালে বিশেষ-বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে-যাতে ঘোড়া হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে, সেই বিশেষ নালের ছাপ দেখে তাকে খুঁজে বার করা যায়-বা অনেক ঘোড়ার মধ্য থেকে তাকে শনাক্ত করা যায়। এটা ব্ল্যাকপয়েন্টের চিহ্ন।

ঘোড়াগুলোর নাল পরাতে আধঘন্টার বেশি লাগলো না তার। কাজ শেষ হবামাত্র মজুরি আর দরাজ বখশিশ নিয়ে লোকটা সেলাম ঠুকে চলে গেলো।

সে চলে যেতেই, তোড়জোড় করে ফের শুরু হলো অভিযানকাণ্ডে গ্রান্টের সন্ধানে। কিছুক্ষণ যাবার পরই দূর থেকে ভেসে এলো রেলের এনজিনের বাঁশি-তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত ধাতব কু-উ-উ আওয়াজ। তারপরেই দেখা গেলো রাস্তাটা যেখানে গিয়ে রেলপথের গায়ে পড়েছে, সেখানে ভুশ-ভুশ করে কালোধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে আর তীক্ষ্ণ সুরে বাঁশি বাজাতে-বাজাতে একটা এনজিন কোথেকে যেন এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘোড়াটায় ছপটি মেরে লর্ড এডওয়ার্ড কাছে এগিয়ে গেলেন-হঠাৎ এভাবে মাঝপথেই ট্রেনের এনজিন থেমে পড়লো কেন?

কিন্তু কাছে গিয়েই আঁৎকে উঠলেন লর্ড গ্লেনারভন। ভাঙা সেতুর তলায়, নদীর পাড়ে আর জলের মধ্যে কতগুলো বগি ভাঙাচোরা পড়ে আছে। শুধু মাল রাখবার জন্যে যে-

লাগেজভ্যানটা ছিলো, সেটা সম্ভবত পেছনে ছিলো বলেই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।

এরই মধ্যে দলে-দলে লোক ছুটে আসছে অকুস্থলে, দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখতে। এই-যে এনজিনটা বাঁশি বাজাতে-বাজাতে এখানে এসে থেমেছে, তাতে করে স্বয়ং সার্ভেয়ার জেনারেল এসেছেন ব্যাপারটা সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে। লর্ড গ্লেনারভন নিজেই এগিয়ে গেলেন তার সঙ্গে আলাপ করতে। পরস্পরের পরিচয় আদানপ্রদানের কাজটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ একটা বিষম কোলাহল উঠলো। তারপরেই লোকজন ধরাধরি করে নিয়ে এলো গার্ডের মৃতদেহ-লাশটার বুকে বিঁধে রয়েছে একটা ছোরা, প্রায় বাঁটশুদুই যেন ঢোকানো।

ঠিক এই ভয়টাই করছিলুম, সার্ভেয়ার জেনারেল জানানেন। পুলিশ জানিয়েছে যে ব্রিজটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভাঙেনি, কারা যেন বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ ট্রেনটা যাতে এখানে এসে অতর্কিতে উলটে পড়ে, তারই ব্যবস্থা করে রেখেছে কেউ বা কারা। ট্রেনদস্যুরা ইচ্ছে করেই মলব ঐটেছিলো সামনের কামরাগুলো যাতে নদীতে পড়ে যায় তারপর তারা পরমানন্দে পেছনের লাগেজভ্যানের মালপত্র লুঠ করতে পারে।

এ-রকম হয় নাকি এখানে?

হবে না-ই বা কেন? গোটা অস্ট্রেলিয়াই তো সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধীদের আস্তানা। তাছাড়া অনেক কয়েদিকেও তো সাজার মেয়াদ শেষ হবার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তারা এখানে যা-খুশি করে বেড়ায়। এখন দেখবেন, লর্ড এডওয়ার্ড, এই ডাকাতির জের কতদূর গড়ায়।

দুর্ঘটনাটা ঘটলোই বা কখন?

কাল নিশুতরাতে। সোয়া-তিনটে নাগাদ।

লর্ড গ্লেনারভন বেশ-চিন্তিতভাবেই ফিরে এলেন তাঁর বহরের কাছে। এই ব্যাপারটা তাকে শুধু-যে ভাবাচ্ছে তা-ই নয়, তাকে কী-রকম যেন সশঙ্ক করে তুলেছে। এই ডাকাতদের প্রাণে মায়াদয়া বলে কিছু নেই। কিছু মালপত্র লুঠ করতে পারবে বলে যারা একটা যাত্রীবাহী ট্রেন ও-রকমভাবে উলটে দিতে পারে, অনেক নিরীহ নির্বিরোধী লোককে বিনাবাক্যব্যয়ে খতম করে দিতে পারে, তাদের নজর একবার যদি এই বহরের ওপর পড়ে, তাহলেই সর্বনাশ! আয়ারটন বোধহয় ঠিক কথাই বলেছিলো। আবোকয়েকজন সশস্ত্র নাবিক সঙ্গে নিয়ে এলে ডাকাতদের আচম্বিত হামলা ঠেকাতে সুবিধে হতো। এখন অবিশ্যি দিনরাত কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সেদিন বহর যখন একটা কবরখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছে না, কোনো গির্জা নেই আশপাশে, কবরখানা বলতে একজায়গায় কতগুলো ক্রুশকাঠ বসানো, এইটুকুই শুধু-তখন দেখা গেলো সেখানে ঐ ক্রুশকাঠগুলোর মধ্যেই পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে একটা বাচ্চা

ছেলে। কত আর বয়েস হবে? আট কি নয়, গায়ের রং কালো। নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিন্দাদেরই কেউ। ছেলেটার মুখচোখে ঝকঝকে বুদ্ধির ছাপ। তার গলায় ঝুলছে একটা টিকিট-তাতে লেখা : অমুক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তমুকের হাতে তুলে দেবার জন্যে এই টোলিন নামের ছেলেটিকে অমুক কুলির সঙ্গে ট্রেনে করে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ছেলেটি একাই শুয়ে আছে এখানে-আশপাশে আর-কেউ নেই। তার মানে ঐ ট্রেনদুর্ঘটনায় কুলিটি নিশ্চয়ই মারা গেছে, আর এই ছেলেটি কেমন করে যেন প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। অকুস্থল। থেকে সে পালিয়ে এসেছিলো চটপট-তারপর ক্লান্ত হয়ে এখানে পড়ে টানা একটা ঘুম লাগাচ্ছে।

ছেলেটিকে দেখেই তার বলদে-টানা গাড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন লেডি হেলেনা। তাকে এইরকম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে, আর পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে নিয়ে, লেডি হেলেনার কেমন যেন মায়া পড়ে গেলো ছেলেটির প্রতি। তিনি যখন ঝুঁকে পড়ে ছেলেটির গলায় বাঁধা টিকিটটা পড়ছেন, অমনি ছেলেটির ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ রগড়াতেরগড়াতে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। যখন সে তার ডাগর চোখদুটি মেলে আশপাশে তাকালে, তখন তার দৃষ্টিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে ভয়, বিস্ময় আর কৌতূহলের ছাপ।

লেডি হেলেনা তাকে জিগেস করতেই সে নিজের পরিচয় দিলে-স্পষ্ট, পরিষ্কার ইংরেজি উচ্চারণ তার। মিশনারি স্কুলে থেকে সে ইংরেজ মিশনারিদের কাছে পড়াশুনো করে। পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়ে ফল বেরিয়েছে, এখন বেশকিছুদিন ছুটি-বড়োদিন আর নববর্ষের। ছুটি কাটাতেই সে বাড়ি যাচ্ছিলো মা-বাবার কাছে। পরীক্ষায় ভালোভাবেই

উৎরেছে সে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো করেছে সে জিওগ্রাফিতে, ভূগোলে সে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

এতক্ষণ লেডি হেলেনাই কথা বলছিলেন বলে জাক পাঞ্চয়ল মাঝে পড়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। কিন্তু যেই শুনলেন ছেলেটি ভূগোলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে, অমনি তার মাথায় কুট করে যেন একটা পোকা কামড়ালো। কেমনতর ভূগোলের জ্ঞান ছেলেটির? তিনি নিজে কি তার পরীক্ষা নিয়ে যাচাই করে দেখবেন একবার? কিন্তু দু-একটা প্রশ্ন করেই যা উত্তর শুনলেন তাতে তার চোখ কপালে উঠলো। তাজ্জব সব জিনিশ শিখিয়েছে তাকে ইংরেজ মিশনারিরা। উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে এমনতর উদ্ভট-সব তথ্যে ভরা তা তার জানা ছিলো না। না, শুধু তারই নয়, অন্যরা ছেলেটির কথা না-শুনলে কিছুতেই তা আন্দাজ করতে পারতেন না।

ইংরেজ মিশনারিরা ছেলেটিকে শিখিয়েছে, এই ধরাধামের একচ্ছত্র অধীশ্বর ইংরেজরাই-স্বর্গটা প্রভু জিশুর, পৃথিবীটা ইংরেজদের। তার প্রমাণই হলো যে ইংরেজ রাজত্বে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। এ-দেশে যখন রাত, অন্যদেশে তখন দিন। এমনকী গোটা ইওরোপটাও ইংরেজদের পদানত-ফ্রান্স শুধু।

এই ফ্রান্স শুধু কথাটা শুনেই ফ্রান্সের ভূগোলপণ্ডিত জাক পাঞ্চয়লের চোখ আরো-ছানাবড়া হয়ে গেছে! কী-একটা বলতে গিয়ে চেপে গেলেন-তারপরেই হা-হা করে অটহাসি হেসে উঠলেন।

তারপর হাসি থামিয়ে যা বললেন তার সারাংশ হলো এই : ইংরেজরা ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যেকথা বলে, এটা কেই বা না-জানে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেদেরও ধরে-ধীরে এমন আজগুবি আর উদ্ভট কথাবার্তা শেখালে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তো

অন্ধকার। অতএব-তিনি মনস্তির করে ফেলেছেন-অতএব এই ছেলেটির ভূগোলের জ্ঞান শুধরে দেবার দায়টা তিনি স্বয়ং এই-মুহূর্ত থেকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিলেন। ভারতবর্ষ বলতে যে গোটা এশিয়া বোঝায় না, আর কলকাতা যে সমগ্র এশিয়ার রাজধানী নয়-এ-সব তথ্য যদি এক্ষুনি শুধরে না-দেন, তাহলে তো ছেলেটির যাবতীয় লেখাপড়া শেখাই মাটি হবে।

এবং যেমন কথা, তেমনি কাজ। তক্ষুনি। লর্ড গ্লেনারভনের যে-ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ছিলো ঐ বলদে-টানা গাড়িটায়, সেখান থেকে তক্ষুনি পাঞয়ল রিচার্ডসনের লেখা ভূগোলবইটা নিয়ে এনে দিলেন ছেলেটিকে, বললেন মন দিয়ে যেন এ-বইটা সে দেখে নেয়, পরে তিনি তার পরীক্ষা নেবেন।

কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায়-হায়রে কপাল!-কোথায় গেলো জাক পাঞ্চয়লের নতুন রংরুট-করা ছাত্র। গোটা তাঁবুতে শুধু নয়, আশপাশে কোথাও সে নেই। রিচার্ডসনের ভূগোলবইটা রয়েছে পাঞ্চয়লের কোটের পকেটে, আর লেডি হেলেনার বুকের ওপর রয়েছে একগুচ্ছ ফুল-এই শুখা মরশুমে অস্ট্রেলিয়ায় এমন টাটকা ফুল দুর্লভ বৈকি! টোলিন কেন চলে গিয়েছে, কে জানে! সে পথ চিনে-চিনে যেতে পারবে তো তার মা-বাবার কাছে? কিংবা যদি বুদ্ধি করে চার্চের স্কুলেও ফিরে যায় তাহলেও বাঁচোয়া-নইলে এমন লোকালয়হীন খাঁ-খাঁ প্রান্তরে সে যাবে কোথায়?

রাস্তা এখান থেকে শুধু রক্ষ বা উষরই নয়, উবড়োখবড়ো, বন্ধুর। বহরের গতি স্বভাবতই টিমে হয়ে এলো, বিশেষ করে এই অসমতল পথ দিয়ে বলদে-টানা গাড়ির যেতে অসুবিধে হচ্ছিলো খুবই-এমনভাবে গাড়ির ভেতরটা দুলছে একাৎ-ওকাৎ হচ্ছে যেন ঝড়ের সমুদ্রে পড়েছে কোনো নৌকো। এত ঝাঁকুনি লাগে যে হাড়গোড় বোধহয় চুর-চুর হয়ে যাচ্ছে। আর এই ভাবেই যেতে-যেতে অবশেষে দূর থেকে দেখা গেলো একটা পাহাড়। আয়ারটন জানালে এই পাহাড়ের নাম নাকি আলেকজান্ডার-এখানে নাকি প্রসপেক্টররা মাটি খুঁড়ে সোনা পেয়েছে।

সেদিন বছরের শেষদিন, ৩১ ডিসেম্বর, অসহ্য গরম, যেন লু বইছে, আর তারই মধ্যে বহর এসে পৌঁছুলো মাউন্ট আলেকজান্ডারে। সোনা এমন একটা ধাতু যার নাম শুনলেই কেমন যেন চোখ চকচক করে ওঠে সকলের, আর সেটা নিশ্চয়ই নিছক সৌন্দর্যতৃষায় নয়-কেমনা প্রায় সবধাতুরই নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, কিন্তু সোনার মতো আর-কিছু এমন করে মানুষকে আকৃষ্ট করেনি। মাউন্ট আলেকজান্ডারের কথা শোনবামাত্র সকলেরই ইচ্ছে হলো একবার গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসেন সোনার খনি। এমনিতে, অনেক সময়েই বড়ো-বড়ো সোনার ডেলার বদলে সুতোর মতো সোনার একটা রেখা চলে যায় পাথরের মধ্যে, অথবা মিশে থাকে মাটির ঢেলায়। কখনও-বা মিশে থাকে বালিতেও। তাকে ঝাঁঝির মধ্য দিয়ে সাফ করে নিতে হয়; পাথর ভেঙে বার করে নিতে হয় সোনার সুতো; মাটির ঢেলা থেকে সোনা আলাদা করে নেবার জন্যে অনেক সময় এমনকী জল ও মাটিকে গুলে নেয়া হয়, তারপর সেই জল পরিসূত করে নেয়া হয়, ঘোলাজল নিয়ে যায় মাটি, পড়ে থাকে সোনার গুঁড়ো। কীভাবে সোনা খুঁড়ে তোলা হয় সেটা যেমন দেখে এলেন সবাই, তেমনি দেখে এলেন সোনা তোলবার পর দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য যে-বাড়িটার

কোষাগারে সে-সব জমা দেয়া হয়। সেখান থেকে প্রত্যেক প্রসপেক্টরকেই রসিদ দেয়া হয়, কে-কত আউন্স সোনা তুলেছে, তারপর সেগুলো চালান দেবার ব্যবস্থাও করা হয়, কড়া পাহারা থাকে সবসময়, বন্দুকের ঘোড়ায় থাকে তাদের হাত, আর সে-হাত প্রায়-সবসময়েই চুলবুল করে ওঠে, একটু-কিছু সন্দেহজনক দেখলেই গুলিগোলা চলে হরদম। বিশেষত ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যাবার পর থেকে কড়াকড়ি বেড়েছে প্রচুর। এখনকার ডাকাতরা যেমন প্রাণের ভয় করে না, এখানকার সেপাইশাস্ত্রীরাও প্রায় সে-রকম। যারা সেপাই হয়েছে, তারাও যেমন অবস্থাবিপাকে ডাকাত হয়ে যেতে পারতো, ডাকাতরাও অনেকে। ঠিকমতো সুযোগ পেলে সেপাইশাস্ত্রী হয়ে উঠতে পারতো। সেপাই বা ডাকাত-দুয়েরই স্বভাবপ্রকৃতি বা মনের ধাতের মধ্যে তফাৎ যা আছে, তা সামান্যই। এখানে তো উর্দি দেখেও বোঝবার জো নেই কে যে কী। তার ওপর এই মাউন্ট আলেকজান্ডারে আবার সোনা খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নানারকম দামিপাথর, সেগুলো আবার থরেথরে সাজানো আছে কোষাগারের সংগ্রশালায়। কতরকম রঙবেরঙের পাথর, পাথর না-বলে তাদের হয়তো রত্ন বলাই উচিত। এতসব ঘুরে ঘুরে দেখতে-দেখতে পণ্ডিতপ্রবর জাক পাঞ্চয়লের চোখের মণিও কেমন জ্বলজ্বল করে উঠেছিলো। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো যদি একটা সোনার ঢেলা সঙ্গে করে নেয়া যেতো।

তার হাবভাব দেখে মেজর ম্যাকন্যাব্স একবার শুধু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেছিলেন : খামকা আর ছোট্ট-একটা সোনার ঢেলা নিয়ে গিয়ে কী করবেন, মঁসিয় পাঞ্চয়ল? তার চেয়ে-ঐ দেখুন দামিপাথর আছে এখানে-খুঁজলে হয়তো পরশপাথরই পেয়ে যাবেন একটা। জগতের দার্শনিকরা তো তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন চিরকাল-তা-ই না? আপনিও খুঁজে দেখুন না-পরশপাথর খুঁজে পেয়ে গেলে ফ্রাসে ফিরে যা-ই ছোঁবেন, তা-ই তো সোনা হয়ে যাবে। এখান থেকে অত ওজন বয়ে নিয়ে যেতে আর হবে না তাহলে।

তার এই অপরূপ তাত্ত্বিক ইয়ার্কিটি শোনবার পর সেখানে যে নিছক হাসির হররাই উঠলো তা নয়, মঁসিয় পাঞয়লের ভূতুড়ে আবেশটাও একনিমেষে কেটে গেলো।

নতুন বছরে প্রথম দিনটাও কাটলো সেই স্বর্ণ-উপত্যকা পেরিয়ে আবার অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে নেমে আসতে। তারপর জানুয়ারির দুই তারিখে বহর এসে পৌঁছুলো সারি-সারি ইউক্যালিপটাস গাছের দুরতিক্রম্য এক জঙ্গলে। এত-নিবিড়ভাবে গাছগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে ফাঁকফোকর দিয়ে গলে বলদে-টানা গাড়িটা নিয়ে-যাওয়াই দায়। তার ওপর আবার এই ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা গাছগুলোর রূপোলি ঢালে রোদ্দুর পড়ে ঝলসে ওঠে-চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর কেমন-একটা বিমধরা গন্ধ, সুগন্ধই বলা যায়, কিন্তু এতগুলো গাছ থেকে এই গন্ধ বেরুচ্ছে যে হাওয়া যেন তাতে কেমন ভারি হয়ে আছে। পাঞয়ল সুযোগ পাবামাত্রই জ্ঞান দেখিয়ে বলে উঠেছেন :এই ইউক্যালিপটাস নামটা এসেছে গ্রিক কালুণ্ডোস থেকে, সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে লাতিন ইউ। কালুণ্ডোস মানে ঢেকে ফেলা, কারণ এর ফলগুলো পাপড়ি মেলবার আগে টুপির মতো কিছু দিয়ে ঢাকা থাকে, যাতে রোদ্দ থেকে বাঁচে।

রবার্ট কৌতূহলী হয়ে জিগেস করলে, আর এই গন্ধ? সে কি ঐ মুদিত কুসুমকলি থেকেই আসে? পাঞয়লের সঙ্গে কথা বলবার সময় রবার্ট ফাজলেমি করে মাঝে মাঝে সাধুভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। না কি গাছের ঐ রূপোলি বাকল থেকে?

না, না, গাছটার গুঁড়ি বা কাণ্ড কাঠ হিশেবে ব্যবহার করা হয়-গন্ধ মূলত আসছে এর বাহারে, সতেজ আর সবুজ পাতাগুলি থেকে, ঐ পাতাগুলো নিংড়েই বার করে নেয়া হয় ইউক্যালিপটাসের তেল-আর সে-সব লোকে অ্যান্টিসেপটিক হিশেবে ব্যবহার করে?

কিন্তু এ-গাছ তো কই আমি আমাদের দেশে দেখিনি!

গাছটা প্রধানত হয় অস্ট্রেলেশিয়ায়-সেখানে রীতিমতো চাষ করা হয় এর। এই বনটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটাও কারু আবাদ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এর মজা হচ্ছে একবার লাগালেই হলো, কোনো তদারক আর করতে হয় না বিশেষ। মাটি থেকে রস শুষে নেয়। ঐ যাকে বলেছো মুদিত কুসুমকলি, শুখা সময়ের জন্যে তার ভেতরেই গাছ তার প্রাণরস জমিয়ে রাখে। কিন্তু কালুণ্ডোস মানে তো ঢেকে দেয়া-ছেয়ে দেয়া, যেন সবকিছু ছেয়ে আছে-সোজা সরলরেখায় উঠে যায় এই গাছ, কখনও-কখনও দুশো ফিট অর্ধি লম্বা হয়। ঐ ওপর থেকেই বোধহয় নজর রাখে সবকিছুর ওপর, ঢেকে রাখে তলার জমি।

বক্তৃতার একটা মনোমতো বিষয় পেলে জাক পাঞ্চয়ল আর-কিছু চান না-তুবড়ির মতো জ্ঞানগর্ভ বাক্য বেরিয়ে আসতে থাকে মুখ থেকে। ছুটলে কথা থামায় কে? অন্তত কোনো ফরাশির মুখ বন্ধ করবে কে-কথার জাহাজ একেকজনে-মেজর ম্যাকন্যাসের মতে, সেইজন্যেই তারা সবাই কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

পরের দিন সূর্য ডোববার সময় জঙ্গলের পাশেই দেখা গেলো ছোট্ট একটা লোকালয়-শহর ঠিক নয়, বরং ছোটো-একটা গ্রাম। নাম সীমূর। কিন্তু অজ পাড়াগাঁ হলে কী হবে,

এখানে একটা সরাইখানা আছে। সেই সরাইখানাতে আশ্রয় নেবার পর রবার্টকে সঙ্গে করে পাএয়ল গোটা গ্রামটায় একটা টহল দিয়ে এলেন। এবং সারাক্ষণই চললেন নানা বিষয়ে জ্ঞান বিলোতে-বিলোতে। রবার্ট সেদিক দিয়ে খুব-ভালো শ্রোতা-মাঝে-মাঝে ফোড়ন কাটে, উসকে দেয় আর পাএয়লের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হতে থাকে কথার ফুলঝুরি। আর তাই, নিজের বক্তৃতায় এতটাই মশগুল ছিলেন পাএয়ল, যে খেয়ালও করেননি গোটা গ্রামটায় এত উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য কেন।

ঐ দুর্ধর্ষ ট্রেনডাকাতির পর থেকেই গোটা ভিক্টোরিয়া রাজ্যই অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে। রাতে তারা বারেবারে এসে লক্ষ্য করে যায় দরজা-জানলা ঠিকঠাক বন্ধ করে রেখেছে কিনা। লর্ড গ্লেনারভনের বহরও এই ক-দিন অত্যন্ত সাবধান হয়ে পথ চলেছে, কড়ানজর রেখেছে চারপাশে, সারাক্ষণই থেকেছে সজাগ। সেইজন্যে এই সীমূরের লোকদের চাঞ্চল্যটা পাএয়লের একটু খেয়াল করে দেখা উচিত ছিলো। কিন্তু নিজের কথা শুনতে তাঁর এতই ভালো লাগে যে চারপাশে যে একটা চাপা ফিশফিশ গুজুর গুজুর উত্তেজনা চলেছে সেটা তিনি আদপেই লক্ষ্য করেননি।

কিন্তু সরাইখানার মালিকের সঙ্গে দু-চারমিনিট এটা-সেটা নিয়ে কথা বলেই উত্তেজনার মূল কারণটা জেনে ফেলেছিলেন মেজর ম্যাকন্যাব্স। জেনেও, তিনি রাটি কাড়েননি। চুপচাপ বসেছিলেন খাবারটেবিলে, ছুরি-কাটা-সূপের বাটিতেই মনোনিবেশ করে বসেছিলেন। পরে যখন লেডি হেলেনা ও মেরির সঙ্গে রবার্টও শুতে চলে গেলো, তখনই মেজর ম্যাকন্যাব্স কথাটা পাড়লেন ঠাণ্ডা চাপাগলায়।

অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড গেজেটে খবর বেরিয়েছে-ডাকাতদের নাকি খোঁজ পাওয়া গেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে, কেমন-একটু চঞ্চল স্বরেই বুঝি, আয়ারটন জিগেস করলে, ধরা পড়েছে?

গত কয়েকদিন ধরে ডাকাতদের ভয়ে যেভাবে রাতের ঘুম মাথায় উঠে গিয়েছিলো, তাতে এই খবরটা শুনে একটু চাঞ্চল্য তো হবেই। যাক, এবার তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

মেজর খুবই ছোট উত্তর দিলেন। কাটা-কাটা গলায় বললেন, না।

লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন : খোঁজ পাওয়া গেছে মানে? এরা কারা-সে-খবর কি জানা গেছে?

কথাটি না-বলে মেজর ম্যাকন্যাব্স লর্ড এডওয়ার্ডের দিকে খবরকাগজটা এগিয়ে দিলেন। চক্ষের নিমেষে খবরটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন গ্লেনারভন। যেন গোথ্রাসে গিললেন খবরটাকে।

আয়ারল্যান্ড থেকে দ্বীপান্তরে পাঠাবার সময় বেরোয়া উনত্রিশজন ডাকাত ছ-মাস আগে পুলিশপাহারার নজর এড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। এদের পাণ্ডটির নাম বেন জয়েস-যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি দুঃসাহসী; কিন্তু শুধু প্রচণ্ড দুঃসাহসই তার নেই, মাথায় প্রচণ্ড বুদ্ধি। এতই ধূর্ত যে পুলিশ এর আগে এই নরাধমের কোনো নাগালই পায়নি, তো পাকড়াবে কী করে? কী করে সে যে এখন অস্ট্রেলিয়ায় এসে হাজির হয়েছে, সেটাও একটা

দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। স্যান্ডহাস্ট রেলপথে ট্রেনটা উলটে দিয়ে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছে এরাই-
যাতে অনায়াসেই লুঠের কাজ চালাতে পারে।

পড়েই লর্ড এডওয়ার্ডের চোখ কপালে উঠে গেলো। তাহলে কি স্থলপথে যাবার
পরিকল্পনাটা খারিজ করতে হবে? তবে কি মেলবোর্নে গিয়েই উঠে পড়বেন ডানকানে?

তার প্রশ্নটা শুনে মেজর ম্যাকন্যাব্স সরাসরি আয়ারটনকেই জিগেস করে বসলেন :
আয়ারটন, তুমি কী বলো? আমাদের পক্ষে এখন কী করলে ঠিক হবে? মনে রেখো, এই
মক্কেলের নাম বেন জয়েস-পুলিশের কর্তারা অন্দি তাকে ডরান।

আয়ারটন কী যেন একটু ভেবে বললে, আমরা এখনও মেলবোর্ন থেকে দুশো মাইল দূরে
রয়েছি। এতটা পথ পেরিয়ে সেখানে পৌঁছুতে আমাদের অনেকটাই সময় লেগে যাবে।
এ-রাস্তার কোনখানে কোন বিপদ ওৎ পেতে লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে?

লর্ড এডওয়ার্ড জিগেস করলেন, তাহলে কী করবো?

দেখুন, আয়ারটন বিশদ করে বললে, বিপদের ভয় যদি করেন, তবে এটা মানতে হয় যে
বিপদ যে-কোনোদিক থেকেই আসতে পারে। আমরা মেলবোর্নের পথই ধরি, কিংবা
সোজা নাকবরাবর এগুই-কোথাও আমরা খুব-একটা নিরাপদ নই। বেন জয়েসের দল
কোথায় আছে, কেউ জানে না-সে যদি আমাদের ওপর হামলা করতে চায় তবে
যেদিকেই যা-ই না কেন, সেদিকেই সে এসে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।
আমরা আটজন লোক যদি সজাগ থাকি আর দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের ঠেকিয়ে রাখতে চাই,
তাহলে আমার মনে হয় আমরা আটজনেই উনত্রিশজন ডাকাতকে ঠেকিয়ে রাখতে

পারবো। আমাদের শুধু খেয়াল রাখতে হবে, বিপদের সময় আমরা যাতে ঘাবড়ে গিয়ে কোনো গণ্ডগোল না-করে বসি-যেন সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখি। আমরা যদি খুব-বিচলিত বোধ না-করি, তাহলে বলবো আমরা যদিকে চলেছি, সেদিকেই বরং ক্রমাগত এগিয়ে যাই।

হ্যাঁ, আমাদের ছকটা হঠাৎ দুম করে পালটে ফেলার কোনোই মানে হয় না, পাওয়ায় সাই দিয়ে বললেন, তাছাড়া কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ তো অ্যাডমিনেও পাওয়া যায়নি- সেটা পাওয়া যেতে পারে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই।

তবে, অয়ারটন বললে, সাবধানের মার নেই। আমরা যদি খোলাখুলি ডানকান জাহাজে খবর পাঠিয়ে দিই, তবে তারাও অহেতুক আমাদের নিয়ে ভাববে না।

জাহাজের কথাটা উঠতেই কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলসের মনে হলো, এবার আলোচনাটায় তারও অংশ নেয়া উচিত। খামকা ওদের খবর পাঠিয়ে লাভ কী হবে? এখনও নিশ্চয়ই মেরামতের কাজ শেষ হয়নি। আমরা যদি হঠাৎ দুম করে আমাদের বাদ দিয়েই ডানকানকেচলে যেতে বলি, তাহলে পরে আমাদেরই মুশকিলে পড়তে হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে হঠাৎ কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো খবর এলে আমাদের হয়তো জলপথেই বেরিয়ে পড়তে হতে পারে। জাহাজ যদি আগেই ছেড়ে যায় তবে হয়তো দরকারের সময় আমরা গিয়ে মেলবোর্নে জাহাজ ধরতে পারবো না। .

হ্যাঁ, আগেকার প্ল্যানমাফিক ডানকানের যেখানে থাকবার কথা, সে না-হয় সেখানেই থাকুক-তাদের অযথা খবর পাঠিয়ে বিব্রত করে কোনো লাভ নেই, এই মন্তব্যটা খোদ

লর্ড এডওয়ার্ডের। আর তা শুনে আয়ারটন আর সে নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলে না। বরং বললে, ঠিক আছে। তা-ই না-হয় তোক। তাহলে কাল ভোরেই আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে পড়বো।

জানুয়ারি মাসের পাঁচতারিখ সন্কেবেলায় বহর যেখানে এসে পৌঁছুলো, সেটা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের রাজ্য। এ-অঞ্চল সংরক্ষিত, রিজার্ভড। অর্থাৎ শাদাআদমিরা এখানে যেখানে-খুশি যেতে পারবে, এবং যা-খুশি তা-ই করতে পারবে, কিন্তু এই কালো আদিবাসীরা এর চৌহদ্দি পেরিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। এমনিতেই শাদারা কালোদের নির্বিচারে হত্যা করেছে অ্যাডিন, কিন্তু পাঁচবছর আগেও যে-সব আদিবাসী এখানে ছিলো, যে যার নিজেদের দেশে-এটা তো তাদেরই দেশ, না কী?-তারা ইচ্ছেমতো চলাফেরা করে বেড়াতে পারতো তাদের অনেক স্বাধীনতা ছিলো। কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে রাখার বাহানা করে-এটা একটা ছুতো বই আর-কিছু না, কারু স্বাধীনতা কেড়ে নেবার একটা অছিলাই তো শুধু তাদের এই জঙ্গলে এনে তাঁড়া কেটে গাণ্ডি ঐঁকে বলে দেয়া হয়েছে, তোমরা আর-কখনও এই গাণ্ডির বাইরে যেতে পারবে না।

পাণ্ডয়ল বলছিলেন : কিছুদিন আগেও, এই এতটা-রাস্তা পেরুবার সময় অস্ট্রেলিয়ায় যারা আগে থেকেই থাকতো, তাদের অনেককেই আমরা হয়তো দেখতে পেতুম। এবং আর-কিছুদিন পরে হয়তো কোথাও কোনোখানেই তাদের একজনকেও দেখতে পাবো না। অস্ট্রেলিয়া হয়ে উঠবে শাদাদেরই দেশ-যেন কেউ জাদুগালচেয় করে ইওরোপটাকেই এখানে এনে বসিয়ে দেবে-তবে বেশির ভাগ লোকই যে ব্রিটেনের হবে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এমনকী তারা এ-দেশটার বিভিন্ন অঞ্চলের নামও দেবে নিজেদের দেশের মাতব্বরদের নামে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা জানতেও পাবেন না এখানকার

লোকে জায়গাগুলোর নাম কী দিয়েছিলো। এই-যেমন, মেলবোর্ন রাজ্যের রাজধানীর নাম দেয়া হয়েছে ভিক্টরিয়া। এটা নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার আদিমানুষদের ভাষার কোনো শব্দ নয়।

কিন্তু এ-কথাটা আর নতুন কী? শাদারা যেখানেই গেছে, সুযোগ পেলেই খুন করেছে, বা হঠিয়ে দিয়েছে সে-দেশের আগেকার আদিবাসীদের। মার্কিন মুলুকের কথাই ধরুন না কেন? ইয়াক্সিরা ইন্ডিয়ানদের কটা উপজাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বলুন? এ-কথাটা মেজর ম্যাকন্যাব্স-এর।

পাণ্ডয়ল একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই বলেছিলেন : আমার এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় এ-সব সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করার গোপন মানেটাই হলো আদিবাসীদের সবাইকে একটা ছোটো জায়গায় ঠুশে ঢুকিয়ে দাও-তাদের বাকি-সব জমিজমা কেড়ে নাও-তারপর দরকার হলে গোটা জাতিকে জাতি লোপাট করে দিতে হলে আর ভাবনা কী-সবাইকেই তো একজায়গায় পেয়ে যাচ্ছে।

এই কথাগুলো ঠিক কারুই পছন্দ হচ্ছিলো না, এমনকী পাণ্ডয়লের নিজেরও। বেন জয়েসের লুঠপাটের সঙ্গে সরকারের আইনমাফিক ডাকাতির তফাৎটা কেবল মাত্রায় সরকার যেটা বিরাট তোড়জোড় করে আইনমাফিক করতে পারে, বেন জয়েস সেটা পারে না-তাছাড়া সে-যে নরাধম তার প্রমাণই তো হলো এই তথ্য যে সে শাদাদের হত্যা করে শাদাদের জিনিশপত্র লুঠ করে নেয়।

সংরক্ষিত এলাকার পাশেই তাঁবু খাটানো হয়েছিলো। সন্দের অন্ধকার নেমে এসেছে তখন। আর তারই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেলো আবছামতো কী-একটা জীব ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর ডাল থেকে ডালে ঝাঁপিয়ে পড়ে দূরে মিলিয়ে গেলো।

কোন জীব এটা? সন্দেহ ভঞ্জন করেছিলেন পাণ্ডয়লই। নিশ্চয়ই ঐ আদিবাসীদেরই একজন হবে-আমাদের ওপর নজর রাখছিলো-এখন অন্যদের খবর দিতে চলে গেলো।

পরের দিন ভোরবেলায় গ্লেনারভনের বহর যখন সরাসরি সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়লো-শাদাদের তো এখানে যেতে কোনো বারণ নেই-তখন খানিকটা এগিয়ে যাবার পরই তুলনায়-খোলামেলা একটা জায়গায় দেখা গেলো আদিবাসীদের ছাউনিগুলোডজন খানেক তাবুর মতো ঝুপড়ি, আর তার আড়াল থেকেই উঁকি দিচ্ছে ব্রস্ট ও চঞ্চল সব আদিবাসীদের মুখ। ইওরোপের পণ্ডিতদের কথাই আলাদা। কোন-একজন নৃতাত্ত্বিক নাকি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দেখে বলেছেন, বাঁদর থেকে মানুষ হয়ে যাবার যে-স্তর-পরম্পরা আছে তার মধ্যে একটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি; এতকাল তাকেই বলতো হারানো যোগসূত্র-মিসিংলিঙ্ক। এই পণ্ডিতের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিলো অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাই নাকি সেই হারানো যোগসূত্র।

তা এই মিসিংলিঙ্কদেরও নিজেদের ভাষা আছে, তারা তাদের সেই ভাষাতেই নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে, খবরের আদানপ্রদান করে নিজেদের পূর্বপুরুষের গল্প শোনায় ছোটোদের, এই ভাষাতেই তারা গান করে, স্বপ্ন দ্যাখে, আর এতকাল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকরকম জল্পনাও করতো-তবে আজকাল তারা জেনে গেছে যে তাদের ভবিষ্যৎ বলে

আর-কিছু নেই, ফলে এখন আর হয়তো পরেরদিন কী হবে তা নিয়ে তারা আর মাথাই ঘামায় না।

আয়ারটন বললে যে সে নাকি এদের ভাষা জানে-জাহাজডুবির পর সে নাকি এ-রকমই ছোটো-একদল আদিবাসীদের সঙ্গে দু-দুটো বছর কাটিয়েছে-সে বলতে চাচ্ছিলো গোলামি করে কাটিয়েছে, কিন্তু তাকে দিয়ে যেসব কাজ করানো হতো, আদিবাসীরা নিজেরাও উদয়াস্ত সেই কাজই করতো, আর তাকে দেখবামাত্র তাকে তারা নির্যাতনও করেনি-অথবা মেরে ফেলবার কথাও ভাবেনি। তবে কাজের বড়ো অংশটাই এখানে করতে হয় মেয়েদের, ছেলেরা শিকার করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, এখন আবার সবসময় হুঁশিয়ার হয়ে থাকে-কখন শাদারা এসে হাজির হয়।

আয়ারটন বললে, কাপ্তেন গ্রান্ট যদি সত্যি-সত্যি বেঁচে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই এইরকমই কোনো আদিবাসীদের দলের মধ্যে আছেন-আর আমাকে যেমন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হতো, তাকেও নিশ্চয়ই সেইরকম ভাবেই এদের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে।

কিন্তু তুমি তো এদের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে আসতে পেরেছো, মেজর ম্যাকন্যাব্স বললেন : এরা কি বন্দীদের ওপর কড়া পাহারা রাখে না?

পালিয়ে-যাওয়া খুব-একটা কঠিন নয় হয়তো, কিন্তু আসল কষ্ট শুরু হয় এদের হাত থেকে পালিয়ে আসার পরেই। দেখছেনই তো এই সংরক্ষিত এলাকার আশপাশে শাদাদের কোনো লোকালয় নেই। তাছাড়া অজানা অচেনা জায়গায়-কোথায় কী আছে

আপনি জানেন না। পালিয়ে আসার মানে তো আপনি ঝাঁপ খাবেন সরাসরি অজ্ঞাতের মধ্যে।

এ-সব কথা যখন চলছে তখন আদিবাসীদের মধ্যে একটা কলরব উঠলো হঠাৎ। এমু পাখিদের একটা ঝাঁক নাকি দেখা গেছে। পাখি বটে, কিন্তু ওড়ে না, ছোটো-আর এত-জোরে ছোটো যে পলক-না-ফেলতেই তারা চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়। এদের মাংস খুব সুস্বাদু বলেই তাদের আত্মরক্ষার জন্যে পা দুটোকে এমন তীব্রগতিতে ব্যবহার করতে হয়। ডানাগুলো কেমন বেটপ, আর কেমন যেন মাংসের টিবির মতো। তাই উড়তে পারে না বটে, তবে সবচেয়ে-দ্রুত ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছোটো। তাই এদের কুপোকাৎ করতে হয় বিস্তর বুদ্ধি খাঁটিয়ে। একজন আদিবাসী এমুর একটা খোলশ পরে, এমু সেজে, এমুদের মতো আওয়াজ করতে-করতে এমুর ঝাকটার কাছে গিয়ে আচমকা বেধড়ক লাঠি চালিয়ে পাঁচ-পাঁচটা এমুকে ঘায়েল করে ফেললে।

কিন্তু তারপরেই শিকার করবার আরো-একটা অদ্ভুত উপায় দেখতে পেলেন গ্লেনারভনরা। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এসেছিলো কাকাতুয়ার মতো নীলরঙের অচেনা পাখির একটা ঝক। চুপি-চুপি, কোনো শব্দ না-করে একজন আদিবাসী গাছের আড়ালে সরে গিয়ে গাঢ়াকা দিয়ে দাঁড়ালে। তার হাতে কঠিন একটা ঝাকানো কাঠ-প্রায় চাঁদের ফালির মতো ঝাকা। কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সাঁ করে কোমরের কাছ থেকে ঐ ঝাকা ফালিকাঠটা হাতের একটা ঝটকায় বিদ্যুৎবেগে ছুঁড়ে দিলে, আর হঠাৎ প্রায় চল্লিশ হাত পথ কোমরসমান উঁচু দিয়ে উঠে গিয়েই আচমকা সেটা সটান একলাফে উঠে গেলো অনেক ওপরে, তারপর সেই নীলপাখিদের ডজনখানেককে একসঙ্গে ঘায়েল করে ফের

বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে সোজা সেই আদিবাসীর কাছে ফিরে এলো, ধূপ করে পড়লো তার পায়ের কাছে।

পাণ্ডায়ল যেন এই অচেনা অঙ্গটার মধ্যেই চেনা-কিছুকে খুঁজে পেলেন। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন : আঁ! ব্যুমেরাং। নেহাৎ ছোট্ট একটা কাঠের ফালি-কিন্তু ছোঁড়বার কায়দাটাই আসল আর সেটা জানে অস্ট্রেলিয়ার এই অ্যাবওরিজিনরাই

সবদেশের আদিবাসিন্দারাই মাথা খাঁটিয়ে শিকারের সব বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে, লেডি হেলেনা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন দৃশ্যটা। আমেরিকায় তারা বার করেছে ল্যাসো, এমন কায়দায় দড়ির ফাঁস ছোঁড়ে যে বুনোমোষকেও কজা করে ফেলতে পারে। এরা বানিয়েছে ব্যুমেরাং! মাথায় যদি প্রখর বুদ্ধি-থাকে তাহলে এমন-কোনো হাতিয়ারের কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। অঙ্গটা নষ্ট হয় না আদৌ-যেন একটা অস্ত্রেই আস্ত একটা অঙ্গাগার-কেননা যেটাকে ছুঁড়ে মারা হলো, সেটাই আবার কাজ হাসিল করে ফিরে এলো! সত্যি, মানুষ যে কত কী-ই না মাথা খাঁটিয়ে বার করতে পারে!

ভূম! মেজর ম্যাকন্যাব্স বললেন, এরা আবার মানুষ নাকি? শোনেনি মঁসিয় পাণ্ডায়লের কাছে? কোন-একজন মস্ত পণ্ডিত নাকি বলেছেন এরা বাঁদরও নয়-মানুষও নয়-তারই মাঝামাঝি-কিছু-মাথা খাঁটিয়ে এই পণ্ডিত এর একটা নামও দিয়েছেন-মিসিংলিঙ্ক। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। মানুষ যে কত কী-ই বার করতে পারে মাথা খাঁটিয়ে!

.

চার

ডানকান গেলো কোথায়?

রাতিরে খাওয়াদাওয়ার পর শিবিরে যখন আড্ডা জমেছে, হঠাৎ-আশ্চর্য কাণ্ড!- অস্ট্রেলিয়ায় ইওরোপ থেকে অনেকদূরে, জঙ্গলের মধ্যে ভেসে এলো মোসার্টের অপেরার সুর : কারা যেন ডন জোভান্নি গাইছে।

এখানে? বনের মধ্যে? ডন জোভান্নি?

পাঞয়ল সবে কী-একটা প্রসঙ্গে তার পাণ্ডিত্য জাহির করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কারা গাইছে দা পোন্তের ইতালীয় ভাষায় লেখা ডন ছয়ানের কাহিনী-ভোলফগাঙ আমাডেউস মোসার্ট যার সুর দিয়েছিলেন, যে-অপেরা প্রথম প্রযোজিত হয়েছিলো বোহিমিয়ার প্রাহায়, ১৭৮৭ সালে-সেখানে ডন ছয়ানকে পাতালে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো পাথরের অতিথি।

স্কন্ধতার মধ্যে খানিকক্ষণ শুধু দূর থেকে ভেসে-আসা মোসার্টের সুর ছাড়া আর কিছুই নেই। তারপর, খানিকক্ষণ বাদে তাও মিলিয়ে গেলো রাতের হাওয়ায়।

একটুক্কণ চুপ করে থেকে মেজর ম্যাকন্যাব্স জিগেস করলেন : ডন জোভান্নি?

হ্যাঁ, ডন জোভান্নি। যথারীতি পাঞয়লেরই সবজান্তা গলা বিশদ তথ্য জানাবার জন্যে চুলবুল করে উঠেছে। অপেরাটার আসল নাম অবশ্য ছিলো ই দিলসালুতে পুনিতো, ও সিয়া ইল ডন জোভান্নি অর্থাৎ লম্পটের শাস্তি অথবা ডন জোভান্নি। আর সে-বার বোহিমিয়ায় প্রথম প্রযোজনার সময়ই দারুণ হুলুস্থুল হয়েছিলো এটাকে নিয়ে-

হ্যাঁ। তা না-হয় বোঝা গেলো, কিন্তু এত-রাতে এখানে সেই অপেরা গাইছে কারা? লর্ড এডওয়ার্ড গান শুনে বেশ হতভম্বই হয়ে পড়েছিলেন।

কারা যে গাইছিলো, সে অবশ্য পরদিন সকালেই জানা গেলো, যখন দেখা গেলো দুটি যুবক চলেছে ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গে একপাল শিকারি কুকুর।

এঁদের শিবির দেখে যুবকরাই নিজে থেকে কৌতূহলী হয়ে ঘোড়া থামিয়েছিলো।

আলাপ হবার পর যুবক দুটিকে ভালোই লেগে গেলো সকলের। কথায়-কথায় জানা গেলো তাদের বাবা লন্ডনের এক ধনকুবের, ব্যাঙ্কার। ছেলেদের ঝোঁক কেবল গানবাজনায়-এটা ব্যাঙ্কব্যবসায়ীর খুব-একটা পছন্দ হয়নি। অনেকবার নাকি চেষ্টা করেছেন ব্যাঙ্কের ব্যবসায় এদের ভিড়িয়ে দিতে, কিন্তু এইসব পাউন্ড-শিলিং-পেন্স জমা-খরচ সুদ-মূলধন-এইসবে কিছুতেই তাদের মন ওঠেনি। তারা বরং কোথায় কোন গানবাজনার আসর বসেছে, তার খবর রাখতেই বেশি-উৎসাহ বোধ করেছে। শেষটায় একদিন তাদের বাবা তাদের ডেকে বলেছিলেন, বুঝতে পারছি যতদিন আমার এখানে থাকবে, ততদিন ভাববে পায়ের উপর পা তুলে কাটালেই চলবে। কীভাবে যে সংসার চলে সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তোমাদের হবে না। তার চাইতে তোমাদের টাকা দিচ্ছি, লগুন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো-যেখানে খুশি যাও, ভালো হয় ইওরোপ ছেড়ে গেলেই। গিয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো। নটা-পাঁচটা আপিস যদি ভালো না-লাগে, তো অন্যকিছু করো-কিন্তু অন্যকোথাও, এখানে নয়। যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো তো ভালো, না-হলে বুঝবো দুটো অকস্মার ধাড়ি এককাড়ি টাকা জলে ফেলেছে। আমি না-হয়

ধরে নেবো যে তবু তো নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে এরা টাকাগুলো খুইয়েছে। কিন্তু এভাবে আর চলবে না-

বাবার কথা বলার ভঙ্গি দেখে এরা বুঝেছিলো, সত্যিই, এভাবে আর চলবে না। শেষটায় অনেক ভেবে তারা এসে হাজির হয়েছে পৃথিবীর একেবারে অন্যপ্রান্তে-এই অস্ট্রেলিয়ায়। এখানে এসে তারা ক্যাটলফার্ম খুলে বসেছে, গোরু-ভেড়ার ব্যবসা, আর তাদের ব্যাচটা হয়েছে এখনকার অন্য র্যাচগুলোর চাইতে একেবারেই অন্যরকম। অজস্র গোরু-ভেড়া সামলাচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা সামলাতে গিয়ে এখানে তারা তাদের র্যাশকে কেন্দ্র করে আস্ত-একটা জনপদই গড়ে তুলেছে। শুধু তাদের নিজেদের জন্যে যে মস্ত একটা প্রাসাদই বানিয়েছে তা নয়-তার আশপাশে তাদের কাছে যারা কাজ করে তারাও নিজেদের ঘববাড়ি বানিয়েছে। জেনারেটর বসিয়েছে-সেখানে তড়িৎকোষ থেকে বিজলি উৎপাদিত হয়ে যে শুধু আলোই জোগায় তা-ই নয়, তারা বসিয়েছে টেলিগ্রাফভবন, যাতে বড়ো শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে সবসময়, চেষ্টা করেছে এই দূর জঙ্গলেও জীবনযাত্রার মান যাতে আদিম অতীতে ফিরে না-যায়, বরং বিজ্ঞানকে কাজে খাঁটিয়ে আজ মানুষ জীবনযাত্রাটা যতটা সহজ করে তুলেছে, এখানেও যেন সেই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ পড়ে।

এখানে তারা খুব-ভালো আছে। সারাদিন সকলের সঙ্গে খাটে, র্যান্চের তদারকি করে, এক কোরাল থেকে অরেকটা কোরালের সংযোগ রাখে, রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মাঝে-মাঝে তাদের মনে পড়ে যায় বেটোফেন বা মোৎসার্টকে, আর কাল রাত্তিরে তারা তাদের সেই গানই শুনেছেন।

সাধারণত যারা র্যাশ্চ চালায় তাদের ধরন-ধারণ হয় রক্ষ, কর্কশ, একটু হয়তো, বা অমার্জিতও। এরা কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর তারা অভিযাত্রীদের আমন্ত্রণই জানিয়ে বসলো, আসুন না, আমাদের খামারটা দেখে যাবেন একবার।

এদের সঙ্গে আলাপ করে অভিযাত্রীরা বেশ খুশিই হয়েছিলেন। তাছাড়া, একদিন একটানা পথের ধকলে বেশ-একটু ক্লান্তিও লাগছিলো। একটা দিন না-হয় একটু অন্যরকম ভাবে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-পথশ্রম ছাড়াই কাটানো গেলো।

সারাটা দিন কাটলো এই ক্যাটলফার্ম ঘুরে বেড়িয়ে। এই যুবক দুটি কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিশাল বনের পাশে ইওরোপকে এনে বসিয়ে দেয়নি। বরং অস্ট্রেলিয়ার ভূদৃশ্যের সঙ্গে সংগতি রেখেই, মানানসইভাবেই, সবকিছু গড়ে তুলেছে। তাদের এই ছোট গ্রামটা গড়ে তুলতে গিয়ে তাদের অনেক গাছপালা কাটতে হয়েছে, এটা সত্যি-কিন্তু তারা নির্বিচারে গাছ কেটে বনকে বন সাফ করে দেয়নি, বরং র্যাচটা গড়ে তুলেছে এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমির পাশে, যাতে গোরু-ভেড়া চরে বেড়াতে পারে, পরের পর গাছপালা কেটে তারা এই চারণভূমি গড়ে তোলেনি। কেননা এটা তারা জানে যে এমনিতেই অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি আউটব্যাকে এমনভাবে হা করে থাকে যে যত গাছপালা কাটবে, ততই মরুভূমি এগিয়ে আসবে, বৃষ্টি পড়বে না-ঘাসও গজাবে না, এমনকী সব জীবজন্তুও এখান থেকে উধাও হয়ে যাবে। তারা চেয়েছে যাতে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে কাজে খাঁটিয়েই তাদের খামার গড়ে তোলা যায়।

অর্থাৎ তৃণভূমিটাকে ঘিরেই জটিলঝুরি মস্ত গাছপালা নিয়ে মোটামুটি অক্ষতই থেকে গেছে এই নিবিড় বনানী-আর তার জীবজন্তুরাও আশ্রয় খুইয়ে এখান থেকে পালিয়ে যায়নি।

চলুন-না, আজ একটু বনের ভেতরে গিয়ে শোভা দেখে আসা যাক।

খাওয়াদাওয়ার পর তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো।

বনের শোভা অবশ্য এই দিনগুলোয় যথেষ্টই দেখেছেন সবাই, কিন্তু এখানকার বনে নাকি এমন-সব জীবজন্তু আছে, যা আর কোথাও সহজে দেখা যাবে না।

এ-কথা শুনে সকলের আগে উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিলো রবার্টই। আর তার উৎসাহ দেখে অন্যরাও আর-কোনো আপত্তি তোলেননি। কিন্তু তাতে অবশ্য একটা বিপত্তিই ঘটতে বসেছিলো। তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিলো ক্যাণ্ডারুদের একটা বাকের-অনেক ছানা-রুর সঙ্গে মা-ক্যাণ্ডারু। আর ক্যাণ্ডারুর স্বভাবই এমন যে যদি তারা ভাবে আচমকা কোনো বিপদ এসে হাজির হয়েছে, তখন তারা গোড়ায় চেপ্টা করে লাফিয়ে লাফিয়ে পালিয়েই যেতে-ক্যাণ্ডারুর লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটে-চলার দৃশ্য ভারি অদ্ভুত, কেমন হাসিও পায়-কিন্তু ব্যাপারটা খুব-একটা হাসির থাকে না, যদি তারা মনে করে যে সহজে পালিয়ে যেতে পারবে না। তখন উলটে তারা লাফিয়ে এসে হামলাই চালায়-তখন তারা লাথি কষায়, আর সেই চাট খেয়ে বড়ো-বড়ো জন্তুও একেবারে ঘায়েল হয়ে যায়।

ক্যাণ্ডারুরা নিরামিষাশী উদ্ভিদভোজী। শুধু অস্ট্রেলিয়া আর নিউগিনিতেই তাদের দেখা যায়। লম্বা ল্যাজ, আর শরীরের পেছন দিকটা এমন সবল-সুগঠিত যে তাতেই তারা

একেক লাফে বড়ো-বড়ো দূরত্ব অতিক্রম করে যেতে পারে। আর প্রকৃতি যেমন তাদের আত্মরক্ষা করার জন্যে শক্তিশালী পশ্চাদ্দেশ আর সুগঠিত পা দিয়েছে, তেমনি এই ব্যবস্থাও করেছে বিপদের সময়, কোণঠাশা হয়ে গেলে, যাতে তারা ঐ পায়ের লাথি কষাতে পারে।

রবার্ট ঠিক টের পায়নি, বরং আগ্রহের বশে বড্ড-কাছে গিয়ে পড়েছিলো এক ছানা-রুর, যে-তখন মার বুকের থলে থেকে বেরিয়ে নিজেই চরে বেড়াচ্ছিলো। কিন্তু মা-ক্যাঙারুর ছিলো সজাগ কনজর; সে রবার্টকে কাছে আসতে দেখেই

একলাফে তার কাছে এসে পড়ে প্রায় লাথি কষাতেই গিয়েছিলো। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স হুঁশিয়ার না-থাকলে রবার্টকে আর দেখতে হতো না-কিন্তু কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স গায়ের জোরে ধেয়ে-আসা ক্যাঙারুর বুকে তার ছোরা বসিয়ে দেয়াতেই রবার্ট সে-যাত্রায় বেঁচে গেলো।

এই বিপত্তির পর সবাই বেশ-একটু মনখারাপ করেই ফিরে এসেছিলো। মিথ্যেমিথ্যে কোনো ক্যাঙারুকে মারার ইচ্ছে বোধহয় কারুই ছিলো না।

ক্যাঙারু নিরামিষাশী হলে কী হয়-আমাদের কিন্তু বিপদে ফ্যালে প্রায়ই, একটু সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতেই ভাইদের একজন বললে, শুধু লতাপাতা উদ্ভিদ খায় বলেই এঁদের খাই-খাই থেকে শস্যবাঁচানো একটা বিষম মুশকিলের ব্যাপার। ক্যাঙারুর ঝক আসতে দেখলে আমরা নিজেরাও প্রায়ই উলটে ওদের মারতে বাধ্য হই।

হ্যাঁ, একেই বলে জঙ্গলের নিয়ম। তুমি যদি নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না-করো, তবে তোমার দেখাশুনো করবার জন্যে এই বিজনবিভূঁইয়ে আর কেই-বা থাকবে? অন্যভাই সায় দিয়ে বলেছিলো।

বিশ্রামটা যদি অবিমিশ্র নিশ্চিত হয়নি, তবু বোধহয় এই একটা দিন জিরিয়ে নেয়া ভালোই হয়েছিলো। কারণ পরদিন ভোরেই লর্ড গ্লেনারভনের বহর অস্ট্রেলিয়ার এমন অঞ্চলে পৌঁছে গেলোলা যেখানটা অত্যন্ত দুর্গম বলেই এখনও মানুষের অজ্ঞাত থেকে গেছে।

বহর এখন যেখানে এসে পৌঁছেছে মাউন্ট কচিউস্কোর কাছে, যে-পর্বতশ্রেণী দক্ষিণপূর্ব নিউসাউথ ওয়েলস-এর পাশ দিয়ে উঠে গেছে ৭৩১৬ ফিট উঁচু, অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে-উঁচু পর্বতশ্রেণী-গ্রেট ডিভাইডিং রেজের মধ্যেও সবচেয়ে-উঁচু। ইওরোপ থেকে মানুষ গিয়ে তাকে একটা ইওরোপীয় নামই দিতে চেয়েছে, তাকে বলেছে অস্ট্রেলিয়ার আপস-একদিকে পূর্ব-ভিক্টোরিয়া, আর দক্ষিণদিকে নিউ সাউথ ওয়েস-বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে চলে গিয়েছে পর্বতশ্রেণী। অস্ট্রেলিয়ার এই আল্পসের সবখানে এখনও কোনো অভিযাত্রীদলই যেতে পারেনি, ফলে প্রায়ই নতুন-নতুন তথ্য জড়ো হতে থাকে এই মাউন্ট কচিউস্কো সম্বন্ধে। এঁদের বহর অবশ্য এটা অতিক্রম করে যাবে না, শুধু-যে দুর্গম তা নয়, এটা দুরারোহও-তাছাড়া কোথায় যে কী আছে, তাও জানা নেই-ফলে আগে থেকেই ঠিক ছিলো এর পাদদেশ ঘিরেই, এর পাশ কাটিয়ে, যাবে বহর।

কিন্তু তাহলেও ঠিক কোনখান দিয়ে গেলে যে এর পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে, সেটা জানা নেই-কোনো মানচিত্রেও এ-সম্বন্ধে কোনো হদিশ দেয়া নেই। এখানকার কারু কাছে

জিগেস করে পথঘাট সম্বন্ধে জেনে নিতে পারলেই ভালো হতো। সেইজন্যই পথে যখন একটা সরাইখানা পড়লো, সেখানে গিয়ে জিগেস করে সব ঘাতঘোঁৎ জেনে নেয়া ভালো বলেই ঠিক হলো।

সরাইওলা বোধহয় সত্যিকার একজন রেডনেক, খুবই রক্ষ আর রুঢ় তার চেহারা, কথাবার্তাও কাটা-কাটা, কেমন যেন রাগি-রাগি। আয়ারটনের প্রশ্নের উত্তরে সে অবশ্যি একটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথের কথা বাৎলে দিলে, সেখান দিয়ে গেলে পাহাড়ের ল্যাজের দিকটা ডিঙোনো যাবে কিন্তু এই হৃদিশটুকু দেবার কোনো ইচ্ছে বোধহয় তার ছিলো না-ভাবটা এমন, যেন সে তার সিন্দুক থেকে মহামূল্যবান কোনো সম্পত্তি বার করে দিচ্ছে।

সরাই থেকে বেরিয়ে আসার সময়েই ইশতেহারটা চোখে পড়লো লর্ড এডওয়ার্ডের। বেন জয়েসকে ধরিয়ে দেবার কোনো খবর দিতে পারলে একশো পাউন্ড পুরস্কার দেবে পুলিশ।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স হুঁলিয়াটা দেখে মন্তব্য করলেন :এই বেন জয়েসের কুকীর্তিগুলো সম্বন্ধে যত খবর পাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে একে হয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না-দিয়ে ফাঁসিতে লটকানোই উচিত ছিলো।

লোকে যতটা বলে যদি সত্যিই সে এতটাই কুখ্যাত হয়, তাহলে মাত্র একশো পাউন্ড দাম হবে কেন তার মাথার? আয়ারটন একটা টিপ্পনী কাটলে। আমার মনে হয়, এ-সব রটনার মধ্যে অনেকটাই বাড়াবাড়ি আছে—

যতই অতিরঞ্জিত থাক না কেন, লর্ড এডওয়ার্ডের মন্তব্য, বেন জয়েস যে খুব একটা সুবিধের লোক নয়, এটা ঠিক। না-হলে পুলিশ এমন হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতো না। কিংবা যে-সব জায়গায় খুব-বেশি লোকজন নেই, সেইসব দূর-দূর জায়গায় এসে এমনভাবে হুঁলিয়া টাঙিয়ে দিতো না।

অর্থাৎ, মেজর ম্যাকন্যাব্‌স বললেন, সে-যে কখন কোথায় থাকে, পুলিশ সে-সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখে না। তারা শুধু আন্দাজে ভর করে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে—

এত-সব কথাবার্তার মধ্যে পাণ্ডয়ল যে কোনো মন্তব্য করবেন না, তা তো আর হয় না। তিনি বলে উঠলেন, এইভাবেই কিংবদন্তির জন্ম হয়। যার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই, তার সম্বন্ধেই সব উলটোপালটা উদ্ভট আজগুবি খবর বেরিয়ে যায়—আর লোকে ভাবে সে বুঝি সাধারণ মানুষের চাইতে একেবারেই অন্যরকম।

বেন জয়েসকে জড়িয়ে কত-কী গল্প রটেছে, সে-সম্বন্ধে আলোচনাটা অবশ্য আপাতত মূলতুবি রইলো। এখন এই মাউন্ট কচিউস্কোর ল্যাজটা ডিঙিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আপস-এর পাল্লা থেকে বেরিয়ে-যাওয়াই জরুরি আর অব্যবহিত কাজ।

এবং কাজটা যে সহজ নয়, ক্রমাগতই তার প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগলো।

স্কটল্যান্ড যতই পাহাড়ি জায়গা হোক, হাইল্যান্ডের উচ্চভূমি যতই উবড়োখবড়ো বা রুম্ববনুর হোক, এবং স্কটল্যান্ডের পাহাড় সম্বন্ধে তাদের যতই অভিজ্ঞতা থাক, এই পাহাড় টপকাতে তা মোটেই কাজে লাগবে না, এই মাউন্ট কচিউস্কোর যে-দিকটা অপেক্ষাকৃত নিচু, সেদিক দিয়েও পাহাড় টপকানো নেহাৎ সহজ কর্ম ছিলো না—বিশেষত

এত-সব ঘোড়া আর বলদ নিয়ে। মেজর ম্যাকন্যাব্স প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পুরো ব্যাপারটার তত্ত্বাবধান করছিলেন। বিশেষত যখন একবার বলদে-টানা গাড়িটার একটা চাকা হঠাৎ-একবার দুম করে খুলে এলো, আর তারপর রহস্যময়ভাবে মুখ খুবড়ে পড়লো কয়েকটি বলদ আর একটা ঘোড়া। কেন-যে ওভাবে দুম করে তার পপাত ধরনীতলে এবং মমার চ, সেটা প্রায়-যেন একটা দুর্বোধ্য, হেঁয়ালিই রয়ে গেলো। ক্লান্ত, অবসন্ন, রুম্ফ পাহাড়ি পথের বন্ধুর পাথরে হোঁচট খেয়েছে-এতসব কথা ভেবেও বোঝা গেলো না তারা মাটিতে পড়বামাত্র মরলো কেন।

তারপর যখন বিশেষ-সাবধানে ধীরমন্তর গতিতে পাহাড়ের শীর্ষদেশটা ডিঙিয়ে তারা ওপাশটায় পৌঁছেছেন, তখন চলতে-চলতে হঠাৎ জাক পাঞ্চয়লের ঘোড়াটাও কেমন বিচ্ছিন্নভাবে পাগুলো দুমড়ে-মুচকে প্রায় হুমড়ি খেয়েই পড়লো এবং আর উঠলো না, তখন প্রায় চোখ ছানাবড়া হবার অবস্থা সকলের। কী কারণ থাকতে পারে এই বলদগুলো আর ঘোড়াগুলোর এমনভাবে চিৎপাত হয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে যাওয়ার? পাঞ্চয়লকে নিয়েই যখন তার ঘোড়াটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো, তখন তার মুখচোখের ভাব যদি ছবি এঁকে ফুটিয়ে তোলা যেতো! তার মুখ দিয়ে বাক্য প্রায় সরছিলোই না, শুধু কোনোমতে অস্ফুট স্বরে বলতে পেরেছিলেন : অদ্ভুত!

অদ্ভুত তো বটেই! এখন যে বাকি রইল মাত্র পাঁচটা ঘোড়া আর চারটে বলদ। এগুলোর যদি কিছু হয়, তাহলে বহর একেবারে অকেজো হয়ে যাবে, জনমানবহীন রুম্ফ পার্বত্যঅঞ্চলে বিষম বিপদের মধ্যে পড়বে। লর্ড এডওয়ার্ড এতটাই বোমকে গিয়েছিলেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। শুধু মেজর ম্যাকন্যাব্স জাক পাঞ্চয়লের অস্ফুট আর্তনাদ, অদ্ভুত!-এর উত্তরে চাপাগলায় দাঁত চেপে বলেছিলেন : খুবই অদ্ভুত!

কিন্তু বিপদ আর প্রহেলিকা বোধহয় একা আসে না। সেই রাতেই মারা গেলো আরো একটা ঘোড়া, আর বলদ। আর কেন-যে এরা হঠাৎ এভাবে পর-পর মারা যাচ্ছে, সেই হিংটিংছট প্রশ্নটার কোনোই সমাধান হলো না। মেজর ম্যাকন্যাব্‌স যতই আপৎকালীন সতর্কতা নিয়ে চোখকানখুলে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করুন না কেন, কেবল তার মুখটা গম্ভীর হয়ে-যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হলো না-এবং তার ললাটদেশে কেবল কতগুলো বাড়তি কুণ্ডলরেখা পড়লো। আর আয়ারটন কেমন যেন হতভম্ব হয়ে আছে। সে ঘোড়া আর বলদগুলোর বিশেষ তোয়াজ করছে, পরিচর্যা করছে, কিন্তু কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না- হঠাৎ এতটা পথ পেরিয়ে এসে এই পাহাড়েই এমন তাজ্জব কাণ্ডটা হচ্ছে কেন!

আপদের সেখানেই শেষ নয়। সাবধানে বাকি পথটা চলতে-চলতেও যখন পরের দিন জানুয়ারির তেরো তারিখে স্লোয়িনদীর আধমাইলের মধ্যে এসে গাড়ির চাকা ডেবে গেলো কাদায়, তখন সকলের একেবারে মাথায় হাত। কোনোরকমে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে কাদার মধ্য থেকে তোলা হলো বটে, কিন্তু ঠিক হলো এখানেই আপাতত ছাউনি ফেলে রাতটা কাটিয়ে দেয়া হবে। তাতে এই জন্তুগুলো অন্তত বিশ্রাম করবার একটা সুযোগ পাবে- হয়তো পথের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারবে।

সবাই যখন গুছিয়ে বসে এইসব আকস্মিক উৎপাত সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, তখন আয়ারটন আবার নতুন করে তার প্রস্তাবটা দিলে।

সামনেই একটা মোটামুটি সুগম রাস্তা আছে-নাম লঙ্কৌ রোড-

তাকে কথাটা শেষ করতে না-দিয়েই জাক পাঞ্চয়ল বললেন, কী মুশকিল! লোকেরা কি আর নতুন নাম পায় না কোথাও! পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যদি একই নাম দিতে থাকে, তাহলে আমরা যারা ভূগোল নিয়ে চর্চা করি-আমরা কোথায় যাই? এই পর্বতশ্রেণীর নাম গ্রেট ডিভাইড রে -মার্কিন মুলুকেও এমনি-একটি গ্রেট ডিভাইড আছে। কোথায় জানতুম ভারতবর্ষে লক্ষ্মী নামে একটা জায়গা আছে, সিপাইবিদ্রোহের সময় সেখানে একটা প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিলো। এখন, এইখানে কি না একটা লক্ষ্মী রোড এসে হাজির। এই রাস্তা ধরেই কি আমরা সাতসাগর ডিঙিয়ে সোজা ভারতবর্ষে গিয়ে লক্ষ্মী পৌঁছুবো নাকি?

ভৌগোলিকের এই বিমর্ষ সমস্যায় সবাই কোথায় সহানুভূতি দেখাবেন-না, সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। আবহাওয়া গত কদিন ধরেই কেমন ভারি হয়ে ছিলো, তার কথা শোনবার পর হঠাৎ যেন সব মেঘ কেটে গেলো, পরিবেশটা বেশ হালকা হয়ে গেলো।

হাসিটা একটু থামতেই আয়ারটন ফের নাছোড়ের মতো কথাটা পাড়লে। আমাদের তো একের পর এক বিপদ লেগেই আছে। কবে যে সবাই মিলে আমরা পুরো রাস্তাটা পেরুতে পারবো কে জানে। তার চাইতে, কাছেই যখন লক্ষ্মী রোড আছে, তখন, আমায় বরং মেলবোর্নেই পাঠিয়ে দিন-ডানকানের খোঁজে। যাতে ডানকান সোজা পূব উপকূলে চলে যায়, সেই-মর্মে বরং একটা চিঠি লিখে দিন, যাতে আমাদের কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকে।

আর-কেউ কিছু বলবার আগেই মেজর ম্যাকন্যাব্স বাধা দিলেন। ব্রিটানিয়া যে ঠিক কোথায় ডুবেছে, তা জানা আছে একমাত্র আয়ারটনেরই। তাকে কী করে এখন সবাইকে ছেড়েছুঁড়ে একা চলে যেতে দেয়া যায়?

সঙ্গে-সঙ্গেই মেজর ম্যাকন্যাসের কথায় সায় দিলেন কাণ্ডেন ম্যাঙ্গ। তারও মত : ডানকান ফাস্টমেট টম অস্টিনের তত্ত্বাবধানে যা করছে করুক-কিন্তু কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো হুদিশ না-পাওয়া অন্দি আয়ারটনের মূল বহর ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

আয়ারটন যখন বললে যে আমি শুধু আমাদের কাজটা খানিকটা এগিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম,তখন তার মুখে যে হাঁড়িপানা ভাব ফুটে উঠেছিলো, সেটা আর-কেউ খেয়াল করুক বা না-করুক, মেজর ম্যাকন্যাব্স বেশ লক্ষ্য করেছিলেন। এ-কথায় তার অতটা নিরাশ হয়ে পড়ার কী আছে? আয়ারটনের হাবভাবের মধ্যে কী-একটা যেন আছে, যেটা মেজর ম্যাকন্যাসের আদপেই ভালো লাগছে না। অথচ স্পষ্ট তিনি নিজেই জানেন না-সেটা কী? তাই এ নিয়ে তিনি আর-কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। মনে-মনে ঠিক করে নিলেন, আয়ারটনের ওপর এখন থেকে কনজর রেখে চলতে হবে।

সম্ভবত মনের মধ্যে কোথাও-একটা অস্বস্তি খচখচ করছিলো বলেই সে-রাতে একটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেলো মেজর ম্যাকন্যাসের। গোড়ায় তিনি বুঝতেই পারেননি হঠাৎ এত-তাড়াতাড়ি তার ঘুম ভেঙে গেলো কেন। আর তারপরেই চোখ কচলে ধড়মড় করে তিনি উঠে বসলেন।

তারা যেখানে ছাউনি ফেলেছিলেন, সেখানে প্রায় আধমাইল জায়গা ফসফরফার্নের হালকা-নীল আলোয় আলো হয়ে আছে-কিন্তু সেটাই তার ধড়মড় করে উঠে-বসার কারণ নয়। একটু-দূরে কয়েকটা কালো-কালো ছায়া, অথবা আরো-ভালো করে বলা যায় ছায়ার মতো মানুষ, ঝুঁকে পড়ে ছায়ামূর্তিগুলো যে মাটির ওপর কী-সব চিহ্ন খুঁটিয়ে দেখছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রায় ছুটেই যেতে চেয়েছিলেন মেজর, কিন্তু শেষটায় লম্বা-লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে এগুলেন, তিনি। কী ব্যাপার? এরা কারা?

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স ছাউনি ছেড়ে ওভারে ঘাসবনের মধ্যে মিলিয়ে যাবার খানিকক্ষণ বাদেই বৃষ্টি নামলো। বড়ো-বড়ো ফোঁটা, যেন পিপে-পিপে জল ঢেলে দিচ্ছে কেউ আকাশ থেকে। ঝলকঝলক হবে নাকি? পাণ্ডুল আধোঘুমের মধ্যে খানিকটা ভিজে গিয়েই বললেন, এমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লেই এদিকটায় ঝলকঝলক ডাকে-ফ্যাশফ্যাড বন্যার মতো জল গড়িয়ে যায় পাহাড় থেকে, সামনে যাকে পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আর কথা কটা জড়ানো সুরে বলতে-বলতেই সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়ে পুরোপুরি ঘুম ভেঙে গেলো তার। নাঃ, এই তুমুল বৃষ্টি এই তাবুর মধ্যে আর থাকতে দেবে না দেখছি!

বৃষ্টির ঝমঝম শব্দেই শুধু নয়, বৃষ্টির ঝাঁপটায় ভিজে গিয়ে একটু আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো লর্ড এডওয়ার্ডের। এবার বুঝলেন পাণ্ডুল ঠিকই বলেছেন-এমন বৃষ্টিতে এই তাবুর মধ্যে আর টেকা যাবে না। সবাইকে সাথে নিয়ে তক্ষুনি তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন সেই বলদে-টানা গাড়িটায়, মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনা যেখানে এই প্রচণ্ড বৃষ্টিতেও খানিকটা সুরক্ষিত আছেন।

ভালো করে কারুই ঘুম হয়নি, তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই গাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে, আর পাণ্ডুলের ঝলকঝলক কথা শুনে সবাই একটু আঁৎকেও উঠেছিলো-উত্তেজনায় সকলেই যেন একসাথে কথা কইছিলেন। সকলেই-কিন্তু মেজর ম্যাকন্যাব্‌স নন। এ-সব তালেগোলে কেউ খেয়ালও করেননি মাঝখানে কিছুক্ষণ তিনি কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।

বলকটলের আশঙ্কাটা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছিলো না। আর-কিছু না-হোক, এ-ভয়টা তো আছেই এই তুমুল বর্ষায় স্নোয়ি নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে। তাই বৃষ্টির মধ্যে কেউ-না-কেউ মাঝে-মাঝে বেরিয়ে গিয়ে খোঁজ করে এলেন জল বাড়ছে কি না।

বৃষ্টির কাণ্ডটা অদ্ভুতই বলতে হবে। যেই ভোর হলো, অমনি বৃষ্টিও থেমে গেলো। আকাশ দেখে কে বলবে যে একটু আগেই সে তুলকালাম ঢল নামিয়ে দিয়েছিলো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে বটে, কিন্তু আকাশের মুখ হাঁড়িপানা, ঘন কালো মেঘ ঢেকে দিয়েছে সূর্যকে। কিন্তু কাদায়-আটকে-যাওয়া গাড়িটাকে এখনই টেনে-তোলা দরকার, না-হলে আরো-ফ্যাসাদে পড়তে হবে। শুধু বলদগুলোকে তাড়া লাগিয়ে কোনো লাভ হবে না, এই বৃষ্টির পর নরম কাদামাটিতে গাড়িটা যেভাবে এঁটে বসেছে তাতে একে টেনে-তোলা শুধু এই কটা বলদের কাজ নয়, বলদ ঘোড়া মানুষ সকলের সম্মিলিত শক্তি দরকার।

কিন্তু বনের মধ্যে যেখানে বলদ আর ঘোড়াগুলো রেখে আসা হয়েছিলো, সেখানে গিয়ে দেখা গেলো সব ভোঁ-ভোঁ-জন্তুগুলোর একটাও সেখানে নেই!

কাণ্ড দেখে, সকলেরই চোখ কপালে উঠে গেলো, হতভম্ব ভাবটা যে আছেই, কিন্তু বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে কারু একমুহূর্তও দেরি হয়নি। এমনিতেই তো গত ক-দিনে বেশকিছু ঘোড়া আর বলদ টেশে গিয়েছে-তাতেই যা অসুবিধে হচ্ছিল, তা আর কহতব্য নয়। এখন এ-জন্তুগুলোর একটাকেও জায়গামতো না-দেখে সকলেরই মাথায় হাত। কী হবে এখন?

ঘন্টাখানেক প্রায় আশপাশের বনজঙ্গল তোলপাড় করে খোঁজা হলো জন্তুগুলোকে-কিন্তু যতই হাঁকডাক চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করুন না কেন, এই জন্তুগুলোর কোনো সাড়াই পাওয়া গেলো না। এরা যেন কোন্ ফুশমন্তরের হাওয়ায় উবে গিয়েছে।

হাল ছেড়ে দিয়ে বিমর্ষভাবে যখন কাদায়-ডেবে-বসা গাড়িটার দিকে ফিরছে সবাই, তখন আচমকা ক্ষীণ চিহ্ন-চিহ্ন ডাক শোনা গেলো। হস্তদন্ত হয়ে-ছুটে গেলেন সবাই। সেই নিবিড় লম্বা ঘাসের বনে হাতের ঝটকায় পথ করে নিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেলো-সেই বড়-বড়ো ঘাসগুলোর মধ্যে ঠ্যাং তুলে মরে পড়ে রয়েছে তিনটি ঘোড়া আর দুটি বলদ। চিল-শকুনরা পাক খাচ্ছে মাথার ওপর, কাকের ওড়াউড়ি, গাছের ডালে-ডালে বসে আছে গৃধীরা। আজ তাদেরই ফুটি সবচেয়ে-বেশি-এতবড়ো-একটা ভোজের ব্যবস্থা হওয়া মানে তো তাদের মহোৎসব।

লর্ড এডওয়ার্ড স্তম্ভিত হয়ে গেলেন-আশ্চর্যকভাবেই যেন কোনো স্তম্ভ হয়ে গেলেন, স্ট্যাচু। একটু পরে যখন কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে এলো, সে-কথা এতই ক্ষীণ শোনালো যে মনে হলো তার গলা দিয়ে যেন কোনো আওয়াজ বেরতে চাচ্ছে না। আয়ারটন, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে তিনি বললেন-যেন কোনো ভূতুড়ে দুঃস্বপ্ন থেকে এখনও তিনি আবেশ কাটিয়ে জেগে উঠতে পারেননি, বাকি ঘোড়া আর বলদটাকে নিয়ে যাও।

প্রায় টলতে-টলতেই যেন গাড়ির কাছে ফিরে এলেন সবাই, মোহ্যমান, এইটুকু পথ আসতে বুঝি আধঘন্টাই লেগে গেলো তাদের।

এতক্ষণ মেজর ম্যাকন্যাব্স টু-শব্দটি করেননি। নীরবে সবকিছু দেখে যাচ্ছিলেন। এবার লর্ড গ্লেনারভনের দশা দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না তিনি। এর আগের বার নদী পেরুবার সময় সব কটা ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো হলে এমন অবস্থা কিছুতেই হতো না।

এ-কথা কেন বলছেন? একটু হতভম্ব হয়েই জিগেস করলে আয়ারটন।

যে-ঘোড়াটার পায়ে নাল লাগানো হয়েছিলো, শুধু সেইটেই বেঁচে গেছে বলে-

আরে! তা-ই তো! কাণ্টেন ম্যাস্‌লস সবিস্ময়ে বলে উঠলেন। এ-যে দেখছি তাজ্জব ব্যাপার!

মেজর ম্যাকন্যাসের দিকে তাকিয়ে আয়ারটন বললে, হ্যাঁ, ব্যাপারটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।

মেজর ততক্ষণে ফের তার মুখে যেন কুলুপ এঁটে দিয়েছেন-আর একটা কথাও বললেন না। গ্লেনারভনের ভারি-কৌতূহল হচ্ছিলো-এখনও তিনি ঠিক ধরে উঠতে পারেননি ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাবার সঙ্গে এই অপঘাত মৃত্যুগুলোর কী সম্পর্ক। মেজর কিন্তু তখন অপলকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন অন্যান্য নাবিকদের নিয়ে আয়ারটন কীভাবে কাদার মধ্য থেকে গাড়িটাকে টেনে তোলবার ব্যবস্থা করছে। মেজরের মুখ থেকে হেঁয়ালিটার কোনো ব্যাখ্যা না-পেয়ে শেষটায় কাণ্টেনকেই জিগেস করলেন গ্লেনারভন, আচ্ছা, ম্যাস্‌, ম্যাক্সাস তখন কী বলতে চাচ্ছিলো?

বুঝতে পারছি না। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলসের গলায় চিত্তার ছাপ। তবে মেজর ম্যাকন্যাব্স সাধারণত উটকো-কোনো মন্তব্য করেন না-কারণ থাকলেই কিছু বলেন।

এবার খুব নিচুগলায় লেডি হেলেনা জানালেন : আমার মনে হয় মেজর কোনো কারণে আয়ারটনকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না-এ-সবকিছুর জন্যে তাকেই সন্দেহ করছেন-

কিন্তু কেন? পাওয়েলও এবার একটু চমকে গেছেন। আয়ারটন এবার কী করেছে?

ম্যাকন্যাব্স যদি ভেবে থাকে, আয়ারটনই এই জন্তুগুলোর মৃত্যুর জন্যে দায়ী, তাহলে সে একটা মস্ত ভুল করেছে? একটু ভেবে নিয়ে বললেন গ্লেনারভন। কিন্তু কাউকে সন্দেহ করার আগে তার উদ্দেশ্যটা নিয়ে ভাবতে হবে তো? খামকা আয়ারটন এমন কাজ করতে যাবে কেন? এতে তার কী লাভ হবে?

এটা ঠিক যে জন্তুগুলো মারার পেছনে আয়ারটনের কী মতসব আছে আমরা সেটা জানি না, কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলস বললেন, কিন্তু মেজর এ-সম্বন্ধে সত্যি-সত্যি কী বলতে চান, সেইটেই আগে জানা দরকার।

পাওয়েল এতক্ষণে একটু ঘাবড়ে যাবার ভঙ্গিতেই বলেছেন : ঐ পালিয়ে-যাওয়া কয়েদিগুলোর সঙ্গে মিলে কোনো ঘোঁট পাকায়নি তো?

কাণ্ডেন ম্যাঙ্গসকে নিয়ে এবার লর্ড গ্লেনারভন পাঁকে-পড়া গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। গাড়িটাকে টেনে তুলতে গিয়ে এতজন দশাসই জোয়ান বলদ আর ঘোড়াকে

কাজে লাগিয়েও কিছু করতে পারেনি। গাড়িটার চাকাগুলো যেন সেখানে খুঁটি গেড়ে রয়েছে। আর-বেশি জোরাজুরি করতে গেলে এবার না গাড়িটাই ভেঙে যায়! তার অবস্থাও তো ভালো নয়। এরই মধ্যে একবার তাকে মেরামত করে নিতে হয়েছে।

হাল ছেড়ে দিয়ে লর্ড গ্লেনারভন মেজাজ খারাপ করে সবাইকে ডেকে ফের ফিরে এলেন তাঁবুতে। একটা জরুরি পরামর্শসভা বসানো ছাড়া এখন আর-কোনো উপায় নেই। তারা এখন যেখানে আছেন সেখান থেকে মেলবোর্ন প্রায় শো-দুয়েক মাইল দূরে, আর টুফোল্ড উপসাগর সে-তুলনায় অনেকটাই কাছে-সত্তর-পঁচাত্তর মাইল দূরে হবে। এখন যখন মোটঘাট নিয়ে পায়দলেই যেতে হবে, তখন কোনদিকে যে যাওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোনো মতই ছিলো না। পায়ে হেঁটে যেতে হবে যখন, তখন টুফোল্ড উপসাগরের দিকেই যাওয়া উচিত।

লেডি হেলেনা বললেন : আমি আর মেরি রোজ কম করেও মাইল-পাঁচেক হাঁটতে পারবো। আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

পাণ্ডয়ল বললেন, একটা-কোনো বড়ো জনপদে গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলেই মেলবোর্নে আমরা খবর পাঠাতে পারবো। চাই-কি, নতুন-কোনো গাড়ি-ঘোড়াও জোগাড় করে নেয়া যাবে। সেদিক থেকে ইডেনে যাওয়াই ভালো। তাহলে টুফোল্ড উপসাগর অন্ধি আর যেতে হয় না।

তার চাইতে, আয়ারটন কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, এখান থেকেই ডানকানে খবর পাঠিয়ে সোজা টুফোল্ড উপসাগরে গিয়েই জাহাজে উঠলে ভালো হয় না কি?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গসের দিকে তাকিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড বললেন, জন, তুমি কী বলো?

টুফোল্ড উপসাগর বেশ-দূরে। অদূর যাবার আর দরকার কী? তার চাইতে ইডেনেই না-
হয় যাওয়া যাক-কিছুটা তাড়াহুড়ো করলে চার-পাঁচদিনেই পৌঁছে যাবো।

যতই তাড়া করুন না কেন, পনেরো-বিশদিনের আগে ওখানে পৌঁছানো যাবে, আয়ারটন
জানাতে।

ঐটুকু রাস্তা যেতে অ্যাডিন লাগবে? লর্ড এডওয়ার্ডের গলার বিস্ময় চাপা থাকেনি।

তার চাইতেও বেশিদিন লাগতে পারে, আয়ারটন সকলের সব আশায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে
দিতে চাচ্ছে, ভিক্টোরিয়ার সবচেয়ে দুর্গম জায়গা দিয়ে যেতে হবে-এখানটায় লোকজন
সাধারণত আসে না-ফলে কোনো রাস্তা তৈরি হয়নি। মনে রাখবেন, আমাদের জঙ্গলের
মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে হবে। চার-পাঁচদিনে যাওয়া মোটেই সম্ভব হবে না।

বেশ-তো, ম্যাঙ্গলস যেন খুব-একটা পাত্তাই দিলেন না, বেশ, তাহলে না-হয় পনেরো-
বিশদিন পরেই ডানকানেটম অস্টিনকে খবর পাঠানো যাবে। আমরা যদি অ্যাডিন দেরি
করতে পারি, তবে এ-কদিনে তেমন-একটা তফাৎ আর কী হবে?

কিন্তু আমি তো সবচেয়ে-বড়ো মুশকিলটার কথা এখনও বলিনি, আয়ারটন আবার
একখানা বিপত্তির কথা তুলেছে, যতদিন-না সব জল নেমে যাচ্ছে, আমাদের তো তদ্দিন
এখানে নদীর ধারেই বসে থাকতে হবে।

বসে থাকতে হবে কেন? ম্যাঙ্গল্‌স একটু অবাক হলেন। নদী কি কাছে কোথাও একটা সরু হয়ে যায়নি যে হেঁটে পেরুনো যায়?

মনে হয় না। সকালে আমি তারও খোঁজ করছিলাম-কিন্তু রাতের বৃষ্টির ঢল নেমে জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে-এতটাই বান ডেকেছে যে জলে কেউ নামলেই কোথায় যে ভেসে যাবে, কেউ জানে না।

লেডি হেলেনা সরাসরি জিগেস করলেন, কিন্তু কত চওড়া এ-নদী? মাইলখানেক তো হবেই-এই তীর থেকে ওই তীর খুব স্পষ্ট দেখা যায়। তার ওপর এমন সাংঘাতিক স্রোত যে-

কিন্তু ভেলা বা ক্যানু তো যাবে, রবার্ট বললে, এখানে তো আর গাছপালার অভাব নেই।

এতক্ষণে একটা কাজের কথা হলো। শুনেই কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স উৎসাহে লাফিয়ে উঠেছেন। রবার্ট ঠিকই বলেছে। হাত-পা গুটিয়ে বসে না-থেকে অন্তত কিছু-একটা তো করা যাবে।

আয়ারটনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন, তুমি কী বলো, আয়ারটন? সেটা করাই তো ঠিক হবে, তাই না?

কিন্তু যা-ই করুন না কেন, এখানে আমাদের অনেকদিন বসে থাকতে হবে-অন্তত যদি-না বাইরে থেকে কোনো সাহায্য আসে

আয়ারটনের কথা শেষ করতে না-দিয়ে একটু উত্ত্যক্ত ভঙ্গিতেই বলে উঠেছেন কাণ্ডেন ম্যাপ্স, সবসময় বাইরের সাহায্যের জন্যে বসে থেকে কী হবে? তোমার মাথায় যদি অন্যকোনো প্ল্যান থাকে তো সেটাই বলো।

সেটাই এতক্ষণ ধরে বলবার চেষ্টা করছি। আমরা যতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবো, ডানকান ততক্ষণে টুফোল্ড উপসাগরে এগিয়ে এলে অনেকটা সময় বাঁচে-আর সবকিছুর একটা হিল্লো হয়ে যায়।

সেই থেকে দেখছি তুমি বারে বারে ডানকানের কথাই তুলছে। কিন্তু তাতে ফায়দাটা কী হবে? সাহায্যটা আসবে কোথেকে? তাছাড়া ডানকানকেই বা আমরা খবর পাঠাবো কী করে?

এমন সোজাসুজি কথাটা বলা হলো যে আয়ারটন একটু খতমত খেয়ে গেলো। কতটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, সেটা সে এতক্ষণে বুঝতে পারলে। একটু দোনোমনা করে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, কী করলে একটু তাড়াতাড়ি ঝামেলাটা মেটে, এতক্ষণ আমি শুধু সে-কথাটাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি গায়ে পড়ে কোনো পরামর্শ দিতে চাইনি, সেই স্পধাও আমার নেই। আপনারা আলোচনা করে যা ঠিক করবেন, তা-ই হবে।

এবার একটু অসহিষ্ণু হয়েই গ্লেনারভন বললেন, কিন্তু সেটা কোনো উত্তর হলো না। আমরা তো আলোচনাই করছিলুম। তোমার কী মত, সেটাই বলল। কী করলে আমরা আপাতত এই সমস্যাটা থেকে উদ্ধার পাই, সেটাই তো ভাবতে হবে-

আমরা এখানেই বসে থেকে বিশ্রাম করি। ততক্ষণে ডানকান টুফোন্ডে এসে আমাদের সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করুক। এখান থেকে কেউ-একজন গিয়ে টম অস্টিনকে খবর দিক। ততক্ষণে আর বৃষ্টি না-হলে নদীর জলও কমে যাবে। তখন না-হয় দেখা যাবে কোনখানে নদী পেরুনো যায়। দরকার হলে তখনই ক্যানু বানিয়ে নেয়া যাবে।

এটা অবশ্য মন্দ বলোনি। দেরি তো এমনিতেই হচ্ছে-তবে মাঝখান থেকে অনেকগুলো ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা যাবে। আমাদের ঘোড়া আর বলদগুলো না-থাকায় সত্যিই তো এইভাবে এতটা পথ হেঁটে-হেঁটে যাবার চেষ্টা করা খুব বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।

এতক্ষণ মেজর ম্যাকন্যাব্‌স একটাও কথা বলেননি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই কথা-কাটাকাটি শুনছিলেন। এবার সকলকে অবাক করে দিয়ে ম্যাকন্যাব্‌স বললেন, হ্যাঁ, এই প্রস্তাবটাই সবচেয়ে-ভালো। আয়ারটন যা বলেছে, আমিও এতক্ষণ তা-ই ভাবছিলুম।

এবার যেন হতভম্ব হওয়ার পালা আয়ারটনের। সে একটু ভাবাচ্যাকা খেয়ে মেজরের মুখের দিকে তাকালে। এতদিন যখনই সে ডানকানের কথা তুলেছে, তখনই মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কোনো-না-কোনো আপত্তি তুলেছেন। অথচ এখন কেমন যেন তড়িঘড়ি বড় চট করেই তার কথায় রাজি হয়ে যাচ্ছেন।

অন্যরাও বেশ অবাক হয়েছিলো। কিন্তু প্রস্তাবটায় মেজর ম্যাকন্যাসের সম্মতি আছে দেখে এই প্রস্তাবটাই গ্রহণ করা হলো। শুধু কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স তখন একটা বাস্তব অসুবিধের কথা তুললেন-আমরা যদি নদী পেরুতে না-ই পারি, তবে টম অস্টিনের কাছে যে যাবে, সে-ই বা নদী পেরুবে কী করে?

আয়ারটন এবার তড়িঘড়ি তার পরামর্শ নিয়ে খাড়া। খামকা কাউকে নদী পেরুতে হবে কেন? আমাদের তো এখনও একটা ঘোড়া আছে। সেই ঘোড়ায় চেপে সে লক্ষ্মী রোডে ফিরে যাবে-সেখান থেকে সোজা চলে যাবে মেলবোর্নে। ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে বেশিদিন লাগবে না। চট করেই পৌঁছে যাবে মেলবোর্ন-সেখান থেকে টুফোল্ডের মুখে আসতে আর ক-দিনই বা লাগবে?

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর ম্যাকন্যাব্স কথাটায় সায় দিলেন। এই কথাটা আগেই আমাদের ভাবা উচিত ছিলো। এতেই সবচেয়ে-তাড়াতাড়ি ঝামেলাটার একটা সুরাহা হবে।

কিন্তু যাবে কে? আমাদের তো কারুই এখানকার পথঘাট জানা নেই, লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন।

আমাকে এই রাস্তা দিয়েই বুনোদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিলো, আয়ারটন বললে, আমি এখানকার রাস্তাঘাট একটু-আধটু জানি। আপনি যদি হুকুম করেন তো আমিই যেতে পারি। একটা চিঠি লিখে টম অস্টিনকে নির্দেশ দিন-একসপ্তাহের মধ্যে ডানকানকে নিয়ে টুফোল্ডের মুখে এসে হাজির হয়ে যাবো।

না-না, তুমি কেন যাবে? আপত্তি তুলেছেন জন ম্যাঙ্গ। তুমি চলে গেলে, ব্রিটানিয়া কোথায় ডুবেছিলো, সে-জায়গাটা চিনিয়ে দেবে কে? অন্তত সে-জায়গাটা শনাক্ত করে দেবার জন্যেও তোমার এখানে থাকা উচিত।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপত্তিটাকে নস্যাৎ করে দিলেন ম্যাকন্যাব্স। না কাপ্তেন, আয়ারটনের প্ল্যানটাই ভালো-সে এখানকার রাস্তাঘাট চেনে, সে চট করে পৌঁছে যেতে পারবে

মেলবোর্নে। তাছাড়া আমরা তো এখন এখানে নদীর জলের শোভা দেখবো, ঢেউ গুনবো আর হাওয়া খাবো-আমরা তো আর এখান থেকে নড়ছি না এখন, যে ব্রিটানিয়া কোথায় ডুবেছিলো সে-জায়গাটা খুঁজতে বেরিয়ে যাবো। সেই-অর্থে, আয়ারটনের তো এখানে কোনো কাজ নেই। সে-ই বরং বার্তাটা নিয়ে যাক।

তাহলে এই কথাটাই ঠিক হলো, লর্ড এডওয়ার্ড বলেছেন, আয়ারটনই যাবে। বলে তক্ষুনি তিনি চিঠি লিখতে বসে গিয়েছেন।

আর, অমনি, পলকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আয়ারটনের মুখ, চোখের তারায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছে। আর-কারু চোখে না-পড়লেও জন ম্যাঙ্গসের সেটা চোখ এড়ায়নি।

লর্ড এডওয়ার্ড যখন চিঠিটার মুসাবিদা করছেন, কাঁধের কাছে মুখ এনে মেজর ম্যাকন্যাব্‌স ফিশফিশ করে বলেছেন তাকে, আয়ারটন বানানটা জানা আছে তো?

বাঃ রে, যা হয়, তা-ই। আ-য়া-র-ট-ন।

না। আমরা বলি আয়ারটন, তবে লেখার সময় বেন জয়েস।

নিচু গলাতেই বলেছিলেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স কিন্তু স্তব্ধ তাঁবুর মধ্যে তবু যেন নামটা গমগম করে বজ্রের মতো ফেটে পড়েছিলো।

হতচকিত, কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই, আয়ারটনের হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে ছোট্ট-একটা আগ্নেয়াস্ত্র, আর রিভলভারটি থেকে পরপর তিনবার গুলি ছুটেছে। গুলি

খেয়ে তক্ষুনি আছড়ে পড়েছেন লর্ড এডওয়ার্ড, কলমটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে।

কিন্তু এই তিনবার-ছোঁড়া গুলির আওয়াজ বুঝি অন্য কোনোকিছুর সংকেতই ছিল-কেননা ঠিক তার প্রতিধ্বনি তুলেই বাইরে পর-পর শোনা গেছে আরো আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ।

ছটোপাটিটা শুরু হবার আগেই আয়ারটন উধাও। কাণ্ডেন জন ম্যাঙ্গল্‌স অন্য মাঝাদের নিয়ে ছুটে গিয়েও আয়ারটনের নাগাল ধরতে পারেননি, তিন লাফেই সে যেন গিয়ে ততক্ষণে পৌঁছেছে বনের পাশে-যেখানে তার সাগরেদরা এতক্ষণ ধরে ইঙ্গিতটারই অপেক্ষা করছিলো।

এই তাঁবুর মধ্যে থাকলে সবাই তাহলে দুশমনদের সহজ-চাঁদমারি হয়ে উঠবে-তাবুটা তাগ কুরেই এই নৃশংস দস্যুগুলো তাহলে মুহূর্মুহ গুলিবর্ষণ করবে।

লর্ড এডওয়ার্ডের প্রাথমিক অপ্রস্তুত অবস্থাটা কেটে যেতেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন-তাঁর আঘাত ততটা গুরুতর নয়, গুলিটা তার কাধ ঘেঁসে আছে, কেননা আয়ারটন তখন গুলি চালিয়েছিলো এলোপাথারি, তাগ ঠিক করবার মতো অবসর পায়নি। আর একমুহূর্তও সবুর করেননি লর্ড এডওয়ার্ড, মেরি আর হেলেনাকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলদে-টানা গাড়িটার পেছনে-গাড়ির ওপরের ছাউনিটা মোটা-মোটা চামড়া আর কাঠে বানানো। অন্য-সবাই ততক্ষণে বন্দুক তুলে নিয়েছেন হাতে, এই দুশমনদের যে-করেই হোক ঠেকাতে হবে। বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা চলবে না।

কয়েক ঝক গুলি ছুটেছিলো, তারপরেই সব হঠাৎ এখন চুপ হয়ে গেছে, সব ঠাণ্ডা, শত্রুদের আর-কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু বনের পাশে সব ভেঁ-ভো, কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই। আয়ারটন অথবা বেন জয়েস-যে-ই হোক না কেন, সে এই ফাঁকে তার তাঁবেদারদের নিয়ে চম্পট দিয়েছে-শুধু বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়াই বুঝিয়ে দিচ্ছে একটু আগেই এখান থেকে গুলি ছুটেছিলো।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তক্ষুনি কাণ্ডনের সঙ্গে ছুটে গিয়েছেন ধাওয়া করে-লড়াইটা সামনাসামনিই হোক, অমন আড়াল থেকে শত্রুর মোকাবিলা করা যাবে না। কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে ছুটে আসতে যতটা সময় লেগেছিলো তাতে শত্রুরা পালিয়েছে।

পালিয়েছে কি না কে জানে। বলেছেন মেজর। হয়তো কোথাও ওৎ পেতে আছে-সুযোগ পেলেই অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে বরং বিপদ আরো বাড়লো। কোথায় কোন কোণ থেকে হামলা আসবে, কে জানে। এ-জায়গাটা তো এদের নিজেদের হাতের চোটোর মতোই চেনা। মুখোমুখি বাঘের সঙ্গে লড়াই করার চাইতে ঘাসের আড়াল থেকে সরসর করে এগিয়ে-আসা সাপের ছোবল ঠেকানো অনেক কঠিন।

আমাদের সারাক্ষণ হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। মেজরের সঙ্গে গাড়িটার পাশে ফিরে আসতে-আসতে বলেছেন কাণ্ডন। সবসময় কাউকে-না-কাউকে পাহারায় থাকতে হবে।

দুজন মাঝাকাকি বনের দিকে কড়ানজর রাখতে বলে তারা তারপর গাড়ির আড়ালে এসেছেন। ততক্ষণে মেরি আর হেলেনা লর্ড এডওয়ার্ডের জখমটার শুশ্রূষা করতে

লেগেছে। আঘাতটা, ভাগিংশ, তেমন-গুরুতর নয়, গুলিটা চামড়া ছড়ে বেরিয়ে গেছে। রক্তস্রাব হচ্ছে, সেটা এস্ফুনি ব্যানডেজ বেঁধে বন্ধ করা চাই।

ব্যানডেজ বাঁধা হয়ে যেতেই মেরি আর লেডি হেলেনাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন। সাবধানে থেকো তোমরা। এই গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে না একবারও। সবচেয়ে-ভালো হতো যদি মাথার পেছনে দুটি করে বাড়তি চোখ থাকতো তাহলে সামনে-পেছনে দু-দিকেই নজর রাখা যেতো। এই রসিকতা করে থমথমে অবস্থাটা একটু হালকা করে দিয়ে তারপর তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন মেজরের দিকে।

একটু আগেই যা ঘটেছে, তার আকস্মিকতায় লেডি হেলেনা একেবারে বোমকে গিয়েছিলেন। ভয় পাবেন বলে, আগে তাকে কেউ পলাতক কয়েদি, রেলগাড়ির হামলা, ইনাম ঘোষণা করে হুলিয়া বেরুনো-এর কোনো কথাই কখনও বলেননি। এখন তাকে সবকিছু খুলে বলতে হয়েছে, একেবারে গোড়া থেকে-অন্তত যতটুকু তাঁরা জানেন।

মেজর আগেকার কথাটা বলতে-বলতে পকেট থেকে বার করে অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড গেজেটের সেই বিশেষ সংখ্যাটা দেখিয়েছেন, যেখানে দুর্ধর্ষ দস্যু বেন জয়েসের পালাবার খবর বেরিয়েছিলো।

আয়ারটনকে আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো-তার হাবভাব খুব-একটা ভালো লাগেনি কখনোই। স্পষ্ট করে কোথাও আঙুল রেখে বলতে পারবো না যে এই একটা খুঁটিনাটি থেকে বুঝতে পেরেছি যে তাকে দেখে যা মনে হয়, সে আসলে তা নয়। কিন্তু কেন যেন তার কোনো কথাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি-একেবারে গোড়া থেকেই। কী

জানি, সন্দেহ করা হয়তো আমার বাতিক। কিন্তু সন্দেহটা পাকিয়ে উঠেছিলো আরো, যখন পর-পর আপাতদৃষ্টিতে কতগুলো তুচ্ছ ব্যাপার নজরে পড়েছিলো। সেই য়েবার গাড়ি সারাই করার জন্যে মিস্ত্রি এনেছিলো আয়ারটন, তখন সন্দেহটা আরো দানা বাঁধে। আমি দেখেছিলুম, গাড়ি সারাতে-সারাতে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে চোখে-চোখে কথা কইছে। তাছাড়া আরো-একটা খটকা ছিলো প্রথম থেকেই। কোনো লোকালয় কাছে এলেই আয়ারটন এড়িয়ে-এড়িয়ে যায় কেন, কেন কোনো গ্রামে বা শহরে ঢুকতে চায় না।

হ্যাঁ, জন ম্যাগস বলেছেন, এটা আমিও খেয়াল করেছিলুম। আয়ারটন সবসময়েই বলতো একজন কারু গাড়ির কাছে থেকে লটবহরের ওপর নজর রাখা উচিত। আর সেই দায়িত্ব সবসময়েই আগবাড়িয়ে সে নিজের কাঁধেই তুলে নিতো।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, জ্ঞানগর্ভ বাণী আউড়েছেন জাক পাঞ্চয়ল, এখন হয়তো তার সমস্ত আচার-আচরণ থেকেই আমরা নতুন-নতুন সব অর্থ নিংড়ে নিতে পারবো।

এই স্বতঃসিদ্ধ আর্ষবচনকে কোনো পাত্রা না দিয়েই মেজর ফের নিজের কথার জের তুলে নিয়েছেন। তাছাড়া আরো-একটা ব্যাপারে আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিলো। ডানকানকে যাতে টুফোল্ড উপসাগরে নিয়ে-আসা হয়, সেজন্যে সে কী-রকম ঘ্যানঘ্যান করতো, মনে আছে? প্রায় যেন জেদ ধরেই বসেছিলো-যে-করেই-হোক, ডানকানকে উপসাগরের মুখে নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, এটা কেউ খেয়াল করেছে কি না জানি না-বলদ আর ঘোড়াগুলোর দেখাশুনো করবার ভার ছিলো ওরই ওপর। অথচ সেগুলো সব পর-পর রহস্যময়ভাবে অজানা কোনো রোগে মারা গেছে!

এত-সব জেনেও আমাদের কাউকে কিছু না-বলা ঠিক হয়েছে? লেডি হেলেনা জিগেস করেছেন।

শুধু সন্দেহের ওপর ভর করে তো কারু দিকে আঙুল তুলে বলা যায় না-তুমি লোকটা খলনায়ক, তোমাকে সবকিছুর কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমাকে বসে থাকতে হয়েছে অকাট্য প্রমাণের জন্যে-আর সব সন্দেহ বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি বলে ক্রমশই আমার অস্বস্তি বেড়েছে। তারপর শেষটায় কালরাতে যখন উটের পিঠে শেষখড় পড়লো, তখন আর আমার সন্দেহ আর নিছক-সন্দেহ থাকেনি-প্রায় হাতে-নাতেই প্রমাণটা পেয়ে গিয়েছিলুম।

কেন? বেশ-কৌতূহলী হয়েই প্রশ্ন করেছেন লেডি হেলেনা।

কাল রাতে বৃষ্টি শুরু হবার আগে, হঠাৎ কেন যেন আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি যে তখন উঠে তাঁবুর বাইরে গিয়েছিলুম, সেটা কেউ জানে না। ফসফর-ফার্নের নীলচে আলোয় দেখি কাদার ওপর আমাদেরই ঘোড়র পায়ের ছাপ দেখে-দেখে চুপিসারে আসছে তিনটে ছায়ামূর্তিগুড়ি মেরে কাছে গিয়ে দেখি সেই-তিনজন ছায়ামূর্তির মধ্যে একজন সেই মিস্ত্রি-সেই-যে লোকটা ভাঙাগাড়ি মেরামত করতে এসেছিলো-ভালো করে তাকিয়ে দেখি লোকটার হাতে কালো-কালো গোল দাগ-সম্ভবত হাতকড়ারই দাগ। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়, এখানে কয়েদিদের হাতে আঁটো করে হাতকড়া পরানো হয়।

রুদ্ধশ্বাসে লেডি হেলেনা বলেছেন : তারপর?

শুনি যে, সেই লোকটাই বলছে-একটা বাদে সবগুলো ঘোড়াই টেশে গিয়েছে। উত্তরে অন্য-কে-একজন বলেছে-মরবে না মানে? এত বিষ হাতিয়ে নিয়ে এসেছিলাম যে একটা গোটা ক্যাভালরির ঘোড়াগুলোকেই খতম করে দেয়া যেতো। তৃতীয় লোকটা তখন বলেছে-বেন জয়েসের এই প্ল্যানটা সফল হলে বলতে হবে যে ওর মতো বাহাদুর কোয়ার্টারমাস্টার আর-কোথাও জন্মায়নি-খোদ ওয়ালটার র্যলেকেও বুদ্ধির খেলায় ও হারিয়ে দিতে পারতো। এ-সব কথা শোনবার পর আমার আর কিছু জানতে বাকি থাকেনি। সব কী-রকম জলের মতো সরল হয়ে এসেছিলো। আয়ারটন কী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো, মনে আছে? সে বলেছিলো, সে নাকি ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টারমাস্টার ছিলো। এরপর আর দুয়ে আর দুয়ে যোগ করতে কত বিদ্যে লাগে? বেন জয়েস তাহলে তারই নাম? দস্যুরা তারপর বনের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই সে ফের ফিরে এসেছিলো তাঁবুতে।

সবকিছু শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছেন সবাই, বাক্যহারা। তারপর প্রায় বারুদে আগুন লাগার মতো করে ফেটে পড়েছেন লর্ড এডওয়ার্ড। নচ্ছার, পাজি, বেইমান! আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে এই জনমনুষ্যহীন অঞ্চলটায় নিয়ে এসেছিলো সব্বাইকে খুন করে সবকিছু লুণ্ঠ করে নিয়ে যেতে-

নিশ্চয়ই তা-ই ওর মৎলব ছিলো।

তার মানে আগের বার সেই নদী পেরুবার সময় থেকেই-যখন ও গিয়ে মিস্ত্রি ডেকে এনেছিলো-ওর সাঙাগুলো আমাদের পিছু নিয়েছিলো।

নিশ্চয়, মেজর বলেছেন, এখন আর এতে কোনো সন্দেহই তো নেই!

বিলজিবাবের বাচ্চা! তাহলে ও কোনোকালেই ব্রিটানিয়ায় কোনো কাজ করেনি। শুধু আমাদের ভাটকি দিয়েছে অ্যাদিন!

না, এ-ব্যাপারটায় বোধহয় ধাপ্লা দেয়নি। আমার মনে হয়, ব্রিটানিয়ায়ও নিশ্চয়ই কখনো-না-কখনো কাজ করেছিলো। না-হলে কাণ্ডেন গ্রান্টের কথা ও জানলো কী করে। আমার তো মনে হয়, আয়ারটনই ওর আসল নামবেন জয়েস ওর ছদ্মনাম-হয়তো আরো-অনেক নাম আছে লোকটার-

তাহলে ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টারমাস্টার সেজে সে অস্ট্রেলিয়ায় আসে কী করে?

সেই ধাঁধার উত্তর গোয়েন্দারাও খুঁজে পায়নি। হয়তো পরে কোনোদিন সব ফাঁস হয়ে যাবে। জানা যাবে, ও কীভাবে এখানে এসেছিলো।

কাণ্ডেন ম্যাপ্‌লস বললেন, গোয়েন্দারা আর কতটুকুইবা জানে? তারা কি

এটা জানে যে আয়ারটন আর বেন জয়েস আসলে একই লোক?

তার মানে-ও যে খামারে কাজ নিয়েছিলো, সেটা কোনো বদ মৎসব নিয়েই? জিগেস করেছেন লেডি হেলেনা।

সেখানেও নিশ্চয়ই কিছু-একটা বিষম গোল বাঁধাবার তালে ছিলো-হঠাৎ আমরা গিয়ে পড়ায় তার চেয়েও বড়ো-একটা প্রলোভন পেয়ে গেছে!

মিস গ্রান্ট, কেমন উৎকর্ষিত স্বরেই জিগেস করেছেন কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল, মিস গ্রান্ট, আপনাকে অমন অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?

কাণ্ডেনের কথায় অমনি সকলের চোখ গিয়ে পড়েছে মেরির ওপর। তার মুখ শুকিয়ে আমশি হয়ে গিয়েছে। এক্ষুনি যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবে-মনে হয়েছে সকলের।

মেরি ধরাগলায় শুধু বললে, তাহলে বাবা-

মেরির এই কথাটায় আবার সবাই যেন একঝটকায় বাস্তবের মধ্যে ফিরে এলো। আয়ারটন যদি বেন জয়েস হয়, তাহলে কাণ্ডেন গ্রান্টকে খুঁজে পাবার যে-আশাটা ছিলো, সেটা এখন গেলো। ব্রিটানিয়া মোটেই টুফোল্ড উপসাগরের মুখে ঝড়ের পাল্লায় পড়েনি, সে যে কোথায় ডুবেছে কে জানে, অর্থাৎ কাণ্ডেন গ্রান্ট মোটেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা দেননি।

অর্থাৎ আবারও একবার চিরকুটগুলো পড়ে ভুল-একটা মানে বার করেছেন জাক পাঞ্চওয়ল-তার এত পাণ্ডিত্য কোনো কাজেই তাহলে এলো না! এবার মুখ শুকিয়ে গেলো স্বয়ং জাক পাঞ্চওয়লের।

মেরির জন্যে সকলেরই কেমন মায়া হচ্ছিলো, কিন্তু সবজান্তা পাঞ্চওয়লের মুখচোখ দেখেও মায়াই হয়েছে সকলের। বেচারি তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি, মাথাখাঁটিয়ে কোনো-একটা অর্থ তত বার করেছেন-যতটা তার বুদ্ধিতে কুলিয়েছে।

লর্ড এডওয়ার্ড গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন তারপর। সম্ভবত বুঝতে পারেননি মেরিকে এখন কী বলে সাক্ষ্য দেবেন। বাইরে এসে দ্যাখেন, মাঝাদের দুজন রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

এদিকে মেঘ কেটে গিয়ে আলো করে এসেছে তখন-কত নাম-না-জানা পাখির কলরব উঠেছে গাছের ডালে। ঐ-যে, একটা ক্যাঙারু লাফাতে-লাফাতে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলো, ছানা-রু তার বুকপকেট থেকে মুখ বার করে চারিদিক সাগ্রহে দেখে নিচ্ছিলো। ক্যাঙারুর নিশ্চিত ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেলো, আশপাশে নিশ্চয়ই কোনো মানুষ নেই-বেন জয়েস নিশ্চয়ই তার সাজোপাজদের নিয়ে দূরে-কোথাও কেটে পড়েছে। সম্ভবত মাত্র এই কজন অনুচর নিয়ে সে এখন কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে চায় না। সম্ভবত গেছে দলের বাকি লোকগুলোকে নিয়ে আসতে-তারপর এসে রাতের আঁধারে শিবিরটার ওপর চড়াও হবে।

রাগে লর্ড এডওয়ার্ডের সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিলো। পতঙ্গদের বিলজিবাবের এমনতর কোনো সুসন্তানের সঙ্গে এর আগে এমনভাবে তার কখনও দেখা হয়নি।

আশপাশে একটু টহল দিয়ে তারপর তিনি ফিরে এসেছেন অন্যদের কাছে।

অন্যরা সেখানে বসে-বসেই তখনও উত্তেজিতভাবে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। লর্ড এডওয়ার্ডকে দেখেই কাণ্টন ম্যাঙ্গলস বলে উঠেছেন; আমাদের কিন্তু এখন হাত-পা গুটিয়ে অসহায়ভাবে বসে থাকলে চলবে না। এখানে এই মাউন্ট কশাচিউস্কোর আশপাশে হা করে বসে থেকে আমাদের কী হবে?

তুমি তাহলে কী করতে বলো আমাদের? এখানে বরং রাত্তিরে কখনও বেন জয়েসের হামলার মুখে পড়তে হবে আমাদের। তার চেয়ে বেন জয়েস যা করতে যাচ্ছিলো, ঠিক তা-ই করা দরকার আমাদের?

অর্থাৎ?

ঘোড়া তো একটাই আছে এখনও। সেটায় করে কেউ-একজন এম্ফুনি মেলবোর্নের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ুক-তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে-সাত থেকে দশদিনের মধ্যে-ডানকানকে ডেকে নিয়ে আসুক টুফোল্ডের মুখে!

ম্যাঙ্গল্‌স ঠিকই বলেছেন। এম্ফুনি একটা-কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

জ্যাস্ত ঘোড়া যেহেতু মাত্র একটাই, অতএব মাত্র একজন ছাড়া আর-কারু যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যাবার কথায় কিন্তু সকলেই লাফিয়ে উঠেছেন-এমনকী রবার্টের উৎসাহটাই মনে হচ্ছিলো সবচেয়ে-বেশি। প্রত্যেকেই পারলে যেন তম্ফুনি ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগ-টগবগ করে মেলবোর্ন চলে যাবে। এই নিয়ে এমন তর্কাতর্কি বেঁধে গেলো যে লেডি হেলেনার প্রস্তাব হলো লটারি করেই না-হয় ঠিক করা হবে কে যাবে। শেষপর্যন্ত সেই প্রস্তাবটাই মেনে নিয়েছে সবাই। আর লটারিতে শেষটায় নাম উঠে গেলো মাল্লাদের মধ্যে একজনের। ঠিক হলো, খাওয়াদাওয়ার পর রাত আটটাতেই সে বেরিয়ে পড়বে।

যাত্রার যখন প্রস্তুতি চলেছে, তখন মেজর ম্যাকন্যাবস সবাইকে ডেকে আরেকটা বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

মনে আছে, ঘোড়াগুলোয় কী-রকম বিশেষ জাতের নাল পরানো হয়েছিলো?

হঠাৎ এ-কথা শুনে একটু বুঝি হতভম্বই হয়ে গেছে সবাই।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স নিজেই তারপর হেঁয়ালিটার সমাধান করে দিয়েছেন। ঐ বিশেষ নাল পরানো হয়েছিলো এই জন্যে যাতে ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখে-দেখে বেন জয়েসের লোকেরা জেনে নিতে পারে আমরা কোথায় কোথ দিয়ে যাচ্ছি। এখনও নিশ্চয়ই এরা আমাদের ওপর কড়া নজর রেখে যাচ্ছে। আয়ারটন তো জানেই যে আমাদের এখনও একটা সতেজ ঘোড়া রয়ে গেছে-সেটাতে করেই তার মেলবোর্ন যাবার কথা হচ্ছিলো। তারা নির্ঘাৎ টের পেয়ে যাবে যে আমরা নিশ্চয়ই কাউকে মেলবোর্ন পাঠাবো আর তার পেছন নিতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না-ঐ ঘোড়ার নালের ছাপ দেখে-দেখেই তারা ব্যাপারটা জেনে যাবে। কাজেই আমাদের পক্ষে উচিত হবে ঐ বিশেষ মার্কামারা নালটা খুলে ফেলে নতুন-কোনো নাল পরিয়ে-দেয়া। তা না-হলে কারু পক্ষেই আর মেলবোর্ন যাবার মানে হয় না-পথেই তারা তার ওপর হামলা চালাবে।

মেজর ম্যাকন্যাসের কথা শুনে আশঙ্কাটা যে একেবারেই অমূলক নয়, এটা বুঝতে কারুই আর দেরি হয়নি। তক্ষুনি ঘোড়ার খুর থেকে বিশেষ মার্কার নালগুলো খুলে ফেলে নতুন নাল লাগিয়ে দেয়া হলো, যাতে দস্যুদল কিছুতেই ঘোড়সোয়ার যে কে, কাদের জন্যে সাহায্য আনতে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে না-পারে!

কিন্তু তখনও সবচেয়ে-জরুরি কাজটাই বাকি ছিলো। টম অস্টিনকে একটা চিঠি লিখতে হবে। এতক্ষণ উত্তেজনায় লর্ড এডওয়ার্ড তাঁর কাঁধ আর হাতের ব্যাথাটাকে তেমন

আমল দেননি-এখন লিখতে বসে আবিষ্কার করেছেন হাতটা একটু নাড়লেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। দু-একবার যখনই চেষ্টা করতে গেছেন, তখনই তার মুখে ফুটে উঠেছে বিষম যন্ত্রণার ছাপ। শেষটায় পাএয়লই বসেছেন তার হয়ে চিঠিটা লিখে দিতে-লর্ড এডওয়ার্ড মুখে-মুখে বলে যাবেন চিঠির বক্তব্য, আর পাএয়ল তা-ই শুনে গুছিয়ে লিখে দেবেন। কিন্তু পাএয়লের মন তখন যে কোথায় পড়ে ছিলো, কে জানে। তখনও তিনি ভেবে চলেছেন বোতলে পাওয়া চিরকুটগুলোর মানে কী হতে পারে-আবারও তাহলে তিনি চিরকুটগুলোর সত্যিকার-মানে বুঝতে পারেননি। অন্যমনস্কভাবে লিখতে বসে প্রথমে খানিকক্ষণ কাগজ-কলমের সামনে তিনি হাঁ করে বসে থেকেছেন, লর্ড এডওয়ার্ড তাকে যা লিখতে বলছিলেন, তার কিছুই যেন তার কানে ঢুকছিলো না।

লর্ড গ্লেনারভনও আবারও বলেছেন, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই : কী হলো? লিখুন

অ্যাঁ? বলে মঁসিয় পাএয়ল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছেন তার মুখের পানে।

লিখুন যে : টম অস্টিনকে জানানো হচ্ছে, এই এভেলাপাবামাত্রই যেন ডানকানকে নিয়ে-

এ-তো মহামুশকিল হলো। মঁসিয় পাএয়ল এখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন সামনে পড়ে-থাকা অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড গেজেট-এর সংখ্যাটার দিকে। ভাজ-করা কাগজটার নামটার শুধু একটা টুকরোই পড়া যাচ্ছে।

কী হলল, মঁসিয় পাএয়ল? লিখুন—

ও-হ্যাঁ, লিখছি। কিন্তু...অ্যালাভ...অ্যালাভ...অ্যালাভ? অ্যালাভ মানে? তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আবার কেমন হতভম্বভাবে তিনি বসে পড়েছেন।

হ্যাঁ, বলুন কী লিখতে হবে—

টম অস্টিনকে জানানো হচ্ছে, এই এভেলাটা পাবামাত্র যেন ডানকানকে নিয়ে এক্সুনি যেন অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে চলে আসে।

অস্ট্রেলিয়া? আবার কেমন যেন ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে গেছেন সিয় কয়ল! ও-হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া!

কলের পুতুলের মতো চিঠিটা কোনোমতে লিখে শেষ করেছেন সিয় পাওয়েল, তারপর লর্ড এডওয়ার্ডকে দিয়েছেন চিঠিটায় সই করবার জন্যে। অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে, কোনোরকমে নিজের নামটা সই করেছেন। লর্ড এডওয়ার্ড। তারপর চিঠিটা ভাজ করে যথারীতি সীলমোহর করে দেয়া হয়েছে। আর কম্পিতহাতে লেফাফায় ঠিকানাটা লিখেছেন মঁসিয় পাওয়েল :

মিস্টার টম অস্টিন, বরাবরেযু
ফাস্টমেট, ডানকান
মেলবোর্ন

তারপরেই ধড়মড় করে উঠে পড়ে বেরিয়ে গেছেন বাইরে, তখনও বিড়বিড় করে তিনি বকে যাচ্ছেন অদ্ভুত-একটা শব্দ : অ্যালাভ...অ্যালাভ...আল্যাভ!

মঁসিয় পাঞয়লের খ্যাপামির ধরনধারণ অ্যাদিনে সকলেরই বেশভালোভাবে জানা হয়ে গেছে। ফলে তার দিকে আর আলাদা নজর না-দিয়েই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কখন অন্ধকার হয়, কখন দূত রওনা হবে মেলবোর্নের উদ্দেশে। সাবধানের মার নেই ভেবে শুধু-যে ঘোড়ার পায়ে নালগুলোই বদলে দেয়া হয়েছে তা নয়, ক্ষুরগুলো বেঁধে দেয়া হয়েছে কাপড় দিয়ে যাতে ছোটবার সময় খটাখট আওয়াজ না-হয়।

কিন্তু এতসব সাবধানতা সত্ত্বেও কি আর আশঙ্কাটা কমে? রাতের আঁধারে কোনখানে যে বেন জয়েস (না কি সে আয়ারটন?) তার সাগরেদদের নিয়ে ওৎ পেতে আছে, তা কে জানে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘোড়াটা যেতে পারলে হয়। আবার বইতে শুরু করেছে ঝোড়োহাওয়া, আর বানভাসি নদীটার জলে প্রখর ঢেউয়ের আওয়াজও উঠছে তার সঙ্গে তাল রেখে। আর তারই সঙ্গে ছন্দমিলিয়ে যেন বুকে টিপটিপ শব্দ বেড়ে যাচ্ছে। আটটার পরেই অন্ধকার লক্ষ করে ঘোড়াটা যখন ছুটে চলে গেলো, তখন রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠার সঙ্গে সবাই প্রার্থনা করছেন, যাত্রাটা যাতে নির্বিঘ্নে হয়। আর ঠিক এমন সময়েই বুকের টিপটিপ শব্দ আরো বেড়ে গেছে, যখন হাওয়ার শোঁ-শোঁ আর জলের ছলছল ছাপিয়ে ভেসে এসেছে তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ। শিসের শব্দই তো? না কি পাখির ডাক?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গস বলেছেন, সন্দেহ নেই, কেউ কাউকে এই তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে যেন সংকেত দিচ্ছে। তার অনুমানটা ভুল নয়, যেন সেটা বোঝাতেই দ্বিতীয় আরেকবার সব শব্দ ছাপিয়ে আবার রাতের অন্ধকার চিরে গেছে সেই শিসের আওয়াজ। আর তাপরেই দূর থেকে ভেসে এসেছে গুলির আওয়াজ-ঠিক যেদিকটায় ঘোড়াটা গেছে, সেদিক থেকে।

তার মানে-নিশ্চয়ই তার কোনো বিপদ হয়েছে!

লর্ড এডওয়ার্ড কী-রকম ক্ষিপ্ত জ্বরাতুর ভঙ্গিতে সেই গুলির শব্দের দিকেই ছুটে যেতে চাচ্ছিলেন, কোনোরকমে তাকে আটকে রেখেছেন মেজর ম্যাকন্যা।

এটা তো একটা ফাঁদও হতে পারে! ওরা হয়তো মংলব এঁটেছে যে গুলির আওয়াজ পেয়ে সবাই সেদিকটাতেই ছুটে যাবেন-আর এই ফাঁকে ওরা ছুটে এসে অরক্ষিত গাড়িটায় মেয়েদের ওপর হামলা চালাবে-

কাপ্তেন ম্যাক্সও সায় দিয়েছেন। এই পাজির পাঝাড়াগুলো হয়তো এ-রকমই একটা ফন্দি করেছে। দিনের আলো ফোটবার আগে কিছুই বোঝা যাবে না। আমাদের বরং এখানে আরো-হুঁশিয়ার হয়েই থাকা উচিত

লর্ড এডওয়ার্ডের গায়ে যেন মত্ত হাতির বল। তিনি এসব কথা শুনলে তো? কোনোরকমে ধস্তাধস্তি করে তাকে আটকে রেখেছেন মেজর ম্যাকন্যাব্স, আর এমন সময়ে কানে ভেসে এলো কার যেন কাতর আর্তনাদ-কে যেন অন্ধকারের মধ্যে গোঙাচ্ছে :

বাঁচাও! বাঁচাও!

এই গোঙানিটা শোনবার পর মনস্থির করতে আর একফোঁটাও দেরি হয়নি কারু। সেই আর্তনাদের শব্দ শুনেই সেদিকপানে ছুটে গিয়েছেন মেজর, আর তার পেছন-পেছন কাপ্তেন। ঐ তো ঝোঁপের মধ্য থেকে কে যেন কাত্রাত-কাত্রাতে প্রায় গড়াগড়ি দিতে-দিতেই বুকে হেঁটে আসছে।

হ্যাঁ, তাঁদের সেই দূত। রক্তে তার সারা শরীরটা ভেসে যাচ্ছে। পিঠে আমূল বিধে আছে একটা ছোরা।

অমনি তাকে তারা ধরাধরি করে নিয়ে এসেছেন গাড়ির ভেতর। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে, ছুরিটা বাঁটশুদ্ধ বসানো; সে-যে বাঁচবে-এমন মনে হয়নি। কীরকম নিস্তেজ হয়ে পড়ে থেকেছে বেচারি, আর কী-রকম যেন অস্ফুটস্বরে জড়ানো গলায় আত্ননাদ করে বলেছে : চিঠি...চিঠি...বেন জয়েস! তারপরেই সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থেকেছে। লেডি হেলেনা আর মেরি তবু তার শুশ্রূষা করে গেছেন-ক্ষতটায় কোহল দিয়ে পরিষ্কার করে তাতে বেঁধে দেয়া হয়েছে ব্যানডেজ। আর তারই মধ্যে তার পকেট হাড়ে দেখেছেন কাণ্ডন ম্যাঙ্গ। না, টম অস্টিনকে লেখা চিঠিটা তার কাছে নেই।

ভোরের আলো ফুটলে একবার সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছেন মেজর ম্যাকন্যা। তার মুখে গভীর কালোছায়া, কপালে চিন্তার ভাঁজ। আর ঝোপের পাশে তিনি আবিষ্কার করেছেন দস্যুদের দুজনের মৃতদেহ-কাণ্ডন ম্যাঙ্গসের মাল্লা যে ছোরার ঘা খাবার আগে যুঝেছিলো প্রাণপণে, এ তারই প্রমাণ। দস্যুদের দুজনের মধ্যে একজন চেনা-সেই মিস্ত্রি, আয়ারটন যাকে গিয়ে নিয়ে এসেছিলো সে-বার।

আরো-খানিকক্ষণ পরে মাল্লাটির জ্ঞান ফিরে এলো, কিন্তু অবিশ্রাম রক্তক্ষরণে এখনও কী-রকম যেন নেতিয়ে আছে সে। ভাঙা-ভাঙা দু-চার কথায় সে যা বললে, তার সারমর্ম দাঁড়ালো এইরকম : সে যখন অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা দূর গেছে, তখনই হঠাৎ তার দু-পাশে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে দস্যুরা। সে এলোপাথারি গুলি করে শুধু

দুজনকেই ঘায়েল করতে পেরেছিলো, কিন্তু কে যেন পেছন থেকে তার পিঠে সজোরে ছুরি বসিয়ে দেয়। অমন ভয়ংকর আঘাত খেয়ে আর সে তাদের কোনো বাধা দিতে পারেনি। দস্যুরা নিশ্চয়ই ভেবেছিলো যে সে বুঝি খতম হয়ে গেছে। তার পকেট হাড়ে তারা শুধু চিঠিটা বার করে নেয়।

দেখি, দেখি, চিঠিটা, বলেছিলো বেন জয়েস-অথবা সে কি আয়ারটন? এবার আমাদের আর পায় কে? আমরাই ঐ ডানকান জাহাজের মালিক হয়ে বসবো। আমি এই ঘোড়ায় চেপেই ডানকানে চলে যাচ্ছি-তোমরা বরং চলে যাও টুফোল্ড উপসাগরের মুখে, কেম্পল পায়ার ব্রিজের কাছে। ডানকান একবার আমাদের দখলে এলেই জগৎ জানতে পারবে জলদস্যু কাকে বলে-ওয়ালটার র্যালে আর ফ্রান্সিস ড্রেকও আমাদের কাছে হার মেনে যাবে!

বলেই, সে আর একটুও দেরি করেনি, ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলো অন্ধকারে।

এই আশঙ্কাটাই করেছিলেন সবাই। ফলে, পুরো ব্যাটারটা যে অপ্রত্যাশিত, সেটা বলা যায় না। কিন্তু তবু বাস্তব তার আঘাতে কেমন যেন ঘায়েলই করে ফেলেছিলো লর্ড এডওয়ার্ডকে, বলে উঠেছিলেন : ডানকান কি না শেষকালে জলদস্যুদের দখলে চলে যাবো!-

হঠাৎ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন মঁসিয় পাওয়ল। ককখনো নয়। বেন জয়েসের দলবল টুফোল্ডের মুখে পৌঁছবার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাবে।

কেমন করে?

কেন? রাস্তাটার কথাটা তত বেন জয়েসই ফাঁস করে দিয়ে গেছে। ঐ কেম্পল পায়ার ব্রিজ দিয়ে। ব্রিজটা তো এখান থেকে কয়েক মাইল মাত্র দূরে-এক্ষুনি গিয়ে দেখে আসছি নদীতে বান ডাকলেও ব্রিজটা এখনও অটুট আছে কি না।

এবং যেমন কথা, তেমনি কাজ। কাপ্তেন ম্যাঙ্গকে নিয়ে তক্ষুনি অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছেন মঁসিয় পাঞয়ল।

ফিরে যখন এসেছেন, তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

এবং ফিরে এসেছেন হতাশ ও বিধ্বস্ত। বানের জল ফেনিয়ে চর্কি দিয়ে ছুটেছে-কিন্তু ব্রিজটার কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। দস্যুরা নিজেরা নদী পেরিয়ে যাবার পর সেতুটায় আগুন ধরিয়ে গেছে-আর ধ্বংসের কাজটা সাঙ্গ করেছে দুরন্ত ক্ষিপ্ত বানের জল ও!

এবার তাহলে বুঝি বোম্বটেদের হাত থেকে ডানকানকে আর বাঁচানো গেলো না।

কাপ্তেন গ্রান্টের হৃদিশ করার চাইতেও এখন সবচেয়ে-জরুরি যে-করেই হোক, এখান থেকে সবচেয়ে কাছের কোনো লোকালয়ে গিয়ে ডানকানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা। নিজেদের অসহায় অবস্থায় সবচেয়ে-বেশি ভেঙে পড়েছেন লর্ড গ্লেনারভনই। তার এত-সাধের ডানকান কি না শেষটায় জলদস্যুদের কবলে গিয়ে পড়বে।

মেজর ম্যাকন্যাব্স আর কাণ্ডেন ম্যাঙ্গস যতই তাকে সাহায্য দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করুন না কেন, তারাও এই বিষম সঙ্কট অবস্থায় প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। অসহায় আক্রোশে নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর-কিছুই যেন তাদের করার নেই।

শেষচেষ্টা অবশ্য একটা করে দেখতেই হয়। পরদিন ভোরবেলাতেই কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স তার লোকজন নিয়ে একটা ভেলা তৈরি করার কাজে লেগে গেলেন। কাঠের গুঁড়ি আর গাছের বাকল আর দড়ি দিয়ে বেঁধে কোনোরকমে যদি একটা ভেলা তৈরি করে ফেলা যায়, তবে এই বানের জলে ভেসে গিয়ে তারা কোনো লোকালয়ে পৌঁছে যাবেন।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথম ভেলাটা বোধকরি পলকাই হয়েছিলো খুব-মোটাই পোক্ত ছিলো না। জলে নামতে-না-নামতেই সেটা ঐ তীব্র স্রোতের আবর্তে পড়ে ভেঙে গেলো।

শেষকালে আরো-মজবুত করে আরো-একটা ভেলা বানানো হলো-আর একুশে জানুয়ারি স্রোতের তোড় যখন খানিকটা কমেছে, লর্ড এডওয়ার্ড তার সঙ্গীদের নিয়ে তাতেই উঠে বসলেন। গাড়িটা পড়ে রইলো ঐ বনের পাশে, কাদার মধ্যে। সঙ্গে নেয়া হলো সামান্য যা খাবারদাবার ছিলো, আর অস্ত্রশস্ত্র।

কিন্তু স্রোতের মুখে যেন খড়কুটোর মতোই ভেসে গেলো তাদের ভেলা। যতই মজবুত করে বানাবার চেষ্টা করুন না কেন, মাঝনদীতে সেটা বুঝি এবারও ভেঙে যায়। গাছের গুঁড়িগুলো যেন দড়ির বাঁধন খুলে আলাদা হয়ে যাবে। কোনোরকমে যখন ওপারে পৌঁছানো গেলো, তখন তারা ধুকতে-ধুকতে কোনোমতে শুধু নিজেদেরই বাঁচাতে পেরেছেন। খাবারদাবার খুব-একটা বাঁচানো গেলো না, অস্ত্রশস্ত্রও না-শুধু মেজর

ম্যাকন্যাসের রাইফেলটা তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করেননি-সেটা যেন ছিলো তার নিজের শরীরটারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই তারা যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তীরে নেমে পড়তে পেরেছেন, সেটাই যেন অনেকখানি।

তারপর যেমন করে যে তারা শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন বিধ্বস্ত দেহে টুফোল্ড উপসাগরে মুখ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ডেলিগেট নামে একটা ছোট অজপাড়াগাঁয় এসে পৌঁছেছেন, সে-কথা তারা যেন নিজেই জানেন না।

সেখানে সরাইতে যখন সবাই খেয়েদেয়ে কোনোরকমে বিধ্বস্ত দেহে একটু প্রাণের সাড়ি ফিরে পেয়েছে, লর্ড এডওয়ার্ড সরাইখানার মালিককে জিগেস করেছেন কোনো ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যাবে কি না।

এমনিতে কোনো গাড়ি পাবেন না। তবে ডাকের গাড়ি ছাড়বে আজ-সেটায় যেতে পারেন, সরাইগুলো বলেছে।

সেটাতেই যাবার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু দু-দিন দু-রাত যখন একটানা চলে ডাকের গাড়ি সাইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরে সমুদ্রের কাছে পৌঁছুলো, তখন

কোথায় ডানকান?

শুধু ক্ষিপ্ত সমুদ্র গর্জাচ্ছে সেখানে, দিগন্ত অন্ধি সব ফাঁকা। কোথাও কোনো জেলেডিঙিরও দেখা নেই, কোনো জাহাজ তো দূরের কথা।

তবে কি টম অস্টিন সোজা টুফোল্ডের মুখে ইডেনেই চলে গিয়েছে?

ডাকের গাড়ি তক্ষুনি ছুটেছে ইডেনে। কিন্তু সেখানেও ডানকানের চিহ্নমাত্রও সেই।

একটা সরাইতে উঠেই লর্ড গ্লেনারভন প্রথমেই গেছেন ডাক-তারের আপিশে। মেলবোর্নে টেলিগ্রাম করা হলো-ডানকান কোথায় গেছে, এক্ষুনি তার করে জানাতে বলেছেন তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষকে।

তারপর সময় যে আর কাটাতে চায়নি। শুধু অস্থির হয়ে খ্যাপা বাঘের মতো ছটফট করেছেন লর্ড এডওয়ার্ড।

টেলিগ্রামের উত্তর এলো দুপুর গড়িয়ে যাবার পর, বেলা দুটোয়।

লর্ড এডওয়ার্ড গ্লেনারভন

ইডেন

টুফোল্ড উপসাগর

১৮ জানুয়ারি ডানকান মেলবোর্ন থেকে রওনা হয়েছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। একটু অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ নোঙর তুলে বারদরিয়ায় চলে গিয়েছে।

উটের পিঠ যদি আরো-মজবুত হতো, তবু বোধহয় এই শেষখড়টাকে আর বইতে পারতো না-ঘাড়মুখ গুঁজে ছেড়ে পড়ে যেতো। এবার সত্যি-সত্যি আক্ষরিকভাবেই মাথায়

ইন সার্চ অফ দ্য বস্ট অ্যাণ্ডিয়েজ । ডুল ভান্ অমনিবাস

হাত দিয়ে বসলেন লর্ড গ্লেনারভন । আশঙ্কাটা তাহলে সত্যি হলো শেষপর্যন্ত । ডানকান
তবে বেন জয়েসের হতে পড়ে শেষটায় বোম্বটে জাহাজ হয়ে গিয়েছে ।

তাহলে এখন কাণ্ডেন গ্রান্টের খোঁজে তারা যাবেন কী করে? মেরি আর রবার্টকে তবে
এখন কী বলবেন লর্ড গ্লেনারভন?

তৃতীয়

রান্সসমুলকের শাদা শয়তান

এক

সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর

এ-কদিন যেন একটা ঘোরের মতো কেটেছে। দুঃস্বপ্নের ঘোর।

সে-ইযখন আয়ারটনের খোলশটা খুলে বেরিয়ে এসেছেকুখ্যাতদস্যু বেনজয়েস, যার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে, সেই যার সম্বন্ধে এতগুলো কথা বলে গেলেন মেজর ম্যাকন্যা, তারপর থেকে মেরি যেন আচ্ছন্নের মতোই হয়ে গিয়েছিলো। সেবাশুশ্রষায় সে সাহায্য করেছে লেডি হেলেনাকে, প্রথমে লর্ড গ্লেনারভনের শুশ্রষা, আর তারপর ঐ মান্নাটি যখন ফিরে এলো, প্রায় হতচৈতন্য, ক্ষত থেকে অনর্গল রক্ত বেরুচ্ছে, পিঠে ছুরি-বেঁধা, তখন তাকেও শুশ্রষা করেছে মেরি, লোকটা মনে হচ্ছে এ-যাত্রায় যেন বেঁচেই গেলো, এমনই তার কচ্ছপের প্রাণ, কিন্তু সারান্ধণ মেরির মনে হচ্ছিলো সে যেন একটা কলের পুতুল। চারপাশে কোথায় কী হচ্ছে, সে যেন সব চোখে দেখে যাচ্ছে, অথচ কিছুই খেয়াল করছে না, কিছুই যেন তার আচ্ছন্ন মনটায়, কোনো দাগ কেটে যেতে পারছে না। কেউ যদি তাকে জিগেস করে, এর পর কী-কী ঘটেছে, কোথায়-কোথায় গেছেন অভিযাত্রীদল, কী-কী করেছেন, তবে সে সম্ভবত কিছুই তার গুছিয়ে বলতে পারবেনা, অথচ সে সবসময়েই দলের সঙ্গে ছিলো, সবাই যা-যা করেছে সেও সে-সমস্তই করেছে, কিন্তু স্বপ্নে যেমন হড়বড় করে কত-কী ঘটে যায় অথচ তারপর তার ঝাপসা স্মৃতি ছাড়া আর-কিছুই

থাকে না, ঠিক তেমনি হয়েছে তার-সবসময়েই মনে হয়েছে অ্যাদিন তারা কোন বুনোহাঁসের পেছনে ছুটছিলো, কিন্তু এখন সেই বুনোহাঁস আর কোথাও নেই-সেও কোন দূরে দিগন্তের পরপারে মিলিয়ে গেছে।

আর তারপর-এখন-এখন এই কাণ্ড। ডানকান জাহাজ গিয়ে পড়েছে বেন জয়েসের হাতে, লর্ড গ্লেনারভনের এত-সাধের ডানকান; আর তারা যে সেই ডানকাননিয়ে সাতসমুদ্রতেরোনদী পেরিয়ে দু-দুটো মহাদেশ পেরিয়ে, এক গোলাধ থেকে অন্য গোলাধে এসে পড়েছে, সে তো তারই জন্যে, না, শুধু তার নয়, রবার্টও আছে, আর আছে সেই-কবে শেষ-যাঁকে দেখেছিলো সেই বাবার স্মৃতি, কাপ্তেন গ্রান্টের স্মৃতি।

আর কী হবে এখন মিথেমিথি এই দুরাশার পেছনে ছুটে? মেরিকে যেন একটা হালডাঙা ভেলার মতো দেখাচ্ছিলো, সেই-যে ভেলাটায় করে তারা পাড়ি জমিয়েছিলো কদিন আগেই ঐ বানভাসি নদীতে, আর জলের তোড়ে যে-ভেলা ভেঙে গিয়েছিলো, সে যেন এখন সেইরকমই এক ভেঙেপড়া ভেলা। কেউ যদি তাকে জিগেস করে তার মনের অনুভূতিগুলোকে পর-পর সাজিয়ে বলতে, তবে তাও সে পারবে না, শুধু-একটা হালছাড়া হতাশ আচ্ছন্নভাব, তা ছাড়া আর কিছুই না।

আর নিশ্চয়ই সেইজন্যেই প্রস্তাবটা প্রথমে এলো মেরির কাছ থেকেই। ধরাগলায় থেমে-থেমে সে যা বললে, তার সারমর্ম হলো : আর কেন, ঢের তো হলো, এবার বরং ফিরেই যাওয়া যাক ইওরোপে। আয়ারটনের সঙ্গে আচমকা ঐ খামারে দেখা হবার পর দপ করে নতুন-একটা আশা জ্বলে উঠেছিলো মনে, আর এ-যেন ঠিক দীপ নেভবার আগে শিখা যেমন দপদপ করে, অনেকটা সেইরকম। এখন তো বোঝাই যাচ্ছে আয়ারটন তাদের

ধাক্কা দিয়েছিলো, হতভাগা ফেরেবাজ, সে সম্ভবত কোনোদিনই চিনতে না কাপ্তেন গ্রান্টকে। শুধু কতকগুলো জনরব শুনেছে ব্রিটানিয়া সম্বন্ধে আর নয়তো হয়তো সত্যিকার-আয়ারটন, এই বেন জয়েস-আয়ারটননয়, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কোথাও এই জঙ্গলে সবই সম্ভব, তারপর তার কাগজপত্রর হাতিয়ে নিয়ে এসেই শেষে তা তাদের দেখিয়েছে তাদের প্রতারিত করবার জন্যেই। কিন্তু এখন আর খামকা দুরাশার পেছনে ছুটে লাভ কী? বরং এবার সবাই মিলে ফিরেই যাওয়া যাক ইওরোপে, সত্যি-তো, লর্ড গ্লেনারভন তাদের জন্যে অনেক করেছেন, অনেক লোকসান হয়েছে তার, এমনকী প্রাণহানিও হয়েছে এই অভিযানে বেরিয়ে, আর কেন, বাবাকে তো আর পাওয়াই যাবে না, এবার বরং

এমনি-সব কথা, ভেঙে-ভেঙে, থেমে-থেমে, ছেঁড়া-ছেঁড়া কতগুলো শব্দ দিয়ে সাজানো। হাজার সান্ত্বনা, হাজার প্রবোধ, হাজার সহানুভূতিও এখন বোধহয় তাকে আর ঐ দুঃসহ হতাশা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গও দমবার পাত্র নন। কাপ্তেন গ্রান্টের মতো তিনিও ডাঙার নন, জলেরই মানুষ যেন। তিনিও নাছোড় বলে গেলেন কেমন করে তিনি খুঁজে বার করবেন কাপ্তেন গ্রান্টকে, বার করবেনই, দমবার পাত্র নন তিনি, হল ছেড়ে দেয়া তার ধাতেই নেই মোটেই, একদিন-না-একদিন ঠিক তিনি মেরিকে মুখোমুখি দেখা করিয়ে দেবেন তার বাবার সঙ্গে, আর তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে তিনি, জন ম্যাঙ্গল, তিনি কাপ্তেন, জাহাজি, কাপ্তেন কথাটা তার পোশাকি বাহারে অভিধা নয়-সেটা তার নামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সেদিনটা তারপর এমনি-সব কথার পিঠে কথায় কেটে গেলো, ক্লাস্তিটা কেউ যেন গায়েই মাখছিলেন না,—মেরির দিকে তাকানো যাচ্ছে না, তাকে অন্তত ঐ সর্বনেশে হতাশা থেকে বার করে আনতেই হবে।

পরের দিন ভোরবেলাতেই জন ম্যাঙ্গল্‌স বেরিয়ে গেলেন জাহাজঘাটায়, মেরিকে তিনি কথা দিয়েছেন—অভিযান চলবে, সন্ধান চলবে, তাই গোড়াতেই দরকার একটা জাহাজ—যদি মেলবোর্নে যাবার কোনো জাহাজ জোটে। কিন্তু ইডেন ছোট জায়গা, টুফোল্ড উপসাগরের মুখে জাহাজ খুব-একটা আসে না, সমুদ্র এখানে উত্তাল, ক্ষিপ্ত, বন্য—তাছাড়া ঠিক-এদিকটায় লোকালয়ও তেমন গড়ে ওঠেনি। অনেকক্ষণ জাহাজঘাটায় ঘুরেও মেলবোর্নগামী কোনো জাহাজের খোঁজ পাওয়া গেলো না। কী করবেন তাহলে এখন?

আর ঠিক সেইসময়েই মঁসিয় পাণ্ডয়ল মুশকিল আসানের ভঙ্গিতে খবরটা দিলেন। মেলবোর্ন যে যেতেই হবে, এমন মাথার দিবি কে দিয়েছে? এখন যখন ডানকান আর ওখানে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে নেই তাদের অপেক্ষায়, তখন মেলবোর্ন না-গিয়ে অন্য কোথাও গেলে তো হয়। আগের দিনই তো জাহাজঘাটায় গিয়ে দেখে এসেছিলেন নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে যাবার জন্যে একটা জাহাজ তোড়জোড় করছে। সেটায় করে অকল্যান্ড চলে গেলেও তো হয়, সে যখন একটা দেশের রাজধানী, তখন সেখানে ইওরোপে যাবার মতো কোনো-না-কোনো জাহাজ পাওয়া যাবেই। অকল্যান্ড এখান থেকে বেশি-দূরে নয়, তিনি শুনে এসেছেন দিন-দশেকের বেশি লাগবে না এই হাজার মাইল পাড়ি দিতে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো-একটা কথা খতিয়ে দেখে নেয়া উচিত। অকল্যান্ড পড়েছে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখায়—প্রথম থেকেই তো, সেই যখন তারা দক্ষিণ

আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন, তারা এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তর ধরেই পাড়ি জমিয়েছেন। এই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরেই কোথাও নিশ্চয়ই কাণ্ডেন গ্রান্টকে পাওয়া যাবে।

শেষচেষ্টার পরেও একটা বিশেষ-শেষ চেষ্টা, যদি সেরকম কিছু কখনও হয়। যখন সমস্ত ব্যাপারটাকেনিছক পণ্ড্রম বলে মনে হচ্ছে, তখন যদি এমনকী একটা উটকো উত্থেরও এসে পৌঁছায়, তখন কেমন যেন নতুন করে একটা উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়ে যায়। সাফল্য সম্বন্ধে কোনো ভরসাই হয়তো নেই, কিন্তু তবু তো...আর এই তবু অব্যয়টা যথার্থই অব্যয়, সেটা আর-কখনও মরে না-সবসময়েই যেন ঝোড়োসমুদ্রে উত্তাল উথালপাথাল ঢেউয়ের মধ্যে দূরের-কোনো আলোকস্তম্ভের মতো আলো দেখাতে থাকে। যখন মেলবোর্নে আপাতত যাওয়া হবে না বলে সবাই মনখারাপ করে আছে, তখন এই প্রস্তাব-যেটা নিছক-একটা বিকল্প ব্যবস্থার চাইতেও বেশি!

আর সেটাকে এম্ফুনি যেন সজোরে আঁকড়ে ধরলেন সবাই। আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট না-করে লর্ড গ্লেনারভনকে নিয়ে কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স সটান গিয়ে হাজির সেই জাহাজে। জাহাজিদের নিজেদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলাদা-একধরনের বনিবনা থাকে, তাছাড়া জাহাজিদের পরিভাষাও তোকান্ডেন ম্যাঙ্গসের জানা। ফলে জাহাজটা যতই হতচ্ছাড়া মালবওয়া জাহাজ হোক না কেন, জাহাজের কাণ্ডেন বিল হালি যতই রক্ষ, বেপরোয়া, গোঁয়ার গোছের লোক হোকনা কেন, না-ইবা সে জানুকভদ্রতা বা সহবৎ, পাইপ টেনে-টেনে যতই কেন-না ঠোঁট দুটো কালো করে ফেলুক, কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকে কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই পটিয়ে ফেললেন। হুম, এটা জানবেন মালবওয়া জাহাজ, কোনো প্রমোদতরী নয়, মালাদেরই থাকার ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই, তার ওপরে আবার মহিলা, শ্বেতাঙ্গিনী, উঁহু, তাদের থাকার ব্যবস্থা তাদেরই করতে হবে, এমনকী

খাবারদাবারের ব্যবস্থাও, এখানকার খাবার দাঁতে কাটা যায় না, এমন অখাদ্য, আর-হ্যাঁ, যখন বিপদে পড়েছেন, নিয়ে যেতে পারি, তবে পঞ্চাশ পাউন্ড ভাড়া লাগবে, আর সেটা আগাম, হাতে-হাতে চাই, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, এ-জাহাজে যাত্রীও যা মালের বস্তাও তা-ই-বরং খোল ভর্তি মাল আরো-দামি, সেগুলো সময়মতো অক্ষত পৌঁছে দিতে না-পারলে শেষটায় তাকেই উলটো খেসারৎ দিতে হবে...ইত্যাদি, এবং ইত্যাদি।

কিন্তু তা-ই সই। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গলসের মাল্লারা নিজেরাই একটু জায়গা ঝাঁট দিয়ে, ধুয়ে-পুঁছে, সাফসুতরো করে নিলে। ব্যাঙ্কে গিয়ে সেদিনই লর্ড গ্লেনারভনের চেক ভাঙিয়ে নগদ টাকা তুলে এনেছেন মেজর ম্যাকন্যা। তা থেকে আগাম পঞ্চাশ পাউন্ড চুকিয়ে দেয়া হয়েছে বিল হ্যালিকে। মঁসিয় পাওয়লকে কিনে দেয়া হয়েছে নিউজিল্যান্ডের একটা ম্যাপ। অস্ত্রশস্ত্র সব তো গেছে ভেলাটার সঙ্গে, শুধু তার নিজের রাইফেলটাই বেঁচে ছিলো, এবার সবার জন্যেই নতুন করে অস্ত্রশস্ত্র কেনা হলো। আবার একটা নতুন দেশে চলেছেন সবাই-কোথায় কোন্ আপদ তাদের জন্যে ওৎ পেতে আছে, সেজন্যে সাবধান থাকাই ভালো। যাত্রীদের নিয়ে বিল হ্যালির কোনো মাথাব্যথা নেই, ছপ্পড় কুঁড়ে এই অপ্রত্যাশিত কড়কড়ে পাউন্ড পেয়েই সে খুশি, তাদের কার কী নাম, কার কী ধাম-সে-সম্বন্ধে তার কোনো উটকো কৌতূহল নেই-জাহাজ ছাড়বো কাল ঠিক দুপুরবেলায়, কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে জাহাজে না-এলে আমি কিন্তু ফালতু সবুর করবো না। আপনাদের না-নিয়েই আমায় জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে-আমার বাপু সাফ কথা।

জাহাজে ওঠবার আগে, শেষবার, এখানেই সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখার কাছে সমুদ্রতীর দেখে এসেছেন লর্ড গ্লেনারভন, বেন জয়েস ডানকান দখল করে নেবার পর টম অস্টিন

আর অন্য মান্নাদের কী হাল করে কে জানে। যদি ধরে-ধরে একেকটা করে মৃতদেহ ভাসিয়ে দিয়ে থাকে জলে, আর সেগুলো যদি ভেসে এসে ডাঙায় ঠেকেও থাকে!

লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে ছিলেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গ। না, তীরে কারু মৃতদেহ পড়ে নেই। তবে ডানকান যে এখানে এসেছিলো, তারই চিহ্ন তীরের কাছে ঐ তাঁবু খাটাবার দাগ, আর নিভে-যাওয়া আগুনের কুণ্ড, কয়েদিদের একটা উর্দিও পাওয়া গেছে তার পাশে, আয়ারটন (নাকি বেন জয়েস) তোবলেছিলো এখানে ডানকানকে নিয়ে এসে তার সাঙাৎদের জাহাজে তুলে নেবে। এসেছিলো নাকি তাহলে? এ-সব কি তারই চিহ্ন?

ইডেনের শাসনকর্তার সঙ্গে একটা মোলাকাৎ অবশ্য হয়েছিলো। এখানপার ম্যাজিস্ট্রেটকে লর্ড গ্লেনারভন জানাতে গিয়েছিলেন যে তার জাহাজ দখল করে জেলপালানো কয়েদিরা বারদরিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে। যদি ভেবে থাকেন যে ম্যাজিস্ট্রেট তাই শুনে বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠে ডানকানজাহাজের উদ্ধারের জন্যে তোড়জোড় শুরু করে দেবেন, তবে ভুল ভেবেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট উত্তেজিত হয়েছিলেন বটে, তবে উল্লাসে, আনন্দে প্রায় আত্মহারা হই যেন, জেলপালানো দুর্ধর্ষ খুনে-ডাকাতগুলো আর অস্ট্রেলিয়ায় নেই-জাহাজে করে জলে ভেসেছে-এতে অন্তত রাতের ঘুমটা এখন থেকে নির্বিঘ্নে হবে-তাদের ভয়ে আর সারাক্ষণ আধমরা হয়ে থাকতে হবে না-সারাক্ষণই তো শঙ্কা ছিলো কোথায় কোন আতঙ্ক লেলিয়ে দেয় বদমায়েশগুলো-এখন বরংহাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো। খুশি হয়ে তিনি চারপাশে তারবার্তা পাঠিয়ে দিলেন-জোর খবর! খুশির খবর! কয়েদিগুলো অস্ট্রেলিয়ার ডাঙায় আর নেই-জাহাজে করে জলে ভেসেছে!

সত্যি, এই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কাণ্ডে বিন হ্যালির যে কী তফাৎ, সেটাই বোঝা দায়। সবাই আছে যে যার তালে। অন্য মানুষদের বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের শান্তি নষ্ট করে কো-সে গাড়ল।

এত-সব জায়গা থেকে বিভিন্ন টুকিটাকি সেরে এসে কাণ্ডে ম্যাক্সলস দ্যাখেন মঁসিয় পাএওয়ল কি-রকম ছটফট করছেন সারাক্ষণ, একটা খাঁচায় পোরা বাঘের মতো তার দশা।

কী ব্যাপার, মঁসিয় পাএওয়ল? আপনাকে যে খুব অস্থির দেখাচ্ছে-আবার কিছু নতুন উৎপাত জুটেছে নাকি।

উৎপাত নয়! মঁসিয় পাএওয়ল যেন ফেটেই পড়েছেন। আমরা যে নিউজিল্যান্ড যাচ্ছি হুট করে!

কেন? নিউজিল্যান্ড যাবার প্রস্তাবটা তো আপনার কাছ থেকেই এসেছিলো।

তা বটে। তবে কি জানেন তখন নতুন দেশে যাবার উত্তেজনার চোটে ভুলেই গিয়েছিলুম যে নিউজিল্যান্ডে গেলে কেউ নাকি আর-কখনও ফেরে না! এখন ভাবছি কোন কুক্ষণেই যে বাড়ির পড়ার ঘরটা থেকে পা বাড়িয়েছিলুম। কপালে এখন আরো-কত দুর্ভোগ আছে, দেখবেন। আমার ধারণা, এ-যাত্রাতেও আমরা নির্বিঘ্নে দিন কাটাবার বরাং করে আসিনি।

অমন করে ভাগ্যকে উসকে না-দিলেই পারতেন বোধহয় মঁসিয় পাএওয়ল। কোন সুক্ষ্ম লুতাতন্তুর জালে যে মানুষের ভাগ্য ঝোলে আর কোন খেয়ালে আপন মনেই যে সে দোল

খায় পেণ্ডুলামের মতো, এদিক থেকে ওদিক, তা-ই বা কে জানে। তবে গতিক যে খুব সুবিধের ঠেকছে না তা পরদিন জাহাজে ওঠবামাত্রই টের পাওয়া গিয়েছিলো। বিল হ্যালির কাছ থেকে কেউই খুব বিনীত ভদ্র সুবোধ ব্যবহার আশা করেনি, সে-যে জাহাজে মহিলাদের দেখে বিগলিত হয়ে গিয়ে নিজের ক্যাবিনটা তাদের ছেড়ে দেবে না-এটা তো জানা কথাই। কিন্তু পাইপমুখে এই হটাকাটা ইয়াজোয়ানের কাছে প্রত্যাশা করা গিয়েছিলো যে সে আর কিছু না-হোক, অন্তত নৌচালনবিদ্যেটা ভালোভাবেই আয়ত্তকরেছে-না-হলে একটা আস্ত সচল জাহাজের কাণ্ডেন হলোকীকরে। পরে অবশ্য দেখা গেলো এ-ব্যাপারটা যদি তার জানা থেকেও থাকে, জাহাজ ছাড়বার পর নিখুঁতমসৃণ, ভাবে সেটাকে চালাবার কোনো মাথাব্যথাই নেই তার। নিজে গিয়ে মাল টেনে পড়ে থেকেছে নিজের ক্যাবিনে, জাহাজ কোথায় কোন চোরাগোষ্ঠা ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা খেলো কি খেলো না-তাতে হয়তো তার ঘোড়াই আসে যায়। আর যেমন কাণ্ডেন, তেমনি তার মাল্লারা। তারাও কাণ্ডেনের পন্থা অনুসরণ করে অল্পক্ষণবাদেই মদের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়লো। এ-কী আপদ রে, বাবা! এ-কোন কাণ্ডেনের পাল্লায় এসে পড়লুম? এ-কথা ভেবে, নিজে থেকে যেচে, আগবাড়িয়ে কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স একবার তাকে জাহাজ বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়েছিলেন, অমনি সে তাঁকে হুংকার দিয়ে নিজের ক্যাবিন থেকে বার করে দিয়েছে : বলি, এ-জাহাজের কাণ্ডেন কে? আপনি, না আমি? আমি আমার যেমন-খুশি তেমনিভাবে আমার জাহাজ চালাবো, তাতে আপনি ফোপরদালালি করে নাকগলাতে এসেছেন কেন?

গতিক দেখে ফের মাথায় হাত লর্ড গ্লেনারভনের। জলপথের কোনো-একটা চলনসই চার্ট পর্যন্ত বুলছেন। সারেণ্ডের ঘরে, যে, সেটা দেখে কোনো অনুমতি বিনাই কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স জাহাজের হাল ধরবেন-আক্ষরিক অর্থেই ধরবেন। ইডেন থেকে অকল্যান্ড যায় এ-

জাহাজ, আবার সেখান থেকে ফেরে-ফলে পথটা বিল হ্যালির চেনা। কিন্তু সে তো এখন বেহুঁশ পড়ে নাক ডাকাচ্ছে।

আগেই বলেছি কোন কুম্ভণেই যে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছিলুম,সিয় পাএয়ল ফের তাঁর কপাল চাপড়াতে লেগে গেছেন, এ-যে দেখছি রান্সসমুলুকে পা দেবার আগে থেকে অবস্থা সঙিন হয়ে উঠলো!

কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস জিগেস করলেন : রান্সসমুলুক? সে আবার কী? আমরা তো যাচ্ছি অকল্যাভে-নিউজিল্যাভে!

আরে-হ্যাঁ -তার কথাই তো বলছি। এই মাওরিদের দেশটা যে রান্সসদের দেশ-সে সবাই জানে। মঁসিয় পাএয়ল একটু তেতে উঠেই বললেন।

রান্সসদের দেশ মানে?

মানে ক্যানিবালাদের রাজত্ব-পড়েননি মঁতেইন-কী-সব লিখে গেছেন এই ক্যানিবালাদের বিষয়ে? নরখাদক একেকটা-মানুষখেকো!

কথোপকথনের ধরনটা দেখে কাপ্তেন ম্যাঙ্গলস-এর ধারণা হলো ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তা আপনার মতেইন এই মাওরিদের দেশে এসেছিলেন বুঝি? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন? একেবারে রান্সসদের পেটের ভেতর থেকে তাঁর বাণী বিতরণ করছেন? না-না, মঁসিয় পাএয়ল, সঁতেইন কোথায় কোন্ দেশ সম্বন্ধে কী বলেছেন আমি জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই। শুনেছি, মহাকবি শেক্সপীয়ার নাকি এই

ক্যানিবালা কথাটা ওলোটপালোট করে দিয়েই ক্যালিবানকে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেও-যদ্র জানি-আর যা-ই হোক, মানুষখেকো নয়। তা আপনি কি নিউজিল্যান্ডে যেতে চান না নাকি? সত্যিকার মানুষখেকো তো বাঘসিংহ-তা তাই বলে কেউ কি বাঘসিংহের দেশে যায় না?

এ-কথায় হয়তো যৎকিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হলো মঁসিয় পাঞয়লের। তিনি একটু আপোষ করার ভঙ্গিতে বললেন, না-না, আমি নিউজিল্যান্ডে যদি-বা যাইও-উপকূল ছেড়ে ভেতরে যাচ্ছি না। কে জানে, বাপু, কোথায় কোন্ বিপদ উৎকট একটা লাফ দেবে বলে উদ্যত হয়ে আছে!

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স নিজের ঘাড়ে হাত বুলাতে-বুলোতে বললেন, কী জানেন, মঁসির পাঞয়ল? আমি তো সাগরজলের মানুষ! ঘাড়েগদানে নোনা ধরে গেছে। আপনার ঐ রান্ধসরা হয়তো আমার ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে থু-থুঃ করেই উগরে ফেলে দেবে। আর তাছাড়া, মাওরির কেমন লোক, সেটা আপনার ঐ প্রাচীন পণ্ডিতদের মতো আমিও জানি না। তবে শাদা শয়তান আমি কয়েকটা দেখেছি-এই আপনার বেন জয়েনের কথাই ধরুন না কেন-পৃথিবীর কোন ক্যানিবালাই বা তার চেয়ে অধম হবে, বলুন?

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স মঁসিয় পাঞয়লের এই জুজুর ভয় দেখে ততটা ভড়কে যাননি। তার বরং ভয়ই হচ্ছিলো, এই ফরাশি পণ্ডিত এমনিতেই একটু ছিটগ্রস্ত আধাপাগলা লোক ছিলেন। এখন এইসব বিদঘুটে উদ্ভট আজগুবি কথাবার্তা যে বলছেন সে কি তার মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেছে বলেই? না-হলে ইনি কেন অবিশ্রাম

টিন-কনটিন-আল্যাণ্ড-আল্যান্ড করে বকে মরছেন। যতই কটিন বলে বিড়বিড় করুন না কেন, এটা তো সব্বাই জানে যে নিউজিল্যান্ড মোটেই কোনো কনটিনেন্ট নয়-সেটা বরং দুটো দ্বীপ মিলিয়ে তৈরি-নর্থ আইল্যান্ড আর সাউথ আইল্যান্ড। তবে কি ফের আরেকবার তিনি চিরকুটগুলো নতুন অর্থ বার করবার জন্যে খেপে উঠেছেন? তিনি কি ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন যে কাপ্তেন গ্রান্টের ব্রিটানিয়া শেষটায় ভেঙে পড়েছিলো নিউজিল্যান্ডেরই কোনো উপকূলে? তাহলে তো সাড়ে-সর্বনাশ! তিনি একবার করে চিরকুটগুলোর একটা নতুন অর্থ বার করেন, আর তাঁদের ছুটে মরতে হয় এই মুলুক থেকে সেই মুলুকে! শেষটায় কি কিউয়ি পাখির এই দেশটাতে তাদের একবার এ-দ্বীপ একবার ও-দ্বীপ করে চর্কি ঘুরতে হবে? তা যদি হয় তাহলেই ভাবনার কথা। কোনো-একটা সম্ভাবনা ঘুণাম্বরে যদি দেখা যায় তাহলে কি আর লর্ড গ্লেনারভন সেটার শেষ না-দেখে ছাড়বেন?

ছ-দিন হলো পাণ্ডয়ল কেবল কনটিন-কনটিন করেছেন, আর ছ-দিন হলো জাহাজ দিব্বি পাল খাঁটিয়ে জোরালো হাওয়ায় তরতর করে ভেসে চলেছে, তবে সমুদ্রে জাহাজ চালানোর সময় এমনিতেই সবসময়ে খেয়াল রাখতে হয় খুব যেন দোল না-খায় অথবা ঝাঁকুনি লাগে। হ্যালির জাহাজ যেন ছুটে চলেছে নিজের খেয়ালখুশি মাফিকই, জাহাজের গতি মসৃণ না ঝকি-খেতে-খেতে-চলা, সে-বিষয়ে নজর রাখার জন্যে আর যে-ই থাকুক, অন্তত বিল হ্যালি যে নেই, সেটা হয়তো না-বললেও চলে। অতএব ঝাঁকুনির চোটে যদি সকলেরই মনে হয় সিন্ধুপীড়ার দাপটে পেটের নাড়িভুড়ি শুধুই উলটে আসতে চাচ্ছে, তবে বলতেই হয় যে সেটা একদিনে কারুই আর তেমন অপ্রত্যাশিত বলে মনে হয়নি।

তার ওপর ফের শুরু হয়েছে দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালের সেই সুবিখ্যাত বর্ষা। বৃষ্টির ঝাঁপট দাপট এমনই প্রচণ্ড যে খোলের ভেতরে সঁধিয়েও যেন তার হাত থেকে নিস্তার

নেই। শেষটায় মেরিকে নিয়ে লেডি হেলেনাকে বেরিয়ে আসতে হলো খোল ছেড়ে বাইরে। একে তো মালপত্রের জন্যে একফোঁটাও জায়গা নেই, তার ওপর এই বিষম খেলা চলেছে সমুদ্রের, এই সাগরদোলা নাগরদোলার দাপট এমনই যে শেষটায় বাধ্য হয়েই মেরিকে নিয়ে খোল থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। এমন তুলকালাম ঝাঁকুনির মধ্যে মালপত্রের গায়ে বেমক্কা ধাক্কা খাওয়ার চাইতে ডেকে গিয়ে সকলের সঙ্গে সমানভাবে জাহাজের দুলুনিটা ভাগ করে নেয়াও ভালো। মঁসিয় পাঞয়ল অবশ্য ফরাশিদের স্বভাবসুলভ শিভালরিবশত মহিলাদের মনস্ত্বষ্টির জন্যে বিস্তর প্রমোদ জোগাবার চেষ্টা করলেন, তবু সর্বদিক বিবেচনা করে বলতেই হয় এমন অবস্থায় কি কারু মুখেই হাসি ফুটতে পারতো?

কিন্তু মেরি লেডি হেলেনার চাইতেও অনেক বেশি কাহিল দশা খোদ লর্ড গ্লেনারভনের। তার বেজায় মনখারাপ। বার-বার ডেকে এসে পায়চারি করেন, তাকিয়ে থাকেন বৃষ্টিতে-ঝাপসা দিগন্তের দিকে, আর ভিজে নেয়ে একশা হয়ে যান। শেষটায় আর থাকতে না-পেরে, লর্ড গ্লেনারভনকে চোখে দূরবিন সঁটে দিগন্ত হাড়াতে দেখে, কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স সারাসরি জিগেসই করে বসলেন : কী খুঁজছেন, বলুন তো?

ডানকানকে।

ঈশ্বর করুন আমরা যেন ডানকানকে আর না-দেখি।

এ-কী কথা, জন? কী বলতে চাচ্ছে তুমি?

ঠিক কথাই বলছি। ডানকান এখন জলদস্যুদের জাহাজ। আমাদের দেখতে পেলে বেহাল করে ছাড়বে। এটা কি খেয়াল আছে যে আমাদের সঙ্গে মহিলারা আছেন?

কী-রকম মিইয়ে গিয়ে লর্ড গ্লেনারভন বললেন : এদিকে তো ডাঙার চিহ্নমাত্র দেখছি না। ছত্রিশ ঘণ্টা আগেই তো আমাদের ডাঙা দেখতে পাবার কথা।

ঝড়ের তোড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেলা শেষ হয়ে রাত যখন নামলো, হাওয়ার গর্জানি তখনও একফোঁটাও কমেনি। বিল হ্যালির শরীরে বোধহয় রক্তের বদলে আছে কোহল আর সমুদ্রের নোনা জল। এটা জানতে তার ঠিকে ভুল হয়নি যে গতিক খুব একটা সুবিধের না। মত্ত অবস্থাতেই টলতে-টলতে সে চলে এলো ডেকে, রক্তরাঙা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো দুর্যোগকে, তারপর পাল ঠিক করে দিলে।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলেন তার পাকাহাতের কাজ, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। একবার যখন সাহায্য করার প্রস্তাব নিজে থেকেই উপযাচক হয়ে গিয়েছিলেন, তখন বিল হ্যালি তাঁকে যেভাবে তার অধিকারের মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলো, সেই অপমানের কথা তিনি এখনও ভুলে যাননি।

সমুদ্র যেন খেপে উঠেছে। বড়-বড়ো উথালপাথাল ঢেউ। জাহাজ একবার ঢেউয়ের ওপর উঠছে, পরক্ষণেই কাৎ হয়ে নেমে আসছে। ডেকের ওপর দিয়ে কবার বড়ো-বড়ো ঢেউ গড়িয়ে গেলো। ঢেউয়ের জল প্রবলবেগে বেরিয়ে যাবার সময় একবার লম্বা ছিপটাকেও নিয়ে গেলোসঙ্গে-ভাসিয়ে নিয়ে গেলো দূরে-বাঁধন ছিঁড়ে গেছে তার।

ঝড়ের মধ্যেই ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন গ্লেনারভন আর ম্যাঙ্গ। দুশ্চিন্তায় দুজনেরই চোখ কপালে উঠেছে। এই অচেনা সাগরে শেষটায় এই জাহাজ ডুবে যাবে

তো? রাত যখন সাড়ে-এগারোটা, তখন মিশকালো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ভেসে এলো অন্যরকম একটা শব্দ-এবার যেন ঢেউ গিয়ে কোনো বালিয়াড়ির গায়ে ভেঙে পড়ছে।

ডাঙা! কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স বলে উঠলেন, ডাঙা।

শিশের ওজন বাঁধা দড়ি জলে ফেলে দিয়ে জলের গভীরতা মাপলে একজন মাঝা। হিশেব করে বললে, তিন ফ্যাদম!

শোনবামাত্র কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। বিল হ্যালিকে গিয়ে বললেন : সর্বনাশ হতে চলেছে যে! জাহাজ যে এখন ডুবোপাহাড়ের ওপর দিয়ে চলেছে!

বিল হ্যালির হিশেবে একটা মস্ত ভুল হয়েছিলো। সে ভেবেছিলো, ডাঙা বুঝি এখনও ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে আছে। ঝড়ের মধ্যে মদের ঘোরে সে দূরত্বটা ঠাহর করতে পারেনি। এখন মাত্র মাইল-আষ্টেক দূরে ডাঙা চলে এসেছে দেখে সে কী-রকম যেন ঘাবড়ে গেলো। আর তার ঐ বেকুব রাঙা দৃষ্টির ফ্যালফ্যাল ভাবটা দেখে এবার খোদ ম্যাঙ্গল্‌স গিয়েই হাল ধরলেন!

মুশকিলটা কম ছিলো না। এখানকার সমুদ্রে চার্ট কখনও দ্যাখেনি ম্যাঙ্গ, এখানে নৌচালনার অভিজ্ঞতাও নেই। এটুকু শুধু আন্দাজ করা যাচ্ছে, এখানকার জলে

চারদিকেই ডুবোপাহা গিশাগশ করছে। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, হাওয়ার অবিশ্রাম শোঁ-শোঁ, ঢেউয়ের উত্তাল কলরোল-শুধু অনুমানে ভর দিয়েই জাহাজ চালাতে হবে, একটু এদিক-ওদিক হলেই ডুবোপাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে জাহাজের তলি ফেঁসে যেতে পারে। আর, বুঝি-ই হতে চলেছে। আচমকা কীসের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঘা লেগে থরথর করে কেঁ েউঠেইদাঁড়িয়ে গেলো জাহাজ। তলিটা তাহলে কোনো চড়ায় গিয়ে লেগেছে! পরক্ষণেই বিশাল এক ঢেউ এসে লাফিয়ে পড়লো জাহাজে, একধাক্কায় তাকে আরো ভালো করে নিয়ে গেলো চড়ার ওপর। ফোরকা ভেঙে পড়লো, বিষম একটা আত্ননাদ করে যেন মাস্তুল ভেঙে পড়লো। ক্যাবিনগুলোর কাঁচের শার্শি ঝনঝন করে উঠলো, ভাঙলোও বোধহয়। ম্যাক্সস-এর বুঝতে অসুবিধে হলো না জাহাজ ডাঙায় উঠে পড়েছে। কিন্তু এ-কোন ভাঙা-?

এই হলুস্থূল সংঘর্ষ ও ঝাঁকুনির পর সকলেই বেরিয়ে এসেছিলেন ডেকে। উৎকণ্ঠিত সুরে গ্লেনারভন জিগেস করলেন : ভেঙে গেছে নাকি জাহাজ? ডুবছে?

না। তবে এখন এই অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। সকাল না-হলে বোঝা যাবে না কোথায় এসে পৌঁছেছি। সকাল হলে নৌকো নামানো যাবে।

বিল হ্যালি আর তার মাল্লারা ঠিক বুঝতে পারছে না কী করবে। তারা অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে।

গ্লেনারভন যাত্রীদের নিয়ে খোলে নেমে পড়লেন। ওপরে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে বিল হ্যালির সাগরেদদের চীৎকার চাঁচামেচি ছুটোছুটি চললো। তারপর একসময়ে সমুদ্র শান্ত

হয়ে এলো, ঝড় থেমেছে, অন্তত ঐ প্রচণ্ড তুফানটা আর নেই, আর তার সঙ্গে তাল রেখে বোধহয় বিল হ্যালি আর তার অনুচরদের দাপাদাপিও অনেকটা কমে এসেছে।

সকালবেলায় আলো ফুটেই ম্যাঙ্গস ছুটে চলে এলেন ডেকে ।

দূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু জাহাজেবিল হ্যালি বা তার মাল্লারা কেউ নেই। একমাত্র যে-নৌকোটা অক্ষত ছিলো সেটা নিয়েই ঝড় থামতেই তারা কেটে পড়েছে।

তাহলে এঁরা এখন ডাঙায় যাবেন কী করে? তীর দেখা যাচ্ছে, অথচ সেখানে যাবার উপায় নেই।

উপায় যদি থাকতো,এরইমধ্যে মঁসিয় পাণ্ডয়ল আবার গোঁ ধরেছেন, তাহলেও আমি নামতুম না। ক্যানিবাঁলদের পাল্লায় পড়তে চাই না-শুনেছি এখানকার আদিবাসীরা সবাই মানুষখেকো। এ একটা রাক্ষসের দেশ।

তা যদি হয়, তবে জাহাজকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া দরকার। কাঁটা-কম্পাস, সেক্সট্যান্ট দিয়ে হিশেব করতে-করতে বললেন কাপ্তেন ম্যাঙ্গ। আমরা অকল্যাণ্ড থেকে আরো-দক্ষিণে চলে এসেছি-৩৮° ডিগ্রি অক্ষরেখায়। আরো অন্তত কুড়ি মাইল গেলেই আমরা নিউজিল্যান্ডের রাজধানীতে পৌঁছুতে পারবো।

তারপরেই নিজেদের মাঝিমাল্লা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জন ম্যাঙ্গস । খোলের মধ্যে প্রায় দুশো টন চামড়া ছিলো-সেটা ফেলে দেয়া হলো, আর জাহাজ অমনি ঐ ওজনটা ফেলে দিতেই খাড়া হয়ে দাঁড়ালো । চড়ায় ঘা লেগে যে-দিকটা কাৎহয়ে পড়েছিলো, সেদিকটায় একটু ভাঙচুর হয়েছে । দ্রুত হাতে তামার তাল্পি লাগিয়ে সেদিকটা মেরামত করা হলো । জোয়ার এলেই যাতে যাওয়া যায়, সেজন্যেই তৈরি থাকতে হবে ।

কিন্তু জোয়ার যখন এলো, জাহাজ দাঁড়িয়ে রইলো যেমনকে তেমন । একটুও নড়লো না । শুধু একদিকে নোঙর ফেলে কোনোরকমে জাহাজটাকে খাড়া করাই গেলো । অর্থাৎ পরের জোয়ারের জন্যে সবুর করে থাকতে হবে ।

আর তারইমধ্যে পাএওয়ল বায়না ধরেছেন, তিনি নিউজিল্যান্ডের অচেনা মাটিতে পা-ই দেবেন না । অকল্যান্ডের মতো রাজধানী শহর হলেনা-হয় কথা ছিলো, সেখানে শাদারা বসতি বানিয়েছে, শাসনের একটা ব্যবস্থা আছে । কিন্তু যে-সব জায়গায় মাওরিদের রাজত্ব এখনও কায়েম হয়ে আছে, সেখানে পদে-পদে বিপদ হতে পারে । এই রান্সস মূলুকে নামবে কে? জলপথে না-হয় এখান থেকে ভেসে চলে যাবারই ব্যবস্থা করতে হবে-সোজা অকল্যান্ড অন্দি ।

পরের বার জোয়ার যখন এলো, নিশুত রাতে, জাহাজ একটু দুললো বটে, কিন্তু এমনভাবে চড়ায় আটকে গিয়েছে যে তাকে নড়ানো গেলো না ।

উঁহু, এভাবে বসে থাকলে চলবে না, দেখা গেলো কাণ্টেন ম্যাঙ্গস-এর এই কথায় লর্ড গ্লেনারভনেরও সায় আছে । ঐ ভাঙা মাস্তুল, কাঠের সিন্দুক-এ-সব দিয়েই একটা ভেলা

বানিয়ে নিতে হবে আমাদের-হাত-পা গুটিয়ে বসে-থাকা মানেই বিপদকে ডেকে নিয়ে আসা। আরেকবার যদি অমন তুলকালাম তুফান ওঠে, তাহলে এই নড়বড়ে জাহাজটাকে আর দেখতে হবে না-ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে।

সঙ্গে-সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সবাই ভেলা বানানোর কাজে হাত লাগালেন। ভেলাটার ওপর পর-পর কাঠের বাক্স চাপিয়ে, কোনোরকমে একটা পাটাতনমতো তৈরি হলো, যাতে ঢেউ উঠলেও জল এসে পাটাতনে পৌঁছুতে না-পারে একটা মাস্তুলও বসানো হলো, যাতে পাল খাটানো যায়। আর একদিকে রইলো হাল, অন্যদিকে নোঙর।

জাহাজ থেকে ভেলায় নামিয়ে নেয়া হলো বিস্কুট আর নোনা মাছ। কিন্তু সর্বাত্মে ভেলায় ভোলা হলো অস্ত্রশস্ত্র, এগুলি এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

এইবারে সত্যি-সত্যি বোঝা যাবে জন ম্যাঙ্গসের কেরামতি। নৌচালনায় তিনি যে কতটা ওস্তাদ, এটা যেন তারই একটা হাতেকলমে পরীক্ষা।

কেমন করে যে তারপর সেই ভেলায় করে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা, সেটা কেউ স্পষ্ট করে জানেনই না যেন। কোনো লগবুক নেই যে নথি রাখবে কেউ। দশ মাইল পথ পেরুতে দু-দিন লাগলো। অবিরাম যুবুতে হলো আদিম দেবতাদের সঙ্গে-জল, হাওয়া-আর মাঝে-মাঝেই আকাশের মুখ কালো হয়ে যায় ঘন মেঘে। তবে, না, সে-রকম তুফান নয়। শুধু পাগল হাওয়া যখন ভেলাটাকে একঝটকায় একটা চোরা পাথরে এনে আছড়ে ফেললো, তখন কয়েক পা এগুলেই মূল মাটি।

কোনোরকমে সাবধানে, কত জল দেখে নিয়ে, ঐ কয়েক পা পেরিয়ে এলেন সকলে। আর অবশেষে পা দেয়া গেলো ডাঙায়, বিজনবিয়ে।

লর্ড এডওয়ার্ড বলেছিলেন, এই অচেনা জায়গায় আর সবুর না-করে সরাসরি হাঁটা দেবেন অকল্যান্ডের উদ্দেশে। কিন্তু আকাশ কালোকরে যেমন করে মেঘ এলো, তাতে এইইচ্ছেটা আপাতত স্থগিত রাখতে হলো। এক্ষুনিবরং কোনোরকমে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত। বৃষ্টি নামবার আগেই।

জায়গাটা ফাঁকা, উঁচুনিচু পাথর, পাণ্ডোল পাথরের নমুনা দেখে বললেন যে আগুনের পাহাড় ছিলো এখানে-নিয়মিত যে অগ্ন্যুপাত হতো, তারই প্রমাণ এই ছড়ানো পাথর।

উইলসন যখন একটা গুহা আবিষ্কার করলে, ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। একমুহূর্তও দেরি না-করে, ভিজতে ভিজতেই, ছুটে এসে গুহায় ঢুকলেন সকলে। ভেতরটা কিন্তু, আশ্চর্য, দিবি শুকনো। বোঝা গেলো, এই গুহায় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ঢোকে না। বিস্তর শুকনো ঘাসপাতা পড়েছিলো ভেতরে-তা যেন প্রায় একটা জাজিমের মতো বিছিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। কিছু ঘাসপাতা নিয়ে যাওয়া হলো গুহার মুখে- আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিতে হবে।

বৃষ্টি ধরলেই অকল্যান্ড রওনা হওয়া যাবে।

কিন্তু কাজটা যে খুব সহজ হবে, তা নয়। বেশ ক-বছর ধরেই মাওরিদের সঙ্গে ইংরেজদের ফাটাফাটি লড়াই চলেছে। মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা দখল করে বসতে লাগলো নিউজিল্যান্ডের প্রধান দ্বীপ দুটো-নর্থ আইল্যান্ড আর সাউথ

আইল্যান্ড, যারা দ্বীপ দুটোর সত্যিকার মালিক, তারা ক্রমশ পিছু হঠতে লাগলো। আর স্বাধীনতা বিপন্ন দেখে মরণপণ করে মাওরিয়া লড়াই চালাতে লাগলো ইংরেজদের সঙ্গে। সে-লড়াই এখনও চলছে, কিন্তু মাওরিরা বাধ্য হচ্ছে দ্বীপগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছেড়ে দূর-দুর্গম অঞ্চলে চলে যেতে। কিন্তু তাই বলে হার স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেনি এখনও।

খুবই বিপজ্জনক মুহূর্তে এখানে এসে পৌঁছেছি আমরা, মঁসিয় পাএয়ল বললেন, অকল্যান্ডে পৌঁছুতে পারলেও না-হয় কথা ছিলো। কিন্তু এখানে, পথের মাঝখানে, অতর্কিতে যদি মাওরিদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়, তারা যে আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না-এটা মনে রাখা উচিত।

তাহলে আমরা কী করবো এখন?

আমরা যেখানটায় এসে নেমেছি, সেখানটাতেই বিষম যুদ্ধ চলছে এখন-এই এখান থেকে অকল্যান্ড অন্দি-ফলে বিপদ এখানটাতেই সবচেয়ে-বেশি।

কিন্তু এখানে এই গুহায় বসে থাকলে তো চলবেনা-অকল্যান্ডে আমাদের যেতে হবেই-লর্ড গ্লেনারভন মনে করিয়ে দিয়েছেন।

উত্তরদিক দিয়ে অকল্যান্ডে যাবার চেষ্টা করাই ভালো-ঘোরাপথ হবে বটে, তবু খেপে-যাওয়া মাওরিদের মুখে পড়ার সম্ভবনা কম। কিন্তু সমুদ্রের ধার দিয়ে যাওয়া চলবে না-সেদিকটা মোটেই নিরাপদ নয়। বরং চেষ্টা করতে হবে ওয়াইপো আর ওয়াইকাতো নদীর মোহানায় যদি পৌঁছানো যায়।

এবার বুঝতে পারছি,কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স বললেন, ঝড় কমতেই ঐ একটা মাত্র নৌকায় করে বিল হ্যালি তার সাজোপাঙ্গদের নিয়ে সটকে পড়েছে কেন। সে নিশ্চয়ই ঐ ক্ষুদ্র মাওরিদের মুখোমুখি পড়তে চায়নি।

পরদিন বৃষ্টি ধরতেই রওনা হলেন সবাই। পাণ্ডায়লের কথামতোই ঘোরাপথটাই বেছে নেয়া হলো। উত্তরে তিরিশ মাইল পথ যেতে হবে। কোনোরকমে ঐ নদী দুটির মোহানায় পৌঁছুতে পারলে পরের পঞ্চাশ মাইল পথ যেতে আর তেমন অসুবিধে হবে না।

তৃতীয় দিনের দিন ধুকতে-ধুকতে অভিযাত্রীরা পৌঁছুলেন দুই নদীর সংগমে। প্রচণ্ড গর্জন করে স্রোত লাফিয়ে পড়ছে পাথর থেকে পাথরে, ছিটকে উঠছে জল, মিহি একটা কুয়াশার আস্তর ঢেকে রেখেছে সব, এদিকে সন্কেও হয়ে এসেছে। ক্লান্তিতে সকলের শরীর এলিয়ে আসছিলো। পথে কখনও কৌটো থেকে নোনা মাছ খেয়েছেন তারা, একবার বেলাভূমি থেকে ঝিনুক কুড়িয়েও খেয়েছিলেন। এখন একটু নোনা মাছ আর শুকনো বিস্কুট খেয়ে ক্লান্ত অভিযাত্রীরা বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। কাল দিনের আলো ফুটলে এখান থেকে যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব আরো এগিয়ে যেতে হবে।

কুয়াশাটা প্রধানত তৈরি করেছিলো জলের ঝাঁপটা, আর তা থেকে ছিটকে-পড়া মিহিজলের কুচি। সেই কুয়াশা দেখা গেলো সকালবেলাতেও আছে। পরে যখন রোদের তেজ বাড়লো, শুধু তখনই কুয়াশা সরে গেলো-আর অমনি উন্মোচিত হলো ওয়াইপা আর ওয়াইকাতো নদী দুটো-যেখানে এসে তারা মিলেছে, গোড়ায় খানিকটা গেছে পাশাপাশি,

তারপরেই দুটো খাত পুরোপুরি এক হয়ে গেছে-আর সেখান থেকেই বিশাল ধারা অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে এগিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে।

আর সেই নদী দিয়েই ছুটে চলেছে বিশাল-একটি ক্যানু-তার গলুই প্রায় সত্তর ফিট লম্বা, আর দু-ধার দিয়ে প্রায় তিনফিট উঠে গিয়েছে বার। সরু লম্বা ছিপ, তরতর করে ছুটে চলেছে মাঝনদী দিয়ে। মস্ত-একটা দেবদারু গাছ ফোপরা করে নিয়ে তার খোলটা দিয়ে বানানো হয়েছে এই ক্যানু, ভেতরটায় ঝাউ-দেবদারুর পাতা আর ঝুরি বিছিয়েই তৈরি করা হয়েছে পুরু আর নরম একটা জাজিম। আটজোড়া দাঁড় সামনে। জলে পড়ছে, প্রায় যেন পিছলে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ক্যানুকে। শক্ত হাতে হাল ধরে আছে আরো-একজন। সে মাওরি, ঠিক তার সঙ্গীদের মতোই; শক্ত সুঠাম দেহ, বুকের খাঁচাটা চওড়া, যেমন চওড়া তার কঁধ। বলিষ্ঠ বাহুতে আর পায়ের গোছে যেন নেচে বেড়াচ্ছে পেশীগুলো। কপালে জটিল ঝুরির মতো কত-যে রেখাকাটাকুটি করে গেছে। সারা গায়ে উলকি-কাটা, এমনকী মুখেও। তার ভাবভঙ্গি দেখে এটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় যে সে হেজিপেজি কেউ নয়, বরং সাধারণ মাওরিদের চাইতে একটু আলাদাই। অর্থাৎ কোনো-একটা গোষ্ঠীর সর্দারই হবে সে। গায়ে তার বুনোকুকুরের ফারের আলখাল্লা, কানে লোখরাজের দুল, আর মাওরিরা যাকে পুনা পাথর বলে সেই পাথরের মালা গলায়, তার কাঁধে ঝুলছে একটা বন্দুক, নিশ্চয়ই ইংরেজদের কারখানাতেই তৈরি-নইলে এরা আর আগ্নেয়াস্ত্রের নির্মাণকৌশল জানবে কী করে, আর আছে একটা দু-হাত লম্বা খঞ্জর-তার দু-দিকের ফলাতেই ধার, বোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে ফলাটা, আর সবুজ পাথরের হাতলটাও রোদুরে ঝলমল করে উঠেছে।

সর্দারের পাশে বসে আছে আরো নজন সশস্ত্র যোদ্ধা। যারা দাঁড় টানছে তারা নিশ্চয়ই সর্দারের অনুচর-যোদ্ধারা যদি সহযোগী হয়, এরা তবে অনুগত প্রজা।

আর ক্যানুর, ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে পা-বাঁধা দশজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী-তাদের হাতে অবশ্য কোনো বাঁধন নেই। এঁরা আর-কেউ নন : অভিযাত্রীরা : লর্ড ও লেডি গ্লেনারভন, মেরি ও রবার্ট গ্রান্ট, মঁসিয় পাঞয়ল, মেজর ম্যাকন্যা, কাপ্তেন ম্যাঙ্গস, আর ডানকানের স্টুয়ার্ড আলবিনেট আর দুজন মাল্লা-উইলসন আর মূলারাডি।

কাল রাত্তিরে একটা মস্ত ভুল হয়েছিলো অভিযাত্রীদের। একে ঘুটঘুটে কালো রাত্রি, তায় পাঁজা-পাঁজা কুয়াশা, আর তারই জন্যে তারা খেয়াল করেননি যে তারা মাওরিদের একটা আড্ডায় ঢুকে পড়েছেন। তারা ঘুমিয়ে পড়তেই মাওরিরা নিঃশব্দে এসে পাকড়েছে তাদের, পা বেঁধে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, কিন্তু কোনোরকম শারীরিক নির্যাতন করেনি।

সর্দারের নাম কাই-কুমু-নামের মানে দুশমনের হাত যে চিবিয়ে খায়-আক্ষরিকভাবে খায় না হয়তো, কিন্তু আলংকারিক ও সম্প্রসারিত অর্থ দাঁড়ায় যে শত্রুদের ফুটো করে ফ্যালে। কাই-কুমুর মতো বেপরোয়া ডাকাবুকো লোক সহজে দেখা যায় না; যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি দুর্দান্ত। ইংরেজরা তার মাথার জন্যে ইনাম ঘোষণা করেছে-জীবিত বা মৃত তাকে ধরে দিতে পারলেই পুরস্কার। অতিসম্প্রতি মুখোমুখি একটা সংঘর্ষে হেরে যেতে হয়েছে কাই-কুমুকে, তাই সে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে নিয়ে সে চলেছেওয়াইকাতোনদীর উৎসের দিকে সেখানে গিয়ে আরো লোকজন জড়ো করে ফের গিয়ে আক্রমণ শানাবে।

পর-পর যত ঘটনা ঘটেছে, তাতে বোধহয় লর্ড গ্লেনারভনের আঁতকে ওঠার ক্ষমতাটাও বিলুপ্ত হয়েছিলো। তাছাড়া, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে-কপালে যদি আরো-নতুন-কোনো দুর্ভোগ লেখা থাকে, তবে তা-ই হবে। এ ঠিক সুখেদুঃখে-নির্বিকারবাদী স্টেয়িকদেরমনোভাব নয়, বরং নিয়তিমানা কোনো মানুষের মনের ধাত। এবং এই মাওরিরা তো তাঁদের সঙ্গে গায়ে পড়ে কোনো বাড়তি দুর্ব্যবহারও করছে না, শুধু অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে, আর পা বেঁধে রেখেছে। সর্দারকে একবার জিগেসও করেছিলেন :আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন? আমাদের নিয়ে তোমরা কী করবে? উত্তরে সর্দার বেশ স্পষ্টগলায় ইংরেজিতেই বলেছিলো : ইংরেজদের হাতে আমাদের যারা বন্দী হয়ে আছে, তাদের সঙ্গে তোমাদের বদল করতে চাই। ইংরেজরা তোমাদের চায় কিনা তারই ওপর তোমাদের জীবন নির্ভর করছে। বদল না-করতে চাইলে তোমাদের অবশ্য মেরে-ফেলা হবে।

তার স্পষ্টকথা শুনে লর্ড গ্লেনারভন এটুকু অন্তত বুঝেছিলেন যে আপাতত এদের হাতে তার কোনো ভয় নেই। যতক্ষণ-না তারা বন্দী বদলাবদলির ব্যাপারটায় একটা ফয়সালা করছে, ততক্ষণ অন্তত তাদের কিছু করবে না। নিশ্চয় মাওরিদের যে-যোদ্ধারা ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদের জীবন এদের কাছে বিশেষ-মূল্যবান। এবং তাই কোনো-একটা বিনিময়ের সুযোগ এরা সহজে হাতছাড়া করতে চাইবে না।

এই ওয়াইপা অর ওয়াইকাতো নদীদুটো নিউজিল্যান্ডের আদিবাসিন্দাদের বেজায় গর্বের বস্তু। ওয়াইকাতো নদী সবশুধু ২২০ মাইল অর্থাৎ ৩৫৪ কিলোমিটার লম্বা-নর্থ আইল্যান্ডের উত্তরপশ্চিম থেকে বেরিয়ে এসে তাসমান সাগরে পড়েছে। ঠিক এমনি

একটা নদী বেরিয়েছে সাউথ আইল্যান্ডের দক্ষিণপূর্ব থেকে-সেটা ১৩৫ মাইল অর্থাৎ ২১৭ কিলোমিটার লম্বা-সোজা পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব ধরে সেটা নেমে এসে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। ওয়াইকাতোরই বুকে এসে পড়েছে ওয়াইপো। মানচিত্র দেখে এবং অন্য পর্যটকদের বিবরণ মনে করবার চেষ্টা করে মঁসিয় পাওয়ল অনুমান করে নিতে চাচ্ছিলেন এই ওয়াইকাতোর উৎসমুখে কী আছে।

সর্দার যখন তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলেছিলো তখন দু-একটা কথা বারে-বারেই কানে ভেসে আসছিলো-তার মধ্যে এই কথা কটি কেমন যেন চেনা-চেনা লাগলো মঁসিয় পাওয়লের : তুয়াকাউ, তুয়াহেনি পয়েন্ট, তুয়াই, তাইরাঙা। এ-সব নাম শুনে সবকিছু স্পষ্ট বোঝা না-গেলেও এটুকু মোটামুটি ধরে নেয়া গেলো নর্থ আইল্যান্ডের দক্ষিণের দিকে চলেছেন তারা-ওয়েলিংটন পেরিয়েই হয়তো, পার্বত্যঅঞ্চলে, সম্ভবত সেখানেই কোনো হ্রদ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওয়াইকাতোনদী, যেভাবে সহজসাবলীল ভাবে ক্যানু ছুটেছে, তাতে রাতে বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে, অনুমান করা যায় দিন-চারেক পরে তাঁরা ওয়াইকাতোর উৎসমুখে গিয়ে পৌঁছবেন।

এমনিতে সারাদিন ক্ষিপ্ৰবেগে চলে ক্যানু, যারা দাঁড় টানে তারা যে কী-রকম ওস্তাদ সেটা বোঝা যায় যে-রকম মসৃণ সাবলীল ছন্দে ক্যানু এগোয়, বোঝাই যায় কাই-কুমু তাদের এইজন্যেইদাঁড় বাইবার কাজে লাগিয়েছে, রাত হলেই তীরে এসে ক্যানু বেঁধে ডাঙায় তারা রাত কাটায়। এইভাবে দু-দিন কেটে যাবার পরে আরো-একটা ক্যানু এসে কাই-কুমুর নাগাল ধরলে। তারা যে সদ্য-কোথাও-থেকে লড়াই করে ফিরছে, সে তাদের রক্তমাখা অস্ত্রশস্ত্র দেখেই অনুমান করা যায়। তারা কিন্তু বন্দীদের দেখে অযথা কোনো

কৌতূহল দেখালে না, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাতেই তারা তন্ময়-উটকো কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

তারও দু-দিন পরে ক্যানু পৌঁছুলো এমন-এক জায়গায় সেখানকার জল যেন সবসময়েই টবগ করে ফুটছে। বুড়বুড়ি উঠছে জলে, আর সেগুলো ফেটে গিয়ে কীরকম যেন গ্যাস বেরুচ্ছে অবিশাম। হাওয়ায় গন্ধকের গন্ধ, মাটিতে লৌহ আকরিকের রক্তিম আভা। দু-পাশের তীর ধরে সার-সার গেছে উষ্ণ প্রস্রবণ, ফুটন্ত জল ফোয়ারার মতো উঠে যাচ্ছে শূন্যে, আর সূক্ষ্মজাল জলের শীকরে রোদ্রুর ঠিকরোচ্ছে, ছিটিয়ে দিচ্ছে রামধনুর সাতরঙের বর্ণালি। নিউজিল্যান্ডের জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি টোনাগিরি আর ওয়াইকেরির জ্বালামুখ দিয়ে তপ্ত বাষ্প আর জ্বলন্ত তরল বেরুবার পথ না-পেয়ে যেন পাহাড়ের হাজার চিড় আর ফাটল দিয়ে হাজার ধারায় বেরিয়ে আসছে টগবগে জল আর বাষ্প। হাওয়া পর্যন্ত কেমন যেন থমথমে, তপ্ত, এমনকী নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। তারই মধ্যে প্রায় আড়াই মাইল পথ গিয়ে বাঁক ফিরে হ্রদের মধ্যে ঢুকলো ক্যানু-দু-পাশে দুটো বিশাল-উঁচু পাহাড়, রক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে মাস্জাকিনো আর মাস্জাপেহি, আর তারই মধ্যে এইহ্রদ। হ্রদের একপাশে একটা কুঁড়ে; তার মাথায় উড়ছে একটা নিশেন।

মাওরিদের জাতীয় পতাকা।

দুই

প্রাণ হাতে করে পালিয়ে

হৃদের দুই পাশে উত্তুঙ্গ দুই পর্বতমাঙ্গাকিনো আর মাঙ্গাপেহি, তার একটু দূরেই মোকাই-
একটা জনপদ। নর্থ আইল্যান্ডের প্রায় মাঝখানে এই দুটি পাহাড়-অকল্যান্ড থেকে যতটা
দূরে, প্রায়-ততটা দূরেই আছে ওয়েলিংটন। অর্থাৎ মাওরির দু-দিক থেকে ইংরেজদের
হাতে মার খেতে-খেতে শেষটায় একেবারে নর্থ আইল্যান্ডের দুর্গম মাঝখানে এসে আশ্রয়
নিয়েছে-সম্ভবত শ্বেতাঙ্গ কোনো পর্যটক এখনও এখানে পা দেয়নি, হয়তো জানেইনা যে
এখানে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সানুদেশে স্বাধীন মাওরির তাদের স্বাধীনতার শেষ লড়াই
লড়বার জন্যে এসে জড়ো হয়েছে।

এতটা রাস্তা পেরিয়ে এসে এখানে ঢোকবামাত্র মনে হয় যেন ভূস্বর্গে এসে পৌঁছেছে কেউ।
বিস্তীর্ণ শনখেতে ফুল ফুটে আছে, আর সেই ফুলের মধু খাবে বলে হরেক রঙের জানা-
অজানা পাখি উড়ছে সেখানে। শনের উঁটা থেকে আঠা হয়, প্রায় মোমের মতো ঘনকত-যে
কাজে লাগে। পাতা থেকে তৈরি হয় কাগজ, আর শুকনো পাতা থেকে হয় জ্বালানি, শন
কেটে পাকিয়ে দড়ি আর সুতো দিয়ে বোনা হয় গায়ের ঢোলা জামা, মাদুর, চাটাই।
মাওরির লাল আর কালো রঙে রাঙিয়ে নেয় এই জামা, আর এটাই সম্ভবত তাদের
প্রিয়পসন্দ-কেননা অনেকেরই পরনে এই লাল-কালো আলখাল্লা। একটা গোটা
অর্থনীতিই শুধু নয়, জীবনযাপনের যাবতীয় উপকরণ যেন জোগায় এই শনখেতে-যা
গজায় উর্বর জলাভূমিতে-কোনো হ্রদ বা নদীর ধারে-কিংবা সমুদ্রতীরে।

তীর থেকে দুই ফার্লং দূরে পাহাড়ের ঢালে মাওরিদের একটা নগরদুর্গ-তাদের ভাষায়
তারা তাকে বলে পাহ্। এই পাহ্ ঘেরা তিন দিক থেকে তিন পল্লা বেড়া দিয়ে-বাকি
দিকটা যেন পাহাড়ের ঢালে বসানো।

প্রথম বেড়াছুঁচলো লাঠি দিয়ে তৈরি-প্রায় পনেরো ফিট উঁচু। তারপর শক্ত খুঁটির বেড়া, সবশেষে পাকানো বেত বেঁকিয়ে আরেকটা পল্লা। তারই মধ্য দিয়ে গেছে ভেতরে যাবার দরজা। বেড়া তিনটে পেরিয়ে গিয়ে দেখা যায়, পাহাড়ের গায়েই সমতল খানিকটা জায়গা। সেখানে পর-পর সাজানো রয়েছে চল্লিশটা কুঁড়েঘর।

কিন্তু যে-দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে বন্দীদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেলো, সেটা আর কিছু নয়, দ্বিতীয় বেড়ার খুঁটিগুলোর ওপরে সারি-সারি গেঁথে-রাখা নরমুণ্ড, শূন্য কোটার থেকে মণিবিহীন চোখ মেলে পলকহীন যেন বন্দীদের দিকেই তাকিয়ে আছে। নরমুণ্ডগুলো শত্রুপক্ষের লোকদের মুণ্ড কেটে এইভাবে সাজিয়ে-রাখার রীতিই আছে। মাওরিদের মধ্যে তার সেই রহস্য বার করে ফেলেছে, সেই প্রক্রিয়াটা, যার সাহায্যে নৃমুণ্ডের অভ্যন্তর থেকে মগজ এবং চোখের কোটার থেকে চোখের তারা বার করে এনে দীর্ঘ দিন অবিকৃত রেখে দিতে পারে মুণ্ডগুলো। আর এগুলো তো তাদের পুঁথিপুরাণইতিহাসের অংশ-একেকটা মুণ্ডর সঙ্গে জড়ানো আছে। শৌর্যবীর্য-দেশদ্রোহিতা-বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম-প্রত্যেকটা মুণ্ডই যেন একেকটা কাহিনী শোনাতে চাচ্ছে।

কাই-কুমুর কুঁড়েঘরটা এই নগরদুর্গ পাহ-এর একেবারে শেষমাথায়। দৈর্ঘ্যে বিশ ফিট, প্রস্থে পনেরো ফিট আর উচ্চতায় দশফিট-এই কুঁড়ের চাল ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে মাটি অন্দি নেমে গিয়েছে। কুঁড়ের সামনে পড়ে আছে খানিকটা ফাঁকা জমি, সেখানে দরকার হলে অন্য কুঁড়ে থেকে লোকজন এসে জমায়েৎ হয়, কখনও-কখনও এই ফাঁকা জমিতেই ব্যবস্থা হয় রণসাজে-সেজে কুচকাওয়াজের। ঘরের দেয়ালগুলো কিন্তু অজস্র ছবিতে ভরা-যেমন আছে গাছপালা জীবজন্তুর ছবি-ঐ-তো একটা কিউয়ে পাখির ছবিতেমনি আছে ঘটনাপরম্পরারও ছবি-যেন সরল ও গতিময় টানটোনের মধ্যে শিল্পী ধরে রাখতে

চেয়েছে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। দুরমুশপেটানো মাটির মেঝেয় শুকনো ঝাউপাতা দেবদারুপাতা বেছানো, আর তার ওপরেই পেতে রাখা হয়েছে টাইফা-পাতার মাদুর, লাল আর কালোয় তার ওপরেও আছে অলংকরণ। মেঝের ঠিক মাঝখানটাতেই পাথরটাকা একটা মস্ত গর্ত-এটাই তাদের চুল্লি-আর তারই মাথাবরাবর চালেও একটা ফোকর-সেখান দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায় বাইরে। নর্থ আইল্যান্ডের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দিনে ঘর গরম রাখবার জন্যে এভাবেই ব্যবস্থা করে রেখেছে এরা-এদের ফায়ারপ্লেসও কোনোদিক থেকেই কম কাজের নয়।

যেখানে তার শোবার ব্যবস্থা-করা, তার পাশেই তার ভাড়ারঘর। অনেক ধরনের উদ্ভিদ, গাছের পাতা, শেকড়বাকড় জমানো রয়েছে সেখানে। একপাশে রসুই পাকাবার জন্যে তোলাউনুন রয়েছে-আর তারপরেই তার কোর্যাল-শুওর ছাগল রাখার জায়গা-সেই যবে কাপ্তেন কুক এই জীবনজন্তুগুলোকে নিউজিল্যান্ডে আমদানি করেছিলেন, সেই-থেকেই এরা ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করে মাওরিদের খাদ্য জুগিয়ে গেছে।

কাছেই ফাঁকা একটা কুঁড়েঘরে বন্দীদের নিয়ে ঢোকানো হলো। এখনও অদি মাওরিদের কাছ থেকে ব্যবহারে ভয় পাবার মতো কিছু পাওয়া যায়নি, আবার আশ্বস্ত হবার মতো কোনো ভরসাও কোথাও জোটেনি-তাদের সম্বন্ধে সকলেরই মধ্যে নির্লিপ্তও নির্বিকার-একটা ঔদাসীনি্যের ভাববন্দীরা লক্ষ করেছেন। সোজা একেবারে পাহ-এর অর্থাৎ নগরদুর্গের মধ্যে এনে হাজির করেছে বলেই বন্দীদের উৎকণ্ঠার ভাবটা বেশি। কী মর্জি হবে এদের, কে জানে। শুধু-কি সর্দারের ইচ্ছেতেই সবকিছু হয়, না কি অন্যসকলের কাছ থেকেও মতামত চাওয়া হয়? ভাবগতিক দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই। বন্দীবিনিময়ের প্রস্তাবটায় যদি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাজি না-হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এরা

তাদের গায়ে আঁচড়টি না-কেটেই ছেড়ে দেবেনা? মনের মধ্যে আরো-কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো?

কাই-কুমুর মনের মধ্যে কী আছে না-জানা গেলেও অন্যদের মনের ভাব যে কী, তা একটু জানা গেলো যখন দল বেঁধে মেয়েরা এসে হাজির হলো বন্দীদের দেখতে। কোলাহল-কলরবের মধ্যে থেকে দু-একটা যা ইংরেজি কথাবার্তা কানে এলো, তা থেকে বোঝা গেলো-এরা কেউই মোটেই করুণাময়ী বা মমতাময়ী দেবীপ্রতিমা নয়-বরং সকলেরই সাধ যেন বন্দীদের প্রকাশ্যে মুণ্ডচ্ছেদ হয়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে তেরিয়া মেজাজ একেকজনের। এদেরই কারু ছেলে, কারু ভাই, কারু স্বামী ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে প্রাণ হারিয়েছে-এতদিন ধরে এই সংঘর্ষ চলেছে যে কতজনের যে জীবননাশ হয়েছে তার ঠিক নেই; নানারকম নিগ্রহ-নিপীড়ন হয়তো সহ্য করতে হয়েছে এদের প্রত্যেককেই, মৃত্যু হানা দিয়েছে অনবরত, আর ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাদের আপনজনদের। এদের চক্ষু দিয়ে যদি অনবরত দয়া অশ্রু দরদর করে বয়ে যেতো, তাহলেই বরং অবাক হবার কিছু থাকতো। না-জেনে, অপ্রস্তুত অবস্থায়, নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসের এমন-একটা দুঃসময়ে তারা এখানে এসে পা দিয়েছেন, যে এখন তাদের নিজেদেরই জীবন বিষম একটা সংকটে পড়েছে।

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই সামনের ফাঁকা মাঠটায় দলে-দলে মাওরির এসে হাজির হলো, আর তাদের আসতে দেখে মাওরি মেয়েরাও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। নানা বয়সের সব মানুষ। নেহাৎই কচি-কচি সব কিশোর থেকে মুখে বলিরেখার কুণ্ডনেভরা অতিবৃদ্ধ মাওরি-কেউই বোধহয় বাদ যায়নি। সকলেরই মুখ গম্ভীর, শোকাচ্ছন্ন। কেউ এখানে ফুটি করতে আসেনি, এটা তাদের জীবনে উৎসবের

কোনো মুহূর্ত নয়, যে তারা আনন্দের হাট বসাবে। যারা লড়াই করতে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে অধিকাংশই আর ফিরে আসেনি। কাই-কুমুর নিশ্চয়ই তার সঙ্গে মাত্র এই ক-জন সহযোদ্ধা নিয়ে যায়নি তাকেও রণস্থল থেকে ফিরতে হয়েছে বেশিরভাগকেই পেছনে ফেলে রেখে।

কাই-কুমু কী যেন বললে সবাইকে সম্ভাষণ করে; শান্ত হয়ে চুপচাপ তার কথা শুনলে সবাই। কিন্তু তার কথা থামতেই শুরু হয়ে গেলো বিষম কোলাহল-সকলেই যেন একসঙ্গে কথা কইতে চাচ্ছে; বুড়ো-বুড়িরা কেউ কপাল চাপড়াচ্ছে, কেউবা চাপড়াচ্ছে বুক। হাত-পা ছুঁড়ে অন্যরা যা বলছে, তা জানবার জন্যে হয়তো ভাষাও জানতে হয় না- কেননা তাদের বলার স্বর ত্রুদ্ধ ও রুষ্ট, প্রায় যেন সহ্যের শেষসীমায় এসে পৌঁছেছে তারা।

বন্দীরা তাদের খুপরিটা থেকে সবাই যেন চোখ দিয়ে গিলছিলেন। কানে যা আওয়াজ আসছিলো তার মর্মার্থ বুঝতে এখন আর বাকি নেই। জমায়েতের বেশির ভাগেরই মনোভাব ঠিক তাঁদের অনুকূলে নয়। তবে তাদের নিয়ে এরা যে কী করবে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কারণ আবার একটা হাত তুলে কাই-কুমু সবাইকে থামিয়ে দিয়েছে, তারপর সবাই চুপ করলে পর কী যেন বলেছে তাদের হাত-পা নেড়ে। তারপরেই দেখা গেলো কাই-কুমুর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একজন মাওরি এই বন্দীদের খুপরিটার দিকে আসছে।

এখনই তবে জানা যাবে জমায়েতের সিদ্ধান্ত কী হলো।

হঠাৎ লেডি হেলেনা লর্ড এডওয়ার্ডের কাছে এসে তার হাতটা ধরে শান্ত কিন্তু ধরাগলায় বললেন, এডওয়ার্ড, অন্তত একটা জিনিশ তোমাকে করতেই হবে। জীবন থাকতেও আমাকে বা মেরিকে এই মাওরিরা যেন তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেতে না-পারে। মরতে হলে সবাই একসঙ্গে মরবো। তারপর জামার ভাঁজের মধ্য থেকে একটা ছোট চকচকে রিভলভার বার করে লর্ড এডওয়ার্ডের হাতে খুঁজে দিয়ে বললেন :এই রিভলভারটা আমি আমার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম। এরা কেউ আমার গায়ে হাতও দেয়নি, আমাকে তেমন করে খানাতল্লাশও করেনি-সেইজন্যেই এতক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলুম। এখন এটা আমি তোমাকেই দিলুম। তুমি এটা দিয়ে যা ভালো বোঝো, তা-ই করো।

লেডি হেলেনার হাতে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে একটা চাপ দিয়ে লর্ড এডওয়ার্ড চট করে সেটা তাঁর পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। তার মুখটা কি-রকম কালো হয়ে গিয়েছে, শুকনো, ছায়াবিধুর আর গম্ভীর।

ঠিক সময়মতো রিভলভারটা লুকোতে পেরেছিলেন লর্ড এডওয়ার্ড, কেননা পরক্ষণেই খুপরিটার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো একজন মাওরি, লোকটা তাঁদের চেনা-ক্যানুতে সে কাই-কুমুর সঙ্গেই ছিলো, হয়তো তার ডানহাতই সে। সেইঙ্গিতে সবাইকে বললে তাকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে।

তারই পেছন-পেছন, জমায়েতের একটা ধার দিয়ে, কাই-কুমুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। জমায়েতের লোকেরা চুপচাপ হা করে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে-তাদের মধ্যে উত্তেজনার একটা ঢেউ খেলিয়েছে, যেই তারা পর-পর এসে- দাঁড়িয়েছেন কাই-কুমুর

সামনে। তাদের চোখমুখ দিয়ে আগুন ঝরছে; মানুষের দৃষ্টি যদি কাউকে ভস্ম করে ফেলতে পারতো, তাহলে এম্মুনি হয়তো তারা জীবন্তই ঝলসে মরতেন।

কাই-কুমুকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অনেককেই আগে তারা দেখেছেন ক্যানুতে। পরে মাঝপথে আরো-একটা ক্যানুতে করে যারা এসে যোগ দিয়েছিলো তাদেরও কাউকে কাউকেও সেখানে জটলার মধ্যে দেখা গেলো। দ্বিতীয়-ক্যানুর সর্বদারটিকেলড এডওয়ার্ডের মনে ছিলো, কেননা প্রায় একটা দৈত্যের মতোআকার তার, মুখে ভয়-ডরের কোনো লেশ নেই, সর্বাপেক্ষে উলকিগুলোয় ভীষণ-সব জীবজন্তুর হা করা মুখ, যেন গিলে খাবে শত্রুকে। তার বয়সও বেশি নয়, অন্তত চল্লিশের বেশি হবে না। হট্টাকট্টা জোয়ান। পথে কাই-কুমুকে দেখা গিয়েছিলো এর সঙ্গে বেশ সমীহ করেই কথা বলতে। নিশ্চয়ই দলের লোকদের ওপর তার প্রচণ্ড প্রভাব আছে-কাই-কুমু তাতে যদিমনে-মনে একটু ঘাবড়ে গিয়েও থাকে, মুখে সেটা সে প্রকাশ করেনি-তবে একে চটিয়ে দেবার মতো কিছু করেনি, এমন খাতিরকরে চলেছে যেন সে কিছুতেই কাই-কুমুর ওপর খেপেনা-যায়। মাওরিরা যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকারও দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ছে, তখন সে অহেতুক কোনো গৃহযুদ্ধের কারণ ঘটতে দিতে চায় না-দুজনের মধ্যে দ্বৈষবিদ্বৈষ রেষারেষি যা আছে না-হয় আপাতত চাপাই থাকুক। এই বেপরোয়া মাওরিটির নাম কারা-টিটিআর এমন নামেই মালুম তার প্রকৃতিটা কী-কারণ তাদের ভাষায় কারা-টিটি কথার মানে রগচটা, বদমেজাজি। সে এখন কাই-কুমুর পাশে দাঁড়িয়ে বেশ-তালেবর ভঙ্গিতে সবকিছুর ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। বন্দীদের আসতে দেখেই তার মুখচোখে উত্তট-একটা হাসি ফুটে উঠলো।

লর্ড গ্লেনারভন কাছে এসে দাঁড়াতেই কাই-কুমুজিগেস করলে :তোমরা কারা? ইংলণ্ডের লোক?

হ্যাঁ।

তোমাদের যদি আমরা ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দিই, তবে কি তারা এর বিনিময়ে আমাদের দলের লোকদের ছেড়ে দেবে? বিশেষ করে আমাদের পুরুষ তোবোনগাকে?

জানি না।

জানো না মানে?

আমরা নেহাৎই সাধারণ লোক। আমরা যে এখনে এসেছি, তা-ই ইংরেজ সরকারের কেউ জানে না। তাছাড়া আমরা কেউ জাঁদরেল সেনাপতিও নই, পুরুও নই।

কিন্তু আমরা তোমার বদলে আমাদের পুরোহিতকে ফেরৎ চাই। তোমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি কী ব্যবস্থা করতে পারি-সরকারের কাছে আমার তো কানাকড়িও ড্রাম নেই। তারপরেই লর্ড গ্লেনারভনের চোখ পড়ে গেলো লেডি হেলেনা আর মেরির ওপর। অমনি গলার স্বর পালটে তিনি বললেন : তবে সরকার হয়তো এঁদের কথা বিবেচনা করবেন। মেয়েদের দিকে দেখালেন তিনি। এরা আমাদের দেশের অভিজাত সমাজের মানুষ-সরকারের কাছে নিশ্চয়ই এঁদের মূল্য অনেক।

কথাটা কানে যেতেই কাই-কুমুর মুখে একটা ধূত মৃদুহাসি খেলে গেলো।

তুমি কি আমাদের বোকা ঠাউরেছো? ভেবেছো, যা-খুশি তা-ইবাংলে দিয়ে পার
পাবে?কাই-কুমুর চোখকে ধুলো দেবে? শেষ কথাটা বলবার সময় কাই-কুমুর গলার স্বরে
যেন যতরাজ্যের উত্থা ঝরে পড়লো। আঙুল তুলে লেডি হেলেনাকে দেখিয়ে সে বললে
:এ তো তোমার বৌএ যদি কোনো ওপরমহলের মেয়ে হয়, তাহলে তুমি বুঝি
ওপরমহলের কেউ নও?

লর্ড গ্লেনারভন কিছু বলবার আগেই কাই-কুমুর পাশ থেকে এগিয়ে এলো কারা-টিটি,
সোজা গিয়ে লেডি হেলেনার একটা হাত ধরে বললে :এ যদি ওর বৌ না-হয়, তবে তো
বোঝাই যাচ্ছে-এ আমার বৌ-কারা-টিটি আর কী বলতো, কোনোদিনই জানা যাবেনা।
কেননা তার কথা শেষ হবার আগেই তড়িৎগতিতে লর্ড গ্লেনারভনের হাতে উঠে এসেছে
সেই খুদে রিভলভারটা, আর এমনকী ঠিকমতো তাগ ঠিক না-করেই লর্ড গ্লেনারভন
ঘোড়াটা টিপে দিয়েছেন : গুডুম! এবং, পরক্ষণেই, মাটিতে লেডি হেলেনার পায়ের
কাছেলুটিয়ে পড়েছে কারা-টিটির প্রাণহীন দেহ, ব্যাপারটা ঘটতে সময় লেগেছে বোধহয়
চোখের একটা পলক, কেননা কারা-টিটির দেহটা যখন মাটিতে আছড়ে পড়েছে তখনও
রিভলভারের নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কিন্তু ততক্ষণে লর্ড গ্লেনারভনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাই-কুমুর দেহরক্ষীরা-
একহঁচকা টেনে কেড়ে নিয়েছে তার হাতের রিভলভারটা।তারা হয়তো লর্ড গ্লেনারভনকে
ছিঁড়েই ফেলতো, যদি-না সেই মুহূর্তে শোনা যেতো কাই-কুমুর বজ্রনির্ঘোষ : ছাড়ো!
ছাড়ো! এর গায়ে হাত দেয়া চলবে না। অমঙ্গল! অমঙ্গল!

আর যেন মস্তুর মতো কাজ করেছে কথাগুলো-প্রায় ছিটকেইলর্ড গ্লেনারভনের কাছ থেকে সরে গিয়েছে দেহরক্ষীরা,যদি ধর্মবিরুদ্ধ বলে কাউকে স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়, যদি ট্যাবু বলা হয় তাকে, যদি বলা হয় অমঙ্গল, যেমন বলে পলিনেশিয়ার আদিবাসিন্দারা, তবে কেউ তাকে ছোঁয় সাধ্য কী!

ট্যাবু কথাটা এসেছে পলিনেশিয়ার দ্বীপের আদিবাসিন্দার ভাষা তোঙ্গান থেকে-আর তাদের এই ট্যাবুর প্রয়োগই দেখা গেছে ভিন্ন-ভিন্ন দ্বীপে ও দেশে-তাদের আদিবাসীদের মধ্যে, তারা কখনও বলেছে অমঙ্গল বা অভিশাপ, কখনও-বা বলেছে ধর্মবিরুদ্ধ বা দেবতার রোষ, আর কতকগুলি বস্তু বা জীবকে পুরে দিয়েছেন নিষেধের পটভূমিকায়।

আর এমন না-করেই তাদের কোনো উপায় ছিলো না। বেঁচে থাকার জন্যেই তাদের এমন করে নিতে হয়েছিলো। আর এই পুরো ধারণাটা উৎসারিত হয়েছিলো আদিম একটা প্রবৃত্তি-ভয় থেকে, আতঙ্ক থেকে। বিশেষ করে কাউকে যদি থাকতে হয় কোনো একটা দ্বীপে, যেখানে সমুদ্র গর্জায় আক্রোশে, ঝঞ্ঝা হানে ধ্বংস, অগ্ন্যুগার করে আগ্নেয়গিরি, যেখানে যা অজানা, অচেনা তারই মধ্য থেকে হঠাৎ দুম করে বেরিয়ে আসে সর্বনাশ, যেমন ঐ-যে শিকড়বাকড় তা থেকে যদি আসে গরল,ঐ-যে লতাপাতা ঐ-যে সুন্দর দেখতে ফল তার ভেতর লুকিয়ে থাকে হলাহল, তাহলে সাবধান না-থেকে উপায় নেই, কেননা সাবধানের মার নেই-আবার মারেরও তো সাবধান নেই-কোথেকে যে সে কখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক কী। যেমনভাবে মা তার শিশুকে ভয় দেখায় না-না, আগুনে হাত দিতে নেই, তেমনিভাবেই কোনো-কোনো গোষ্ঠীকে ঠিক করে নিতে হয়-না-না, এটা ছোঁয়াও চলবেনা,ছুলেই বিপদ হবে, সর্বনাশ হবে, ভয়ংকর-কিছু-একটা হবে

যেটাকে আর-কিছুতেই শামাল দিয়ে ওঠা যাবে না। এমনতর যে হলো, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই রুম্ব বন্ধুর সিন্ধুজলে ঘেরা মাটির একরত্তি একটা জায়গাতে এসেই প্রাণ তার জয়ের নিশান উড়িয়েছে, আর সে-জায়গাটাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, সাবধানে আগলে-আগলে রাখতে হবে, ঐ তো দ্যাখোনি সেবার বন্যায় সব কুড়েবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, নদী কী-রকম ফুলে ফেঁপে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো গোটা লোকায়ের ওপর-ফলে নদীকে কখনও চটতে দিলে চলবে না, দেখতেহবেকিছুতেই নদীর যেন আবার মেজাজ খারাপ না-হয়, সে যেন আবার সকলের ওপর রাগ না-করে বসে! তেমনি আগুনের পাহাড়টাকেও চটিয়ে দিলে চলবে না, ঝড়ের রাতের ঐ বাজবিদ্যুৎকেও না; বরং যে-সব জায়গায় থাকলে অতর্কিতে মরণ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সে-সব জায়গা থেকে হাজার হাত দূরে থাকাই ভালো, এখনও তো ভালো করে জানা নেই কেন। মাটি কেঁপে ওঠেহঠাৎ-হঠাৎ আর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে বড়ো-বড় পাথরের চাই, ভেঙে পড়ে গাছপালা, ঘরবাড়ি, গোটা-গোটা সব পাহ। অমঙ্গল! অমঙ্গল! ঘোর অমঙ্গল! ছিটকে দূরে সরে এসো তার কাছ থেকে কিছুতেই আর তার সঙ্গে গাঁ ঘেঁসাঘেসি করতে যেয়ো না-বন্ধুভাবেও না, শত্রুভাবেও না-জানো না তো কীসে সে খেপে উঠবে, তারপর একেবারেই আর বাগ মানানো যাবে না তাকে!

আর এই বোধ থেকেই জন্ম নিলো রীতিনীতি পালপার্বণ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান। কেননা কাকে কীভাবে ছুঁলেই যে তার ভেতর জেগে ওঠে প্রচণ্ড অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা সে দুষিত হয়ে গিয়ে সবকিছু বিপজ্জনকভাবে নষ্ট করে যায়-তার কোনো হদিশই তো জানা নেই। ন্যায়নীতিই হোক, রুচিকুরুচিই হোক-কোনো-কোনো জিনিশ তাই গহিত, কোনো-কোনো কাজের মধ্যে তাই মারাত্মক ঝুঁকি আছে, কোনো-কোনো বস্তুর মধ্যে তাই লুকিয়ে আছে

অপরিসীম রহস্যময় কোনো শক্তি, মানুষের-চাইতেও-বড়ো, -যেটা হয়তো পান থেকে চুন খসলেই লাগামছেঁড়া কোনো দুর্যোগের মতো ধেয়ে আসবে ও।

আর এই মঙ্গল-অমঙ্গলের বোধই ধরে রেখেছে গোটা সমাজটাকে।

যে-মুহূর্তে তাই কাই-কুমু চেষ্টা করে উঠলো : ছাড়ো-ছাড়ো! এর গায়ে হাত দেয়া চলবে না! অমঙ্গল! অমঙ্গল!, অমনি তার দলের লোকেরা আঁৎকে উঠে পেছিয়ে এলো, লর্ড গ্লেনারভনকে ছেড়ে দিলো।

লর্ড গ্লেনারভনকে ধরে তার দলের লোকেরা যখন ছিঁড়ে ফেলতে গেছে, তখনই কেন কাই-কুমু অমঙ্গল! অমঙ্গল! বলে চেষ্টা করে উঠেছে? সে কি তবে ভেবেছে যে তাঁর মধ্যে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি আছে-যার বলে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও জামার ভেতর থেকে বার-করে এনেছেন আগুনওগরানো রিভলভার? না কি সে ভেবেছে, লর্ড গ্লেনারভনকে মেরে ফেললে কিছুতেই আর দরকষাকষি করা যাবে না ইংরেজদের সঙ্গে, তার বিনিময়ে মুক্তি কিনে-আনা যাবে না তাদের জাদুজানা অসীম শক্তিদর পুরুপ্রধান তোহোনগার? না কি সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেছে এই লর্ড গ্লেনারভনের জন্যেই এখন অপসৃত হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তারই পদাকাক্ষী রগচটা ঐ কারা-টিটি, আর তাই এইমুহূর্তে সে কৃতজ্ঞতার বশেই প্রাণে মেরে ফেলতে চায়নি লর্ড গ্লেনারভনকে?

কারণ যা-ই থাক না কেন, কাই-কুমুর নির্দেশে মাওরির লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে অন্য বন্দীদেরও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলো পাহাড়ের ঢালে, আর্বো-ওপরে, যেখানে তাদের দেবতার মন্দির। তারপর মন্দিরের ভেতরে তাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে

দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলো মাওরির-বাইরে কড়াপাহারায় রইলো সশস্ত্র একদল প্রহরী।

আর ঠিক তক্ষুনি লর্ড গ্লেনারভন আবিষ্কার করলেন, মঁসিয় পাএয়ল আর রবার্ট ছাড়া তারা সবাই আছেন এখানে। মেরির অবস্থা ক্রমশই সঙিন হয়ে উঠেছে। আর তাকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো কথাও ঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না লেডি হেলেনা। জন ম্যাঙ্গলস্ সমুদ্রের তুলকালাম ঝড়েও কোনো ভয় পান না, এখন তিনিও কী-রকম যেন ঘাবড়ে গিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। মেজর ম্যাকন্যাবসকে সবাই জানে হাজার বিপদেও চিরকাল মাথা ঠাণ্ডা রাখেন, আর মাথা হয়তো এখনও তার ঠাণ্ডাই আছে, কিন্তু এটা তিনি জানেন না ম্যাঙ্গাকিনো আর ম্যাঙ্গাপেহির মাঝখানে, এই পাহাড়ঘেরা উপত্যকায়, মাওরিদের এই মন্দিরে এইভাবে যে তিনি বন্দী হয়ে আছেন-এই অবস্থায় তিনি ঠিক কী করবেন। কারা-টিটিকে ও-রকম অতর্কিতে অপ্রত্যাশিতভাবে হত্যা করার জন্যে লর্ড গ্লেনারভনকে একটা মাশুল দিতেই হবে, এবং সেটা মৃত্যু-আর একবার যদি তাকে এরা হত্যা করে, তবে অন্যদেরও এরা নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কইবে না। কাই-কুমুর মনের মধ্যে যে সত্যি কী আছে, সেটা অনুমান করাও অসম্ভব-যতই অমঙ্গল! অমলঙ্গল! বলে সে চেষ্টা ট্যাবুর স্মরণ নিক, তাদের সে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেবার জন্যেই নিশ্চয়ই এখানে বন্দী করে আনেনি। আর-কোথায় গেছে রবার্ট গ্রান্ট-আর সেই সঙ্গে, ঐ আধপাগলা ফরাশি পণ্ডিত-জাক পাএয়ল? তাদের কি এর মধ্যেই বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে এরা? কোথায় তাহলে সেই বধ্যভূমি?

এইসব বিদঘুটে সব ভাবনায় তার মাথার মধ্যেটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠতে চাচ্ছে। ছটফট করেই কেটেছে সারা রাত-কিন্তু রবার্ট আর জাক পাএয়লের কী হলো, সেটা

জানবার কোনো উপায় খুঁজে পাননি মেজর ম্যাকন্যা-বাইরে যে সশস্ত্র যোদ্ধার দল পাহারা দিচ্ছে, তারা হয়তো জানে ঐ দুজনের হৃদিশ-কিন্তু তাদের জিগেস করবার কোনো সুযোগ হয়নি-কেননা তারা কখনও এমনকী এই বন্দীশালার দরজার কাছেও আসেনি।

অথচ সময় যখন থেমে গেছে বলে মনে হচ্ছে, তখনও একসময় ভোর হয়ে এলো। মাওরিদের দিক থেকে তবু কোনো সাড়া এলো না। সারাদিন কাটলো সেই অস্থির জিজ্ঞাসায়-কী করতে চাচ্ছে এরা, তাদের বন্দী করে রেখে? যদি দেবতার কাছে বলি দেবে বলেই ঠিক করে থাকে, তাহলে তাদের আর খোঁজখবর নিচ্ছে না কেন? পুরুৎসা কি কোনো বিশেষ লগ্নের অপেক্ষায় আছে এখন? তারা কি এমন-কোনো বিশেষ ক্ষণের অপেক্ষা করছে, যখন এই-যারা তাদের অমঙ্গল ডেকে এনেছে, তাদের মহাধুমধাম করে বলি দিলে দেবতারা আর রুষ্ট হবেন না? না কি বন্দী-বিনিময়ের ভাবনাটাই কাই-কুমু এখন বাতিল করে দিয়েছে?

নিজেদের মধ্যে কথা বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিলো না। মেজর ম্যাকন্যাসের শুধু মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো, কারা-টিটিকে হত্যা করে লর্ড গ্লেনারভন বোধকরি কাই-কুমুর শত্রুকেই উৎপাটিত করেছেন-তার হয়তো মনে হয়েছে যে সে কাটা দিয়েই কাটা তুলেছে, যে-প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে তার পথ থেকে সরাতে চাচ্ছিলো, তাকে হত্যা করে লর্ড গ্লেনারভন হয়তো তার সাহায্যই করেছেন?

পর-পর তিন দিন বাইরে শয়ান রইলো কারা-টিটির মৃতদেহ, প্রায় রাজকীয় শোকপালনের মতোই যেন ব্যাপারটা। তারপরে তারা তার অন্ত্যোষ্টি সারবে, আর তখনই

নিশ্চয়ই বন্দীদের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবে। অন্তত তিনদিন পরে যখন বন্দীশালার দরজা খুলে দেয়া হলো, তা-ই মনে হলো মেজর ম্যাকন্যাসের : এবার একটা-কিছু ফয়সালা হবে। কারণ নগরদুর্গের বড়ো চটকায় জড়ো হয়েছে কয়েকশো মাওরি নারীপুরুষ-আবালবৃদ্ধবনিতা-কিন্তু তারা কেমন থম মেরে আছে, অস্বাভাবিক শান্ত, যেন ঠিক ঝড়ের আগেকার আকাশ-বাতাস।

কাই-কুমু এসে উঠে দাঁড়িয়েছে একটা ছোট টিবির ওপর। তার পেছনে চাঁদের কলার মতো অর্ধবৃত্তাকারে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন মাওরি যোদ্ধা। আর পাহারারা এসে বন্দীদের নিয়ে গেলো কাই-কুমুর সামনে।

বন্দীরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, গম্ভীরগলায় লর্ড গ্লেনারভনকে জিগেস করলে কাই-কুমু :
কারা-টিটিকে তুমি হত্যা করেছো?

এমন প্রশ্নের উত্তর কী হয়? হ্যাঁ।

কাল সকালে সূর্যোদয়ের সময় তোমার মরণ হবে।

শুধু আমার?

শুধু তোমার। অন্যরা থাকবে, তোহোনগাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাদের চাই-
বদলাবদলির জন্যে দরকার হবে।

ঠিক এমন সময়ে একটা উত্তেজিত কোলাহল উঠলো জমায়েতের একপ্রান্তে। দেখা গেলে, দ্রুতপায়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে একজন যোদ্ধা, তার সারা-গা ধূলিধূসর মুখে প্রচণ্ড ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু কোন-এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সে তবু এগিয়েও আসছে এইদিকেই।

তাকে দেখেই কাই-কুমু কেমন যেন উদ্ভিন্ন হয়ে উঠলো। বন্দীরা যাতে বুঝতে পারে, সম্ভবত সেইজন্যেই পরিষ্কার ইংরেজিতে জিগেস করলে : পাকিস্তানের (শ্বেতাঙ্গদের) শিবির থেকে আসছে?

সে শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

এখনও কি তোহোনগা সেখানে আছে? তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

দেখেছিলাম একবার, যখন ইংরেজরা তাকে একটা খুঁটির গায়ে বেঁধে গুলি করে মেরে ফেললো!

এইই তবে শেষ! ফায়ারিংস্কোয়াডের গুলিতে তোহোনগার এই মৃত্যু বন্দী বিনিময়ের সমস্ত চেষ্টাকেই যেন বিষম উপহাস করে একধাক্কায় ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

ঘুরে দাঁড়ালে কাই-কুমু। কাল সকালে সূর্য ওঠবার সময়, খুব শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে সে বললে, তোমাদের প্রত্যেককে মরতে হবে।

বলেই সে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তার নিজের ভাষায় সে অনুচরদের দিকে ফিরে হুকুম দিলে কারা-টিটির অন্ত্যোষ্টির-আর অমনি জমায়েতের মধ্য থেকে উঠলো হাহাকারের রোল-বুক চাপড়ে টেনে-টেনে সুর করে কাঁদতে লাগলো মাওরিরা।

আসলে এই অপঘাতমৃত্যু তো শুধু কারা-টিটির নয়-তার সঙ্গে-সঙ্গে এখন পরলোকে যেতে হবে তার স্ত্রীকেও-কেননা মৃত্যুর পরপারে গিয়েও তাকে সঙ্গে দিতে হবে তার স্বামীকে, যাতে সে একা-একা হন্যে হয়ে প্রেতলোক থেকে ফিরে এসে পুরো পাহ-র ওপর হানা না-দেয়। বেঁচে থাকবার সময় কারা-টিটি যেভাবে জীবনযাপন করতো, মৃত্যুর পরেও সে যাতে সেইভাবেই তার দিন কাটাতে পারে, সেইজন্যেই শুধু তার স্ত্রীকেই নয়, যারা তার সেবা করতো সেই অনুচর-পরিচরদেও এবার মৃত্যুর পরপারে যেতে হবে তাকে সঙ্গে দেবার জন্যে। আর এরা যাতে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হতে পারে সেইজন্যেই কারা-টিটির মৃত্যুর পর তার অন্ত্যোষ্টির ব্যবস্থা করতে এই তিনটে দিন গেছে। অর্থাৎ, মরা নেতার যাতে সেবার কোনো ত্রুটি না-হয়, সেইজন্যে মরতে হবে অন্যমানুষদেরও। বহুযুগের ওপার থেকে এই-যে অনড় এবং অমোঘ নিয়ম চলে আসছে, এটা সমাজের সবাই জানে : এই ব্যবস্থাই তো চলে আসছে যুগ থেকে যুগে, স্মরণাতীত কাল থেকে। এই নিয়ম যে কখনও বাতিল করে দেয়া যায়, এটা কখনোই কারু মাথায় আসে না-সবাইকে বরং বিনাপ্রতিবাদে মেনে নিতে হয় এই মৃত্যু এবং যারা মরবে তাদের ঘিরে বেজে-ওঠে ডুকরে-ওঠা হাহাকার; কিন্তু এই হাহাকার বোধহয় যারা এখন মরবে, তাদের জন্যে নয়, বরং যে আগেই মরে গিয়েছে, তার জন্যে। মাস্গাপোহি পাহাড়ের চূড়ায়, এখান থেকে। দূরে, তৈরি হয়েছে সমাধিভবন-তার চারপাশে লালরং-করা সারি-সারি খুঁটি বসানো-একটা চৌখোপ-মতো-সেখানে নিয়ে-যাওয়া হবে স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ, সঙ্গে তাদের সেবকদের প্রাণহীন দেহও যাবে-সেখানে এরই মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

প্রেতাত্মাদের তৃপ্তির জন্যে খাদ্য ও পানীয়, আর চারপাশে থরেথরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, বাসনকোসন, গয়নাগাটি আর সাজগোজের আয়োজন-যাতে কোনোরকম কষ্টই না-হয় এই মৃতদের। আর একবার সেখানে তাদের রেখে আসার পর ঐ লাল খুঁটি দিয়ে ঘেরা জায়গায় আর-কারু যাবার অধিকার থাকবে না-এটা তখন হয়ে যাবে কারা-টিটির জায়গা,বাকিদের কাছে এ-জায়গা হবে নিষিদ্ধ, সেখানে অনধিকার প্রবেশ করে মৃতের শান্তিভঙ্গ করার কথা এমনকী দুঃস্বপ্নেও আর-কারু মনে হবে না, এ-জায়গাটা অন্যদের কাছে ট্যাবু হয়ে যাবে, অমঙ্গলের অকুস্থল-কেননা যে-ই এখানে পা দেবে তারই কাঁধে বসবে প্রেতাত্মা-আর গোটা গোষ্ঠীর জীবনই তাতে বিপন্ন হয়ে উঠবে।

যখন শোভাযাত্রা করে মৃতদেহ নিয়ে-যাওয়া হলো ঐ লাল খুঁটিতে ঘেরা প্রেতভবনে, বন্দীদের ফের ফিরিয়ে আনা হলো মন্দিরের সেই বন্দীশালায়। পরদিন মাঙ্গাকিনোর ওপর সূর্যের প্রথম আলো পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্দীদের নিয়ে-যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। মাত্র একটা রাত, তারপরেই সব শেষ হয়ে যাবে।

এরইমধ্যে তাদের জন্যে বন্দীশালায় খাদ্য ও পানীয় রেখে গেছে প্রহরীরা।নিঃশব্দে সবাই তাদের শেষ পানভোজন শেষ করলেন-কারু মুখে টু শব্দটি নেই, কে যে কী ভাবছে কেউ জানে না; সত্যি-তো, কী ভাবে লোকে, যখন জানে আর কয়েক ঘন্টা বাদেই অমোঘ মৃত্যু এসে হানা দেবে?কিশোরী মেরি গ্রান্ট কী ভাবছে এখন; কাণ্ডেন জন ম্যাঙ্গলসের সঙ্গে তার যে মন-দেয়া-নেয়ার পালা শুরু হয়েছিলো এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায়, তার যে পরিণাম এমন হবে, সে কি কখনও তা স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলো-ব্যর্থ, বিফল, অপূর্ণ! আর লেডি হেলেনা ও লর্ড গ্লেনারভন-তারা সবে তাঁদের প্রমোদতরী তৈরি করে মহড়া দিতে বেরিয়েছিলেন সমুদ্রে, আর হঠাৎ একটা হাঙরের পেট থেকে বেরিয়ে

পড়লো একটা বোতল-আর জলে-ধুয়ে-যাওয়া তিনটে চিরকুট! আর সেটাই যেন ছিলো নিয়তির ডাক-এত-পথ তাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে শেষটায় এনে হাজির করেছে এই-কোন বিদেশ-বিভুঁইয়ে, ঠিক মৃত্যুর আগের রাতটায়! বেচারি রবার্ট গ্রান্ট-ভেবেছিল কাপ্তেন গ্রান্টের মতোই জাহাজ চালাবে, সে এমনকী জাহাজ চালাবার ঘাতঘোঁৎ এখনও শিখে উঠতেই পারেনি, যতই কেননা তার থাক দুর্মর অধ্যবসায় আর দুর্জয় উৎসাহ! আর কাপ্তেন জন ম্যাঙ্গ-সদ্য একটা চমৎকার স্টিমশিপের পূর্ণদায়িত্ব পেয়েছিলেন-আর মনে হয়েছিলো এই বুঝি তার জীবনে সুদিন সবেমাত্র শুরু হলো, কেননা প্রায়-তৎক্ষণাৎ তার পরিচয়-আর ঘনিষ্ঠতাও-হলো তরুণী মেরি গ্রান্টের সঙ্গে-কিন্তু সব পথ এসে শেষকালে শেষ হয়ে গেলো এই মৃত্যুপুরীতে! মেজর ম্যাকন্যাব্স-তার এই পঞ্চাশ বছরের জীবনে কমবার তো মুখোমুখি হয়নি মৃত্যুর-কিন্তু তিনিও কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন এমনভাবে একদিন মৃত্যু তার ভয়াল চোখ মেলে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে?

চারদিন আগে লাঞ্চার ভয়ে নিজের জামার মধ্যে লুকোনো রিভলভারটা লর্ড গ্লেনারভনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন লেডি হেলেনা, যদি দ্যাখো আমার ইজ্জতে টান পড়েছে, আমাকে গুলি করে মারতে দ্বিধা কোরো না, বলেছিলেন এইরকম কোনো কথা,এখন সেই রিভলভার কেড়ে নিয়ে গেছে মাওরির-কারা-টিটিকে গুলি করার পর। এখন আর-কোনো অস্ত্রই নেই তাদের হাতে। না কি আছে আর কোনো শেষঅস্ত্র?

গ্লেনারভন চাপাগলায় জন ম্যাঙ্গকে জিগেস করলেন : জন, মেরি তোমাকে যা বলেছে, সেটা তুমি করতে পারবে তো? হাত কাঁপবে না তো?

নিশ্চয়ই, বলেই জামার ভেতর থেকে একটা ছোরাবারকরে দেখালেন কাপ্তেন, আপনি কারা-টিটিকে গুলি করবামাত্র যে-হুঁলুস্থলু বেঁধে গিয়েছিলো, সেই সুযোগে আমি কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিয়েছিলুম।

মেজর ম্যাকন্যাশান্তগলায় শুধু বললেন, দুম করে হঠাৎ কিছুকরে-বসাঠিক হবে না।

লর্ড গ্লেনারভন দৃঢ়ভাবে বললেন : আমরা তো সবাই মরতেই বসেছি-তাহলে মিথ্যে আর মরণকে অত ভয় পাবো কেন? কিন্তু মৃত্যুর বাড়াও একটা জিনিশ আছে-সেটা কারু ইজ্জৎ, মানসম্মান-তাতে কোনো আঁচড় পড়ুক, তা আমি চাই না।

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স উঠে গেলেন একবার, দরজায় মাদুরের পল্লা ঝোলানো, সেটার একটা কোণা তুলে উঁকি দিলেন বাইরে। দূরে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। তার পাশ থেকেই জনাপঁচিশ সশস্ত্র প্রহরা কড়ানজর রেখে যাচ্ছে এইদিকে। সেখান থেকে সরু-একটা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসেছে দরজাটা অন্ধ-সজাগ পাহারার চোখ এড়িয়ে এ-পথ দিয়ে দু-পাও যাওয়া যাবে না। এছাড়া এই বন্দীশালার দু-পাশ দিয়ে নেমে গেছে গভীর খাদ, কম করেও একশোফিট গভীর খাদ-পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে সোজা, খাড়াই সরাসরি ঘন অন্ধকারের মধ্যে-সেখান দিয়ে বেয়ে পালাতে পারবে শুধু-কোনো সরীসৃপ, আর-কেউ নয়। অর্থাৎ : পালাবার কোনো রাস্তা নেই কোথাও।

আকাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঘন মেঘে ঢাকা পড়েছে চাঁদ আর তারারা, কেমন যেন থমথম করছে সব, শুধুউদ্দাম হাওয়ার ঝাঁপটা আসছেমাঝে-মাঝে, আর দপদপ করে

লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। অমনি চোখে পড়ে যাচ্ছে পাহারাদের, কেউ বসে কেউ-
বা দাঁড়িয়ে, তাদের কারু চোখে ঘুম নেই।

ঘুমকে অবশ্য বিদায় দিয়েছেন বন্দীরাও, সেইসঙ্গে বিদায় নিয়েছে কথা, হয়তো এখন
আর চিন্তারও কোনো অবকাশ নেই কারু মনের মধ্যে বুকের মধ্যেটা কি-রকম ফাঁকা
লাগছে, যেন যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিলো সেখানে শুধু ফাঁকা-একটা গহ্বরের মধ্যে ধূপ-ধাপ
শব্দ ছাড়া আর-কিছুই নেই।

আর কখন যে এরই মধ্যে রাত চারটে বেজে গেছে কারু খেয়াল ছিলো না। হঠাৎ
অন্যমনস্ক মেজরের কানেকি-রকম অস্পষ্ট একটা আওয়াজ এসে পৌঁছুলো। উৎকর্ণ হয়ে
শুনলেন মেজর-আওয়াজটা যেন আসছে বন্দীশালার পেছন দিক থেকে। কীসের
আওয়াজ ওটা? কেউ যেন মাটি আঁচড়াচ্ছে। না-না, কেউ বোধহয় মাটি খুঁড়তে চাচ্ছে।

নিঃশব্দে মেজর ম্যাকন্যাব্স উঠে গেলে লর্ড গ্লেনারভন আর জন ম্যাঙ্গলসের কাছে।
ঝুঁকে, চাপাগলায়, প্রায় ফিশফিশ করেই যেন বললেন, ঐ শোনো!

আওয়াজটা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ যেন কোনো ধারালো যন্ত্রের ঘায়ে
মাটি খসিয়ে দিচ্ছে-একটা খশখশ শব্দ হচ্ছে, আর ঝুরঝুর করে গুঁড়োমাটি ঝরে পড়ে
যাচ্ছে।

কেউ নিশ্চয় বাইরে থেকে গর্ত খুঁড়ে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে!

তক্ষুনি এদিক থেকেও হাত লাগিয়ে দিলেন এঁরা। ছোরা আছে একটাই, সেটা কাণ্ডেন ম্যাঙ্গসের কাছে, কিন্তু তার জন্যে যেন আর তর সহিছিলো না-আর-কিছু না-থাকে তো আঙুল তো আছে, আঙুলে তো নখ আছে এরই মধ্যে একবার মাদুরের পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে এলো মুলারাডি। না, প্রহরীরা কিছু টের পায়নি। তারা সজাগ কিন্তু নিশ্চিত বসে আছে এখন-নিভুনিভু ঐ আগুনের কুণ্ডটা ঘিরে।

এদিকে আওয়াজটা এখন আগের চাইতে অনেক জোরালো হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই কেউ একটা ফাঁকফোকর তৈরি করতে চাচ্ছে দেয়ালে। কিন্তু কেন? মতলব কী তার? সে কি কোনো অজ্ঞাত বন্ধু? শত্রুই যদি হবে, মাওরিদেরই কেউ, তাহলে সে খামকা কেন এভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইবে?

এ-কথা ভাবামাত্র পাঁচজোড়া হাত চললো দুনো উৎসাহে ভর দিয়ে। নখের ভগা ভেঙে গেলো, রক্ত ঝরতে লাগলো, বিশীরকম ব্যথা করছে, কিন্তু তবু কারু মধ্যে দমে যাবার কোনো লক্ষণ নেই। প্রায় হাত-তিনেক গর্ত হয়ে যাবার পর হঠাৎ ধারালো একটা-কিছুতে হাত কেটে গেলো মেজর ম্যাকন্যাসের। অস্ফুট আর্তনাদটা গিলে ফেলে ম্যাকন্যাস একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা সরিয়ে আনলেন।

আর অমনি দেয়ালের গায়ের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে এলো ছুরি-সমেত একটা হাত। কিছু না-ভেবেই তক্ষুনি কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স শক্ত করে চেপে ধরেছেন মণিবন্ধটা, আর কজিতে চাপ পড়তেই ছুরিটা মুঠো থেকে খসে পড়ে গেল। কিন্তু হাতটা কার? এ তো কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের চওড়াও কঠিনমণিবন্ধ নয়। কোনো মেয়ের? কোনো অল্পবয়সি

ছেলের? কিন্তু যারই হাত হোক না কেন-এটা কোনো মাওরি হাত নয়, একজন শ্বেতঙ্গের হাত।

নিচুগলায় অনুমানটা উচ্চারণ করেই ফেললেন লর্ড গ্লেনারভন : রবার্ট!

এইসব অর্ধস্মুট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো লেডি হেলেনার। মেরি নামটা শুনেই প্রায় যেন ছিটকে চলে এলো ফোকরটার কাছে, সরু মণিবন্ধটা চেপে ধরে কম্পিত বিহ্বল স্বরে বলে উঠলো : রবার্ট! রবার্ট!

ফোকরটার মধ্যে দিয়ে ভেসে এলো রবার্টের গলা : হ্যাঁ, আমি সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছি।

ছেলেটা দেখছি বেরোয়া-একটুও ভয়ডর নেই, গ্লেনারভন বলে উঠেছেন তখন।

ওধার থেকে নিচুগলায় আওয়াজ এলো : আগে দেখে নিন-ওখানে পাহারারা কী করছে?

মুলারাডি জানালে, শুধু চারজন দাঁড়িয়ে আছে-বাকিরা বোধহয় বসে-বসে ঢুলছে।

এদিকে কিন্তু সেই গর্তের মুখটা বড়ো ও সুপারিসর করার কাজ অবিশ্রাম চলেছে। আর তারপরেই তার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে ভেতরে গলে এলো রবার্ট। সারা গায়ে জড়ানো ঐ শনের দড়ি-যে-শন দিয়ে সব কাজই সারে মাওরিরা।

কেমন করে পালিয়েছিলি তুই,এতক্ষণে আবেগবিহ্বল মেরির মুখে বুলি ফুটেছে।

ঐ যখন হুলুস্থুল পড়ে গেলো-কারা-টিটি মরে যেতেই-কেউ কি তখন আর অন্য কোনোদিকে তাকাচ্ছিলো নাকি? দু-দিন দু-রাত জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিলুম, তারপর মাওরিরা যখন অস্ত্রোষ্টির জন্যে দলে-দলে নিজেদের কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, তখন ফাঁকা-একটা কুঁড়েঘরের মধ্য থেকে এই দড়ি আর ছোরা নিয়ে এসেছি তোদের নিয়ে যেতে। বুনো আগাছার চাপড়া আর কাটাগাছের ঝোঁপ ধরে ওপরে বেয়ে উঠেছি কোনোরকমে-তারপর বেশ খানিকটা উঠে আসার পর একটা পইঠার মতো পেয়ে গেলুম-ধস নেমে একটা জায়গা বেশ-একটা সিঁড়ির ধাপের মতো হয়ে উঠেছে। তারপর ছোরার ঘায়ে মাটি খসাতে-খসাতে-এই-তো, আমি এখন তোদের কাছে এসে হাজির। চল, আর দেরি নয়। দিন হবার আগেই আমাদের কেটে পড়তে হবে।

মঁসিয় পাএওয়ল বুঝি নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন? গ্লেনারভন জিগেস করলেন।

এবার করিৎকর্মা রবার্টের একটু ভাবাচ্যাকা খেয়ে যাবার পালা। কই-না তো?

মঁসিয় পাএওয়ল তোমার সঙ্গে পালাননি?

না। আমি তো ভেবেছি উনিও আপনাদের সঙ্গেই বন্দী হয়ে আছেন।

আরো হয়তো কথা চলতো, কিন্তু মেজর ম্যাকন্যাব্স তাড়া লাগিয়েছে তখন-মঁসিয় পাএওয়লের কথা পরে বরং ভেবে দেখা যাবে। এখন চটপট এখান থেকে আমাদের সরে-পড়া উচিত?

ঐ গর্তটা দিয়ে কোনোরকমে শরীরটা গলিয়ে নিয়ে এক-এক করে সবাই নেমে এলেন পাহাড়ের গায়ে ধস-নেমে-গড়ে-ওঠা সেই খাঁজটায়-রবার্ট যেটাকে সিঁড়ির ধাপবলে বর্ণনা করেছিলো। তারপরেই কাণ্টন ম্যাঙ্গল্‌স একটা তেরচামতো প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে বেঁধে দিয়েছেন দড়ি। ঐ দড়ি বেয়েই নেমে যেতে হবে নিচে, খুব-সাবধানে, একটু ফসকালেই নিচে খাদে পড়ে যেতে হবে।

সবচাইতে আগে নেমে গেলো রবার্ট-দড়ি ধরে ঝুলতে সে ওস্তাদ, কতবার ডানকানের মাস্তুলের দড়ি বেয়ে-বেয়ে সে ওঠানামা করেছে। তারপর একে-একে নামলেন ম্যালকম কাসুলের তরুণ দম্পতি-লর্ড গ্লেনারভন ও তার স্ত্রী। আর লেডি হেলেনার পা বোধহয় একটু বেকাদায় পড়েছিলো পাহাড়ের ঢালে-কতকগুলো আলাগা নুড়িপাথর বেশ শব্দ করেই খসে পড়লো নিচে।

অমনি ওপর থেকে নিচুগলায় শশশ! বলে সাবধান করে দিলেন কাণ্টন ম্যাঙ্গ। গ্লেনারভনরা তখনও পুরো নেমে যেতে পারেননি, দড়ি ধরেই তারাশূন্যে ঝুলতে লাগলেন।

উইলসন তখনও পাহারায় ছিলোবন্দীশালার মাদুরের পাশে। সে দেখতে পেলে, ঐ পাথর খসে-পড়ার আওয়াজ শুনে পাহারাদের একজন এদিকে চলে আসছে ব্যাপার কী দেখতে, আর অমনি সে সাবধান করে দিয়েছে কাণ্টন ম্যাঙ্গকে। মাওরিটি কিন্তু বন্দীশালার দরজার কাছে এসেও ভেতরে ঢোকেনি বা মাদুরের পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে মাথা গলায়নি-হয়তো তার সেই অধিকার ছিলো না। সে একটুম্ফণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কানখাড়া

করে রইলো, কিন্তু আর-কোনো সন্দেহজনক আওয়াজ না-শুনে সে আবার আগুনের
কুণ্ডের দিকেই ফিরে গেলো।

উইলসন হালকা একটা শিস দিয়ে জানালে, রাস্তা সাফ, অমনি কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স সবাইকে
জানালেন সাবধানে নিচে নেমে যেতে, খুবহুঁশিয়ার, ও-রকম শব্দ যেন আর না-হয়।

তারপর নেমে এলেন কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স নিজে, মেরিকে নিয়ে, এবং তারপর এক-এক
করে বাকি সবাই।

এবং সবাই নেমে আসতেই আর দেরি নয়। সবাই খুব-সন্তর্পণে প্রেতপাহাড়ের দিকে
চললেন। পা টিপেটিপে, চুপি-চুপি, প্রাণ হাতে করে-একটুও শব্দ যেন না-হয়, অথচ
যত-তাড়াতাড়ি-সম্ভব পালাতে হবে। আর একটু পরেই দিনের আলো ফুটবে-আর
তারপরেই ফাঁস হয়ে যাবে বন্দীশালায় কেউ নেই, বরং পেছনের দেয়ালে একটা গর্ত-
যেটা দেখে সবচেয়ে আকাট বোকারও বুঝতে অসুবিধে হবে বন্দীরা কোন পথ দিয়ে
পালিয়েছেন।

আর তারপরেই উঠে এলো সূর্য!

আর অমনি চারপাশে খ্যাপা কোলাহল, চীৎকার, চাঁচামেচি, হুলুস্থুল!

পুরো পাহাড়টাই যেন ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠেপড়েছে। আর তাদের পেছনে হৈ-হৈ
করে ছুটে চলে আসছে মাওরিরা, হন্যে, ক্ষিপ্ত, সশস্ত্র।

এবার আর গোপনে গাঢ়াকা দিয়ে চলা নয়-প্রাণ হাতে করে ছোটা।

আরো অন্তত শ-খানেক ফিট উঠে গেলে, পাহাড়ের চুড়ায় পৌঁছানো যাবে, তারপর ছুটে নামতে হবে অন্যদিকের ঢালটা বেয়ে। কোথায় যাবে-কারু জানা নেই। কিন্তু যে-করেই হোক, এখন এদের নাগাল থেকে পালাতে হবে। এবার এদের কবলে পড়লে শুধু-যে মৃত্যুই অবধারিত তা নয়-নিশ্চয় তার আগে নৃশংসভাবে তাদের নির্যাতন করবে মাওরিরা। হাতের শিকার এভাবে পালিয়ে গেলে কেউই খুব-একটা খুশি হয় না। পেছনের রে-রে চীৎকার আর হৈ-হৈ হাঁকডাক ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। আরো জোরে না-ছুটলে প্রায় ধরেই ফেলবে তাদের।

চলো, চলো, পেছনে তাকিয়ো না, সোজা ছোটো সামনে। লর্ড গ্লেনারভন কেবল তাতাচ্ছে সহযাত্রীদের। অনবরত কথা বলে তিনি যেন নিজের ভেতরকার সব শঙ্কাকেও দূর করে দিতে চাচ্ছেন।

হাঁফাতে-হাঁফাতে যখন গিরিশিখরে পৌঁছুলেন সকলে, শুধু তখনই মনে হলো পেছন ফিরে তাকিয়ে একঝলক দ্যাখেন, যারা তাদের তাড়া করে আসছে, তারা এখন কতদূরে আছে। মাওরিদের তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে-দু-দলের ব্যবধান তখন পাঁচশো ফিটও হবে কিনা সন্দেহ। আরেকটু পরেই নিশ্চয়ই তারা নাগাল ধরে ফেলবে। এক্ষুনি যদি শিখর থেকে অন্যদিকে নেমে না-আসেন, তাহলে আর রক্ষে নেই। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অন্যদিকে নেমে গেলেও যে নিস্তার আছে তা হয়তো নয়, কিন্তু এই উঁচু থেকে নিচে দেখা যাচ্ছে, রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠেছে তাওপো হ্রদের স্বচ্ছনীল জল। ডানদিকে দূরে টোনগারিরো পাহাড়ের জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কিন্তু পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে আছে

ওয়াইহিতির ছোটো-বড়ো শিখরগুলো-হয়তো ঐ দিকেই কোনো ছোটো গুড়িপথ পাওয়া যাবে কোথাও!

আবার তাড়া লাগালেন লর্ড গ্লেনারভন, চলো! চলো! ছুটে নামো-আর একফোঁটাও সময় নেই!

ক্লান্তিতে তখন সকলের হাঁটুর জোড়া যেন খুলে আসতে চাচ্ছে। এমনভাবে পাহাড় বেয়ে ছুটে ওঠা বা নামার অভ্যাস নেই কারু-শেষটায় এতটা পালিয়ে এসেও ধরা পড়ে যেতে হবে কাই-কুমুর লোকজনদের হাতে!

ছুটে নামতে যাবেন, হঠাৎবাধা দিলেন মেজর ম্যাকন্যাবস, থামো! আর বোধহয় প্রাণ হাতে করে ছুটতে হবে না আমাদের। ঐ দ্যাখো, কী-রকম অদ্ভুতভাবে থমকে পড়েছে মাওরিরা! আশ্চর্য! ওরা আর তাড়া করে আসছে না কেন?

আশ্চর্যই বটে। যেন আচমকা একটা অদৃশ্য দেয়ালে এসে ধাক্কা খেয়েছে কাই-কুমুর দলবল। দূরে দাঁড়িয়েই তারা চাঁচাচ্ছে, নানারকম উৎকট অঙ্গভঙ্গি করছে, কিন্তু একপাও এগুচ্ছেনা কেউ! সে-কার অদেখা হাত তার অঙ্গুলিহেলনে মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছে তাদের? সে-কোন মন্ত্রবলে পায়ে শিকড় গজিয়ে তারা থমকে থেমে পড়েছে। পাঁচশো ফিট দূরে?

হঠাৎ অস্ফুট চোঁচিয়ে উঠেছেন জন ম্যাগস, সামনেই চূড়ার পাশে কী-একটা যেন দেখাচ্ছে তার হাত!

মাত্র কয়েক পা দূরে, সারি-সারি লাল-লাল খুঁটি ঘিরে আছে একটা ছোটো কুঁড়ে।

দেখেই লাফিয়ে উঠলো রবার্ট : কারা-টিটির সমাধিভবন!

তা-ই বুঝি? জানতে চেয়েছে লর্ড গ্লেনারভন।

হ্যাঁ, কারা-টিটিরই সমাধিভবন! দু-দিন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থেকে আমি সব খেয়াল করে দেখেছি। দেখেছি, অন্ত্যোষ্টির সময় ওরা কোনদিকেবয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো মৃতদেহগুলো-

না, কোনোই ভুল হয়নি রবার্টের। তাঁরা যে কখন প্রাণ নিয়ে ছোটবার সময় এই সমাধিভবনের দিকেই হুড়মুড় করে এগিয়ে এসেছেন, সেটা কেউ এতক্ষণ খেয়ালই করেননি।

আর মৃতের এই আবাসই তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এই পাহাড় এখন নিষিদ্ধ অঞ্চল মাওরিদের কাছে-ট্যাবু-অমঙ্গলভূমি। প্রাণ গেলেও তারা আর এদিকে এগুবে না। কারণ এটা এখন প্রেতাশ্রমীর আবাসসদ্য তারা এখানে রেখে গেছে কারা-টিটিকে। তার ক্ষুধিত প্রেতাশ্রমী এখনও শান্ত হয়নি-পুরো অঞ্চলটা এখন তার দখলে। এখানে তার দলের কারুআসারই অধিকার নেই আর। কেউ যদি ভুল করেও এদিকটায় পা দেয়, তবে তার যা পাপ হবে, তাতে সবাই শুদ্ধ মরবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে কারা-টিটির গোষ্ঠীর। হয়তো প্রকৃতি গা ঝাড়া দেবে আচম্বিতে, হয়তো জ্বালমুখ দিয়ে

বেরিয়ে আসবে আগুনের হলকা আর তরল লাভা! কার সাধি, এখন এই অমঙ্গলের গণ্ডি পেরিয়ে আসে!

আর তাদের জন্মজন্মান্তরের বিশ্বাস, তাদের রীতিনীতিসংস্কার, ট্যাবু সম্বন্ধে তাদের আতঙ্ক-সব মিলিয়ে এখন বাঁচিয়ে দিয়েছে পলাতকদের। অন্তত এই জায়গাটায়। আপাতত মাওরিরা কেউ আর আসবে না।

সমাধিভবনের দিকে এগুতে গিয়েও, এবার যেন কোন-এক আতঙ্কের হ্যাঁচকা টানে, থমকে পেছিয়ে এলেন পলাতকেরাই।

ঐ-তো, কে-একজন বসে আছে সমাধিভবনে।

মাওরিরা তবে কি আজকাল আর ট্যাবু মানে না? নিষিদ্ধ ভূমিতেও পা দেয়? না কি কেউ-একজন বেপরোয়া স্পর্ধায় অস্বীকার করে বসেছে তার জাতির বিশ্বাস?

মেজর ম্যাকন্যাসের যেন বাস্তুর্তিহতে চাচ্ছিলো না : প্রেতের বাসায়ও জ্যান্ত মানুষ? অসম্ভব!

অসম্ভব নয়-ঐ দ্যাখো-সত্যি-

ভেতরটা অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু তারই মধ্যে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে কে-একজন মাওরিদের ঐ লাল-কালো ঢোলা জামার গা-মাথা মুড়ে বসে আছে-শুধু-যে বসে আছে

তা-ই নয়-বসে-বসে একমনে কী যেন খাচ্ছে। কোনোদিকেই তার কোনো দৃপাত নেই। আপাতত যেন ক্ষুণ্ণবৃত্তির এই প্রক্রিয়াটা ছাড়া আর-কিছুই সে জানে না।

লর্ড গ্লেনারভন কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখের কথাটা তাকে তক্ষুনি খপ করে গিলে ফেলতে হলো। সেই লাল-কালো জামায় আপাদমস্তক মোড়া লোকটা হাত নেড়ে তাদেরই ডাকছে, উচ্চারণে তার বিদেশীর গলার সুর, কিন্তু ইংরেজিভাষাটা স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রাঞ্জল :

বসে পড়ুন, লর্ড গ্লেনারভন। ছোটোহাজরি তৈরি-চটপট ডান হাতের কাজ শুরু করে দিন।

গলার সুর শুনে চিনতে কারুই ভুল হলো না।

মঁসিয় পাএওয়ল!

আপনি এখানে। কিন্তু মাওরির কোথায়?

মাওরির আবার কোথায় থাকবে-যেখানে ছিলো, সেখানেই আছে! এ-জায়গাটা ওদের কাছে নিষিদ্ধ না? ট্যাবু না? এখানে তো অমঙ্গল ওৎ পেতে আছে!

সত্যি, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখা গেলো, মাওরির সেই অদৃশ্য গণ্ডির কাছে এসে তেমনি থমকে দাঁড়িয়ে আছে-হ্যাঁত-পা নাড়ছে, উৎকট নাচ জুড়ে দিয়েছে, চীৎকারও করছে-কিন্তু একপাও আর এগোয়নি।

কিন্তু নিষিদ্ধ কেন? কালকেই তো এখানে এসেছিলো!

আর তাইতেই তো গোল বাধিয়েছে! কাল এখানে এসে কারা-টিটিকে এখানে সমাহিত করেছে না? তারপর থেকেই এ-জায়গাটা শুধু অপবিত্র হয়ে যায়নি, অমঙ্গলের ডিপো হয়ে গেছে। সোজা কথা নাকি? ভূত-পেত্নি দতিদানার আস্তানা! কার ঘাড়ে ক-টা মাথা আর একপা এগুবে? প্রেতাত্মা তার অশরীরী হাত বাড়িয়ে ঘাড় মটকে দেবে না?

অর্থাৎ?

অর্থাৎ কারা-টিটিকে কাল ওরা এখানে মাটির তলায় শুইয়ে রেখে গেছে বলেই আজ আমরা এখানে নিরাপদ। এটা যে ওদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে গেলো, সেইজন্যেই তো সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি আমি!

কিন্তু ওরা যে এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে! এ তো একটা মানুষের তৈরি পরিখা হয়ে গেলো আর-কি! আমরা কি তাহলে আর এ-জায়গা ছেড়ে একপাও নড়তে পারবো না-এখানেই ঠায় বসে থাকতে হবে আমাদের?

তা কেন? এটুকু ঠিক যে ওরা মাঝখানে ঐ জমিটা পেরিয়ে অ্যদ্র আর আসবে না। কিন্তু এখান থেকে কেটে পড়বার একটা উপায় বার করে নিতে হবে আর কি আমাদের। নিন, হাত লাগান, কিছু খাবার দাঁতে কাটুন।

এই প্রায়-কল্পনাভীত উপায়ে আপাতত রেহাই পেয়ে গিয়ে অভিযাত্রীরা সব উত্তেজনার শেষে এখন যেন গা ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যি-তো, এখানে যখন আচমকা কোনো হামলা

হবে না, তখন উদ্ধারের কথা না-হয় একটু ধীরে-সুস্থে পরেই ভাবা যাবে, সবদিক বিবেচনা করে দেখতে হবে তো!

জায়গাটা অবিশ্যি মৃতের সুখ-সুবিধে-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবেই তৈরি, জ্যান্ত মানুষের কথা আদৌভাবেনি মাওরিরা, সেটা তাদের রীতিও নয়, তবে সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। অন্তত এন্ফুনি তত আর প্রাণ হাতে করে পালাতে হবে না!

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! মঁসিয় পাঞয়লকারু-অনুরোধেই নিজের কাহন নিয়ে একটি কথাও বলতে চাচ্ছেন না। সকলের সব প্রশ্নের উত্তরেই ইলেকট্রিক ঈল মাছের মতো হাত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন যেন। সেদিন তিনি ঐ হৈ-চৈ-এর মধ্যে মাওরিদের হাত এড়িয়ে কীভাবেই যে প্রাণ নিয়ে সটকেছিলেন, সে-সম্বন্ধে যেনটু-শব্দটি করতে তিনি রাজি নন।

ব্যাপার দেখে সবচেয়ে অবাক মানলেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স। এ-কী কাণ্ড! মঁসিয় পাঞয়ল হঠাৎ এমন পালটে গিয়েছেন কী করে? যিনি সবসময় হাজার কথায় নিজের কেরামতি দেখাতে পারলে আর কিছুই চান না, তার স্বভাবের এমন আদ্যোপান্ত বদল সম্ভব হলোকী করে? শেষটায় কারা-টিটির প্রেতাত্মা এসেই তার কাঁধে ভর করেছে নাকি? তার ওপর, এ আবার কী কাণ্ড? তার দিকে তাকালেই কী-রকম যেন কুঁকড়ে গুটিয়ে যাচ্ছেন। গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন ঐ শনের ফেঁসোর তৈরি লাল-কালো আলখাল্লা, পারলে যেন গুটিয়ে কোনো খোলের মধ্যে ঢুকে যাবেন শামুকের মতো।

যাক-গে! মঁসিয় পাঞয়লের মাথায় যে ছিট আছে, সবাই জানে। কোনো নতুন খেয়াল চেপেছে হয়তো মাথায়। খামকা এ নিয়ে আর প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করে লাভ কী?

কারা-টিটির ভূত এসে যতই তার ঘাড়ে চেপে বসুক না কেন, একসময়-না-একসময় তো পেট ফুলে মরেই যাবেন ভূগোল-বিশারদ এই পণ্ডিতমানুষ-পেটের মধ্যে যত কথা গিজগিজ করছে, সে-সব তিনি কতক্ষণ আর চেপে রাখবেন।

তাকে মিথ্যে নানা প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত না-করে, তার পরামর্শমতো কাজ করাই বরং ভালো এখন। পেটে যখন যতরাজ্যের ছুঁচো ডনবৈঠক দিচ্ছে তখন তার সাজিয়ে-রাখা ছোটোহাজারির সদ্যবহার করাই ভালো।

অন্যদের মতো মেজর ম্যাকন্যাও শেষটায় খাবারের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তিন

একদিকে তপ্ত তাওয়া অন্যদিকে জ্বলন্ত আগুন

কথা বলাবার জন্যে শ্রীল-শ্রীযুক্ত জাক-য়েলিয়াস ফ্রাসোয়া মারি পাএয়লকে সাধ্যসাধনা করতে হচ্ছে, এমনটা তো সাধারণত হয় না। তার মানেই হলো বিষম গোলমেলে কিছু-একটা হয়েছে, বিদঘুটে কোনো-এক বিড়ম্বনা, আর তাইতেই রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড ইস্ট-ইন্ডিয়া ইনসটিটিউটের এই মাননীয় সদস্য এতটা বিব্রত বোধ করছেন। অতএব আপাতত তাকে আর ঘাঁটানো খুব-যে সুবিবেচনার কাজ হবে, এমনটা লর্ড গ্লেনারভনের বোধ হলো না।

কিন্তু কথা সম্ভবত হাঁচোড়পাঁচোড় করে পেট থেকে বেরুতে চাচ্ছিলো, ফলে তাঁদের এই পড়ে-পাওয়া ছোটোহাজরি শেষ হবার আগেই অবশ্য পাণ্ডয়লতার কাহন শুনিয়া ফেললেন। তারও মধ্যে তো-তো বিব্রতভাব, কিন্তু শেষ অব্দি তিনি যা বললেন তার সারংসক্ষেপ করলে এইরকম দাঁড়ায় : . রবার্টের মতোই, কারা-টিটির মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়বার সময়, যে-হুঁলুঙ্গুল কাণ্ড শুরু হয়েছিলো, তারই সুযোগ নিয়ে সটকে পড়েছিলেন পাণ্ডয়ল। কিন্তু কপাল মন্দ হলে যা হয়। চম্পট দিতে গিয়ে পড়বি তো পড়, পড়লেন আরেকদল মাওরির খপ্পরে। এদের সর্দারের চেহারাছিরি ভালো, ঘটের মধ্যে বুদ্ধিও ধরে ঢের-সে শুধু নামকাওয়াস্তেই বাপঠাকুরদার দৌলতেই সর্দার হয়ে বসেনি, বেশ জানে-শোনে; তাছাড়াইংরেজমিশনারিদের সঙ্গে এককালে বেশ মাখামাখি হয়েছিলো বলেইংরেজি ভাষা বলতে-কইতেও পারে, শাদাআদমিদের ধরনধারণ ভালোই জানা ছিলো তার। পাণ্ডয়লকে দেখে বেশ করেই জড়িয়ে ধরে নাকে নাক ঘষে যথাবিধি অভ্যর্থনাও জানিয়েছিলো সে। ককখনো এমনভাব করেনি যে পাণ্ডয়ল তাদের বন্দী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিলো যে ঐ সর্দার সঙ্গে না-থাকলে কোথাও এক পাও যাবার অধিকার নেই তার-সারাক্ষণই সে তার পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করছে, ছায়ার মতোই লেপটে থাকছে পাশে।

নাম তার হি-হি, যার মানে রোদ্দুর। মানুষটা দিবি। পাণ্ডয়লের নাকের ডগায় চশমা আর বুকে-ঝোলানো দূরবিন দেখে শ্রদ্ধায় এতটাই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো যে তাকে সে কোথায় রাখবে-পায়ে, না মাথায়-এটাই বোধহয় ঠিক করতে পারেনি-সেইজন্যেই অনেক মাথা খাঁটিয়ে সে একটা উপায় বার করে নিয়েছিলো, দড়ি দিয়ে একেবারে নিজের সঙ্গেই বেঁধে রেখে দিয়েছিলো তাকে। এইভাবেই গেছে তিন-তিনটে দিন। এ যেন তপ্ত তাওয়া থেকে পালাতে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ খাওয়া।

তবে যে বললেন, রীতিমতো আদর করেই রেখেছিলো-কখনও আপনাকে বুঝতেই দেয়নি যে আপনি হি-হি-র বন্দী?মৃদু হেসে জিগেস করেছেন গ্লেনারভন।

পাওয়েল উত্তরে বলেছেন : কথাটা ঠিক। বন্দীও বটে, আবার নয়ও বটে। এমনিতে দারুণ খাতিরদারি করছে, আরামেগরমে রাখছে-অথচ কাছ ছাড়ছে না একমুহূর্তের জন্যেও। একে যদি বন্দিত্ব বলে, তবে তা-ই। মোটমাট এইভাবেই কেটেছে তিনটে দিন-কিন্তু শেষটায় এত আদরযত্ন আমার আর সহ্য হয়নি। শেষটায় একদিন হি-হি যেই একটু চোখ মুদেছে, অমনি দড়ি কেটে ফের চম্পট দিয়েছি।

আর এবার পালিয়ে এসে দেখতে পেলেন, বেশ-জমকালো অনুষ্ঠান করেই কারা-টিটিকে অন্ত্যোষ্টির জন্যে মিছিল করে এই পাহাড়টায় নিয়ে-আসা হচ্ছে। ও-সব ট্যাবু-ফ্যাবুর কথা আমার বেশ জানাই ছিলো। এর আগে পারী থেকে একপাও-বেরুলে কী হয়, পলিনেশিয়ার কোথায়-কোথায় ট্যাবুর চল আছে, সে-সব আমি পুথি পড়ে একেবারে গুলেই খেয়েছিলুম, ফলে এটাও তক্ষুনি ধরতে পেরেছিলুম যে একবার পাহাড়ের এই অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে গেলেই এ-পাহাড়টা এদের কাছে নিষিদ্ধ পাহাড় হয়ে যাবে-আর-কেউ ভুলেও এ-তল্লাট পায়ে মাড়াবে না। তাই মাওরির সবারই চলে যাবার পর লুকিয়ে এই পাহাড়ে এসে সোজা এই সমাধিভবনেই আশ্রয় নিয়েছি আমি। আপনাদের কার কী গতি হলো-সেটা না-জেনে কোথায় যাই, বলুন? সেজন্যেই সেই থেকে এখানেই রয়ে গেছি।

জাক পাণ্ডয়ল এতসব বললেন, বটে, তবু খটকাটা কিন্তু কাটলো না। তিনি যেন সব কথা খুলে বলছেন না, কী যেন এখনও চেপে যাচ্ছেন, কিন্তু সেটা যে কী তা হয়তো তার পেটে বোমা মারলেও এখন আর জানা যাবে না। ফের কখনও শুভলগ্ন এলে তিনি নিজেই হয়তো সব ফাঁস করে দেবেন, এই কথা ভেবে তাকে আর কেউ খোঁচালেন না। বরং এখন তো শিরে-সংক্রান্তি-এখানে মৌরসি পাড়া গেড়ে বসে থেকে তো কোনো লাভ নেই বরং এখন ভাবতে হবে, এখান থেকে কী করে পালানো যায়। পালাবার রাস্তা তো একটাই-এই অন্য ঢালটা দিয়ে নেমে গিয়ে একবার ঐ উলটোদিকের পাহাড়ের মধ্যে ঢুকতে পারলে আপাতত অন্তত কাই-কুমুর রোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। গ্লাসগো থেকে তারা সেই-কবে-যেন বেরিয়েছিলেন ব্রিটানিয়ার খোঁজে, তো সেই ব্রিটানিয়ার কোনো হদিশ তোমিললোই না-বরং এখন তাদের হন্যে হয়ে খুঁজতে হবে তাদের নিজেদের জাহাজ ডানকান কোথায় গেছে। আর ডানকানকে খুঁজে পেতে হলেও তো এইসব পাহাড়পর্বত পেরিয়ে উপকূলের দিকে যেতে হয়, যেখানে সমুদ্র আছে। অন্তত কোনো বন্দরে গিয়ে জাহাজিদের কাছে এই খোঁজটা নেয়া যায়-ডানকান কোথায় গেছে, সে-খবর তারা কেউ জানে কিনা।

আলোচনা করে আপাতত এটাই সাব্যস্ত হলো যে এই পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে দূরের ঐ অন্য পাহাড়গুলোর মধ্যে অন্তত ঢুকে-পড়া যাক। আর সে-চেষ্টা করতে গিয়েই বোঝা গেলো, কাই-কুমু মোটেই অমন হাঁদা নয়। খুব-একটা মাথা না-খাঁটিয়েও সেও এটা ধরতে পেরেছে যে পলাতকেরা এখন এই অন্য ঢালটা দিয়ে নেমেই কেটে পড়বার তালে থাকবে। সেইজন্যে সে তক্ষুনি কড়া পাহারা বসিয়ে দিয়েছে। পাহারা অবশ্যি দূরেই থাকবে, এদিকটার ছায়াও মাড়াবে না কেউ, কিন্তু রাইফেলের গুলি তো আর এখানে

আসতে ভয় পাবে না-দূর থেকে এঁদের তাগ করে গুলি করলেই ছাধনদের আর এখান থেকে বেরুতে হবে না।

নিশ্চয়ই এ-কথাই ভেবেছিলো কাই-কুমু। কেননা একটু নেমে যাবার পরেই তাদের তোপ দেগে সম্বর্ধনা জানাবার মতো করেই ঝাঁকে-ঝাঁকে ছুটে এলো বন্দুকের গুলি। ফের উধ্বশ্বাসে ছুটে এসে পাহাড়ের চূড়োর আশ্রয় নিয়ে তবে স্বস্তি।

কতকগুলো কাগজউড়ে এসেছিলো বন্দুকের গুলির সঙ্গে। পাণ্ডায়লের কৌতূহল উদগ্রতাছাড়া বইয়ের পাতা দেখলে সেটায় কী লেখা আছে না-জানা অঙ্গি তার শাস্তি নেই। একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে দেখলেন পাণ্ডায়ল। আরে! এ-যে দেখছি বাইবেল-এর একটা পাতা। হতচ্ছাড়ারা দেখছি বাইবেলের পাতা ছিঁড়ে বন্দুকে বারুদঠাশে। এই শুনুন, কী লিখেছে-মহাবিপদে পতিত হইয়া আমি কায়মনোবাক্যে সদাপ্রভুকে ডাকিয়াছিলাম, এবং প্রভু তাহা শুনিয়াছিলেন।

ঠিক কথা-প্রভুকে কায়মনোবাক্যে ডাকলে তিনি তা শুনবেন না কেন? এই বিপদের মধ্যে বাইবেল-এর এই বয়ান একটু পরিহাসের মতোই ঠেকেছিলো গ্লেনারভনের, কিন্তু এটাও মনে হলো হঠাৎ বিশেষ করে এই পাতাটুকুড়িয়ে পাবার মধ্যেই হয়তো ঈশ্বরের অপার করুণার কোনো ইঙ্গিত আছে। আমরা তো সেই থেকে তাকেই একমনে ডেকে যাচ্ছি-নিশ্চয়ই এই সংকট থেকে তিনিই আমাদের উদ্ধার করবেন।

আর যেন ঠিক তার কথার উত্তরেই পায়ের তলায় থেকে-থেকে কেঁপে উঠলো পাহাড়। কাকতাল? না অন্যকিছু? আরো-কোনো বিষম সংকটের ইঙ্গিত নাকি এই ভূকম্পন?

মাটির নিচে পাতালে আগুন জ্বলছে-আর তারই ধাক্কায় কি পাহাড় কেঁপে উঠেছে এখন? অসম্ভব নয়। এখানটায় আসবার সময় যখন ওয়াইকাতো পেরিয়ে আসছিলেন, তখনই দেখেছিলেন অগ্নিনিউ উষ্ণ প্রস্রবণ।...মনে পড়ে গেলো ভাপে দম আটকে যেতে চাচ্ছিলো, গন্ধকের গন্ধ ঝিম ধরিয়ে দিয়েছিলো হাওয়ায়।

অর্থাৎ আগুনের পাহাড় আছে এখানে-হয়তো পুরো তল্লাটটা জুড়ে ভূগর্ভে একটাইমস্ত আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, আর তার জ্বালামুখও আছে অজস্র। মাটি এখানে যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে-কোথাও একটু ফাটল থাকলেই তার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে আগুন, তপ্ত খ্যাপাজল, গন্ধকের গন্ধেভরা কুণ্ডলিপাকানো বাষ্প। সেইজন্যেই হাওয়া এখানে কেমন ঝিম-ধরা, যেন থম মেরে গেছে সবকিছু।

কোনটাকে যে বেশি ভয় পাওয়া উচিত-কাই-কুমুর লোকদের গুলিবর্ষণ, না পাহাড়ের এই আচম্বিতকম্পন-সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিলো না। পাণ্ডয়ল বললেন, এই পাহাড়ও একদিন আগুন ওগরাবে। মাটির তলায় যত গ্যাস জমে আছে, তা পাহাড় ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু এখন? হঠাৎ এমনভাবে মাটি কাঁপছে কেন? গ্লেনারভন বুঝি একটু শঙ্কিত বোধ করছেন। ডানকানেরবয়লারও তো জাহাজ যখন জোরে ছোট্টে, কেমন থরথর করে কাঁপে? এও কি সে-রকমই কিছু? না কি একটা-কোনো মারাত্মক

তার মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়েই যেন বলেছেন মেজর ম্যাকন্যাব্স :বয়লারও পুরোনো হলে ফেটে যায়। অথবা তাকে দিয়ে যদি তার সাধের অতিরিক্ত কিছু করাবার চেষ্টা করা হয়—

পাণ্ডায়ল সাই দিয়ে বলেছেন, হ্যাঁ। ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। এখানে বেশিক্ষণ থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। হঠাৎ পাহাড়ের এই জেগে-ওঠাটাকে খুব ভালো লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না। এ যেন হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠবার চেষ্টা করছে!

গত্যন্তর না-দেখে আবার এসেকারা-টিটির সমাধিভবনে ঢুকেছেন পলাতকেরা— আর দূর থেকেই তা দেখে মাওরির যেন আরো চটে গেছে। শুধু গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যেই এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করেছে তারা, যদিও জানে যে এতদূর অন্দি তাদের গুলি পৌঁছুবে না।

শক্ত কাঠের খুঁটি বসিয়ে মজবুত বেড়া বেঁধেছে মাওরির এই সমাধিভবনের চারদিকে। ভেতরে মৃত যোদ্ধার স্মরণে রেখে গিয়েছেবিস্তর গোলাবারুদ আর পান্নার হাতল দেয়া খঞ্জর—যাতে প্রেতাত্মা অস্ত্রের অভাবে শিকার করা থেকে বঞ্চিত না-হয়। তাছাড়া রয়েছে অন্তত ক-দিনের উপযোগী খাবারদাবার অর্থাৎ ফলমূল, আর পানীয় জল। আছে রাঙাআলু, নানারকম কন্দমূল, আলুও—কিন্তু ফলমূল কাঁচা যদি-বা খাওয়া যায়, ঐ আলু ইত্যাদি রান্না না-করে খাওয়া যাবে কী করে? এখানে কতদিন এভাবে আটকে থাকতে হবে কে জানে। রান্না না-করে এ-সবতারা খাবেন কী করে? ভুঁড়ারের হাল দেখে মস্ত-একটা সমস্যাতেই পড়ে গেছেন পলাতকেরা।

কিন্তু পাণ্ডায়লের মগজে কতরকম যে উদ্ভাবনীকৌশল খেলে যায়। ফাটল দিয়ে গ্যাস বেরুচ্ছে দেখে তার মাথায় চমৎকার একটা মৎলব খেলে গিয়েছে। এ-সব আলু রাঙাআলুকে মাটিতে পুঁতে দিলেই তো হয়-দিব্বি গ্যাসের আঁচে ঝলসানো যাবে এদের।

এবং অলবিনেটকে ডেকে তার ব্যবস্থা করতেইবলে দিয়েছেন পাণ্ডায়ল। কোনো তাপমানযন্ত্র থাকলে বোঝা যেতো ঐ-সব ফাটলের কাছে জমি কতটা তেতে আছে-প্রায় দেড়শো ডিগ্রি ফারেনহাইট তো হবেই। তবে আর ভাবনা কী?

তার পরামর্শ শুনে মাটি খুঁড়তে গিয়ে অলবিনেট তো বুঝি নিজেই জ্যাস্ত ঝলসে মরে। একটু গর্ত করা মাত্র সেখান দিয়ে হিসহিস করে বেরিয়ে এলো গরম বাষ্প-আরেকটু হলেই ছোবল মারতো বুঝি অলবিনেটকে। সে যদি আঁৎকে চিৎপটাং হয়ে না-পড়তো, তবে আর-কিছুনা-হোক, তার শ্রীমুখটি যে ঝলসে যেতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবস্থা সঙিন দেখে হুড়মুড় করে ছুটে এলেন মেজর ম্যাকন্যা-আরো দুজন মাল্লাও এলো সঙ্গে। তাড়াহুড়ো করে মাটি আর পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেয়া হলো গর্তের মুখ-কিন্তু পাতালের ঐ গ্যাসের গায়ে যেন হাজারটা দানবের শক্তি (দানবের নয়, অশ্বশক্তি বলুন, তো-তো করে বলতে চেয়েছেন পাণ্ডায়ল)-ঐ পাথর ঠেলেই যেন সে বেরিয়ে আসবে। বোতলের ছিপি খুলে দিতেই যেমন বিপদ হয়েছিলো আরব্যরজনীর জেলেটির-বেরিয়ে এসেছিলো জিন-সে তো এই বাষ্পের মতোই। গর্তের মুখটায় কিছুতেই যেন আর এই মাটিপাথরের ছিপিটা আটকানো যাচ্ছে না।

গোড়ায় পাণ্ডুলের মুখটা একটু বিমর্ষ হয়ে উঠেছিলো। তার পরামর্শই তো নতুন করে একটা ভয়ংকর কেলেক্সারি ঘটতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার মগজে হরদম নতুন-নতুন ভাবনা খেলে যায়-হয়তো মাথার খুলি ফাটিয়েই বেরিয়ে আসতে চায় ঐ বাষ্পের মতো। কেননা পরক্ষণেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন। ইউরেকা! ইউরেকা! নিজেকে বোধহয় ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন-কোনো আর্কিমিডেস বলেই মনে হয়েছে। তার। আবার আমাদের কপাল ভালো। একবার পেলুম কারা-টিটির জন্যে রেখে-যাওয়া খাবার, এখন পাচ্ছি মাটির তলার আগুন! এ-যে দেখছি মেঘ না-চাইতেই জল! এ-পাহাড় তো আমাদের সবকিছু জুগিয়ে দিচ্ছে!

হ্যাঁ, তা জোগাচ্ছে-যতক্ষণ-না বয়লারের মতো ফেটে যায়, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স অন্তত জাহাজের বয়লারের তুলনাটা সহজে তোলবার পাত্র নন।

আরে! এতে এত ভয় পাবার কী আছে! পাণ্ডুল অভয় দেবার ভঙ্গিতে বলেছেন। এত বছর যখন পাহাড়ের খোলটার বাঁধন সয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আরো ক-দিন সহিতে পারবে। আর তার মধ্যেই আমরা পালাবো। কিছু-একটা উপায় তার মধ্যে বার করে নিতে পারবোই।

পাহাড়ের দুলুনি কমে নি বটে, তবে গোড়ায় যেমন খরহরি কাঁপছিলো, এখন আর সে-রকম কাঁপছে না।

ছোটোহাজরি তৈয়ার, গম্ভীরভাবে জানালে অলবিনেট। ভাবখানা এমন, যেন সে ডানকান জাহাজেই তার সূয়ার্ডগিরির কেরামতি দেখাচ্ছে।

ঝাউগাছের শেকড় আর পোড়া রাঙাআলু খিদের মুখে তেমন মন্দ লাগেনি। চটপট ডানহাতের কাজ সেরেই তাজা হয়ে গিয়ে পরামর্শসভা বসাতে হবে।

আর পরামর্শসভায় ঐক্যমত্য হতে একটুও দেরি হলো না। আজরাতের আঁধারেই গা ঢাকা দিয়ে পালাতে হবে। মাওরিদের গুলির আওয়াজ থেমে গিয়েছে এখন-তবে তারা নিশ্চয়ই কাছে-পিঠেই আছে সজাগচক্ষু পাহারায়। ঠিক হলো, গোড়ায় লর্ড গ্লেনারভনই ম্যাঙ্গকে নিয়ে একটা সরেজমিন তদন্ত করে আসবেন মাওরিরা কোথায়-কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। পথ পরিষ্কার কি না দেখে এসে জানালে সবাই মিলে বেরুতে হবে। পথ না-থাকলেও যে-করেই তোক একটা পথ করে নিতে হবে-পথ কেউ অমনি-অমনি দেয় না।

তারা যখন সমাধিভবন থেকে বেরুলেন, তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই-মেঘ বুলে আছে নিচু আর ভারি আর কালো। ঐ দূরে ছোট্ট-একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে নিশ্চয়ই সেখানে কাই-কুমু সদলবলে ওৎ পেতে আছে পাহারায়। সরু যে-আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথটা নিচে নেমেছিলো, সেটা ঐ মাওরিদের, ঘাঁটির পাশ দিয়েই গেছে। সেইজন্যেই রাস্তা আটকে তারা ওখানটাতেই আগুন জ্বালিয়েছে। কিন্তু সেই আগুনের আলো কতদূর অন্ধি পৌঁছবে? যদি কোনোমতে আলোর নাগালের বাইরে আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে ওটুকু পথ পেরুনো যায়, তাহলেই তাদের আর পায় কে? কিন্তু তা বুঝি আর হয় না। গ্লেনারভন আর ম্যাঙ্গল্‌স যেই চুপিসারে একটু এগিয়ে গেছেন আগুনের কুণ্ড লক্ষ্য করে, অমনি আচমকা তাদের সব আশায় বাদ সেধে ডানদিক থেকে পর-পর কতগুলো বন্দুক গর্জে উঠেছে! দুটো গুলি তো গ্লেনারভানের কাধ ঘেঁসেই বেরিয়ে গেছে! অমনি ছুটে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাদের।

অসম্ভব! এরা বন্দুক চালাতে জানে, মোটেই আনাড়ি নয়; তাছাড়া অন্ধকারে বনে-জঙ্গলে থেকে-থেকে এদের চোখ যেন বেড়ালের মতোই অন্ধকারেও দেখতে পায়। এদের নজর এড়িয়ে পালানো যাবে না।

তাহলে উপায়?

আধোগুম আর আধোজাগরণের মধ্যেই কারা-টিটির সমাধিভনের মধ্যে রাত কাটিয়ে দিলেন সবাই। তারপর যখন দিনের আলো ফুটলো, বাইরে এসে দাঁড়ালেন সবাই। দিনের অনোয় দূরের ঐ আগুনের কুণ্ডের আলো এখন মিইয়ে এসেছে-কিন্তু কাই-কুমুর সান্ধোপান্ধরা যে ওখানেই আছে এবং সজাগই আছে, তার প্রমাণ হলো, তাদের বাইরে বেরুতে দেখেই তারা সমস্বরে বিকট আওয়াজ করে উঠেছে।

একটু ঘাবড়ে গেলেও এটা তারা জানেন যে ঐ দূর থেকেই তারা খ্যাপার মতো চাঁচাবে, এই ট্যাবু ভেঙে যে ওপরে উঠবে সেই দুঃসাহস তাদের আর হবে না।

চারদিক থেকে কুয়াশা তখনও মেলায়নি। কিন্তু ঝিরঝিরে একটা হাওয়া দিয়েছে। হাওয়ার জোর অবশ্য এমন নয় যে সে এক্ষুনি এক ঝটকায় এই কুয়াশাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

হঠাৎ ফের পাণ্ডায়লের মাথায় যেন কারা-টিটির ভূত এসে চেপেছে। তিনি ফের চোঁচিয়ে উঠেছেন : ইউরেকা! ইউরেকা!

তাঁর মাথায় কোনো ফন্দি এলেই তিনি যে কেন থিক বলেন, সেটা বোঝা দায়।

আমরা এদের বিশ্বাস আর সংস্কারকেই কাজে লাগাবো।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স বুঝি অনবরত তার এই ইউরেকা! ইউরেকা! হুংকার শুনে একটু বিরক্তই হচ্ছিলেন। মনের ভাবটা না-চেপেই তিনি বলে উঠেছেন, কিন্তু সেটা কীভাবে কাজে লাগাবেন তা এই অধমদের একটু খুলে বললেই পারেন।

এদের তো বিশ্বাস এটাই যে ট্যাবু ভেঙে যে-ই এই পাহাড়ের ওপরে ওঠবে, দেবতাদের রোষ তাকে প্রাণে মারবে। বেশ-তো, কাই-কুমু তাহলে ভেবে নিক যে আমরা ট্যাবুনা-মানার জন্যে জ্যান্ত ঝলসে মরেছি-দেবতাদের অগ্নিচক্ষু আমাদের ভস্ম করে ফেলেছে! একবার যদি তাদের মনে হয় যে আগুনের দেবতা আমাদের কাউকেই রেহাই দেয়নি, তাহলে তারা তাদের পাহারা তুলে নিয়ে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তখন ফাঁকা রাস্তা পেয়ে আমরাও এখান থেকে কেটে পড়বো।

সেটা আপনি ওদের বিশ্বাস করাবেন কী করে? একটা ফ্যাকড়া তুলেছেন লর্ড গ্লেনারভন। বিশ্বাস করাতে পারলে হয়তো মুশকিল আসান হতো। কিন্তু ওরা তো দেখেছে-দিব্বি চব্বিশ ঘন্টার ওপর হলো আমরা বহাল তবিয়ে এখানে কাটিয়ে দিয়েছি-ওদের দেবতা আমাদের গায়ে আঁচড়টিও কাটেননি।

কাটবেন, কাটবেন, আশ্বাস দিয়েই বলেছেন পাণ্ডয়ল। দেবতার রোষ তো দাউদাউ জ্বলছেই মাটির তলায়-এখন ছিপি খুলে তাকে বের করে আনলেই হয়!

সর্বনাশ! ম্যাঙ্গস যেন চোখের সামনে বিভীষিকা দেখেছেন। আপনি কি আগ্নেয়গিরির কঁচাঘুমটা ভাঙিয়ে দিতে চাইছেন নাকি? মুখ খুলে দিতে চাচ্ছেন জ্বালামুখের? জানেন তো, বোতলের ছিপি খুলে দেবার পর জিন এসে প্রথমে যাকে পায় তারই ঘাড় মটকে দেয়।

আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে দেবার কথা কে বলছে? পাণ্ডয়ল যেন বোকা ছাত্রদের মাথায় গজাল মেরে কথাটা ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে। আমরা একটা নকল অগ্ন্যুৎপাত বানাবো-যেটা আমরা নিজেদের বশে রাখতে পারবো, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো। যে-সব ফাঁকফোকরফাটল দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, আমরা তাকে আর বাধা দেবোনা-বরংসহজে যাতে বেরিয়ে আসতে পারে, তারই ব্যবস্থা করে দেবো। নকল একটা লাভার স্রোত বইয়ে দেবো, যাতে তারা ভয় পেয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, সেটা স্রেফ ওদের ধাপ্পা দেবার জন্যেই করতে হবে-আমরা আস্ত আগ্নেয়গিরিটাকে জাগিয়ে দিতে চাচ্ছি না।

যদি অগ্নিদগারটাকে নিজের বশে রাখতে পারেন, মেজর ম্যাকন্যাবসের কথায় তারিফ আর অবিশ্বাসের একটা বিচ্ছিরি মিশেল ছিলো, তবে পাগলা ঘোড়াকে বশে আনার চাইতেও সেটা অনেক কঠিন। যদি ভাবনারা হতো পক্ষিরাজ ঘোড়া- আউড়েছেন তিনি পুরোনো প্রবচন।

আমরা শুধু এমন-একটা ধারণার সৃষ্টি করবো, যাতে ওরা ভেবে নেয় যে ওদের দেশের অগ্নিদেবতা আমাদের তার লেলিহান লোলশিখায় ঝলসে খেয়েছেন। আসলে যখন এখান দিয়ে আগুন বেরুবে, আমরা সবাই কারা-টিটির সমাধিঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবো!

কিন্তু কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবো? গ্লেনারভনের সংশয় যেন কিছুতেই যাবে না। একবার আগুনের লকলক শিখা যদি পাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ চাটতে শুরু করে দেয়, তবে আগুন কি আমাদের দেখে শুনে ছেড়ে দিয়ে শুধু বেছে-বেছে অন্যকিছু ভস্ম করে দেবে?

তাছাড়া সত্যি আমরা পুড়ে মরেছি কি না দেখবার জন্যে ওরা যদি পাহাড় বেয়ে উঠে আসে? ম্যাঙ্গসের সংশয়ও মোটেই কাটেনি।

আসবে না, আহাম্মক কতগুলো ছাত্র জুটেছে যেন পাণ্ডুলের, সহজ কথাটা পর্যন্ত বুঝতে চায় না। নিষিদ্ধ পাহাড়ে এসে আস্তানা গেড়েছি বলেই তো আগুন আমাদের খেলো। তারপরও তারা ট্যাবু ভেঙে পাহাড়ে উঠতে সাহস করবে নাকি? তারা তো নিজের চোখেই জুলজুল করে দেখবে-ট্যাবুভাঙলে কী মারাত্মক সাজা পেতে হয়।

আমাদের যখন এমনিতে এখান থেকে পালাবার কোনো রাস্তাই খোলা নেই, সম্ভবত মেজর ম্যাকন্যাসের এখন এই ফন্দিটা আর তেমন আজগুবি ঠেকছে না, তখন একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না। এমনিতেও তো এখানে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে আমাদের তিলেতিলে মরতে হবে-তার চেয়ে বরং আগুন-লাভাকে বশে না-রাখতে পারলে একঝাঁপটাতেই মরে যাবো। তপ্ত তাওয়া থেকে যখন জ্বলন্ত উনুনে পড়ে মাছ-তখন তার দশা খুব-একটা পালটায় কি? অবস্থার কি খুব-একটা হেরফের হয় তার?

ঠিকহলল, দিনের বেলায় কিছু করা হবে না, রাতের আঁধার নামলে পরই উসকে দিতে হবে আগুন, খুঁচিয়ে তুলতে হবে পাতালের ঐ অগ্নিকুণ্ড-কিন্তু এদিকটাতেও নজর রাখতে

হবে যাতে অগ্নদগারটা এমন প্রচণ্ড না-হয় যে তাদের পালাবার পথই আটকে গেলো। মাওরিদের যেটা এতকালের সংস্কার, এতকালের বিশ্বাস, শুধু সেটাকে আরো, চাগিয়ে তোলবার জন্যে যতটুকু আগুন আর লাভা চাই, শুধু ততটুকুরই ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু এ কী আর ইয়র্কশায়ার পুডিং নাকি-নিজের মনোমতো হুকুমমারফিক একটা অগ্ন্যুৎপাত তৈরি করা যাবে? একটু এদিক-ওদিক হলেই সাড়ে-সর্বনাশ : নকল অগ্ন্যুৎপাত হলেও উৎপাতটা তৈরি করবে তো আসল আগ্নেয়গিরিই। আর সে কি কারু হুকুমের চাকর যে যা বলা হবে তা-ই জো হুজুর বলে তামিল করতে লেগে যাবে? একটা বদ্ধ জায়গা থেকে বাষ্প, লাভা আর গ্যাসকে টেনে বার করবার পর তাকে কি আর পোষমানানো যাবে? একটু আগেই তো অলবিনেট বেচারির চিৎপটাং দশা থেকে একটু শিক্ষা নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু কিছু না-করে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেও তো রেহাই নেই। একবার যদি মাওরিদের মনে বিশ্বাসটা উসকে দেয়া যায় যে দেবতার অভিশাপ লেগেছে, ট্যাবু ভাঙবার জন্যে অগ্নিদেবতা খেপে উঠেছেন, জুড়ে দিয়েছেন তার তাণ্ডবনাচ-তাহলে তারা প্রাণের ভয়ে শুধু যে এখান থেকে ভেঁ-দৌড় দেবে তা-ই নয়, পালাতে-পালাতে ভাববে, উচিত শিক্ষাই পেয়েছে শাদারা, যেমন নিষেধ মানেনি তেমনি উপযুক্ত সাজাই পেয়েছে।

পরিকল্পনাটা উলটেপালটে, চিৎ করে, উপুড় করে, নানাদিক থেকে দেখা হলো-কিন্তু তাতেও যেন সময় আর কাটতেই চায় না। একেকটা ছোট মুহূর্তকেই কে যেন টেনে বিষম লম্বা করে দিয়েছে। তবে শুধু আলোচনাই করেননি সারাক্ষণ, পালতকেরা পালাবার সমস্ত আয়োজনও সাজ করেছেন, ছোটো-ছোটো পুঁটলি করে বেঁধে নিয়েছেন খাবার,

কারা-টিটির সমাধির পাশে যত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ছিলো, তাও নিজেদের সঙ্গে নিয়েছেন। অলবিনেট সন্ধে ছটা নাগাদ খাবার পরিবেশন করলে-এটাই তাদের লাস্ট সাপার বা শেষ ভোজ কি না কে জানে। আর খেতে-খেতেই দেখা গেলো মেঘ জমছে দিগন্তে, দু-একবার বিদ্যুৎও চমকালো। আর তাই দেখে পাণ্ডয়ল বেশ খুশিই হয়ে উঠলেন। একবার তারা নিজেরাই একসঙ্গে জল আর আগুনের লীলাখেলা দেখেছেন সেদিন-অভিজ্ঞতাটা তাজ্জবহলেও তেমন মুখোরোচক হয়নি। এবার মাওরিরাও দেখবে-ওপরে ঝড় গর্জাবে, নিচে পাহাড় ফেটে আগুন ছড়াবে। আর তাতে হয়তো তারা ভাববে যে ট্যাবুভাণ্ডায় আদিম দেবতারা সব্বাই এতটাই রেগে গিয়েছেন যে আজ বুঝি আর-কারু রক্ষে নেই।

আটটা বাজতে না-বাজতেই অন্ধকার যেন নিচ্ছিদ্র হয়ে নেমে এলো। এমনিতে হয়তো আকাশে চাঁদ আর তারা থাকতো-কিন্তু মেঘের দাপটে আজ রাতে তারাও কোথায় মুখ লুকিয়েছে। আর এটাই সুবর্ণসুযোগ। মাওরিরা জঙ্গলে অন্ধকারে থেকে অভ্যস্ত হলেও আজকের মতো নিরেট-নিচ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে এতদূরে কিছুই দেখতে পাবে না-দেখতেই পাবে না এই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা উটকো শ্বেতাঙ্গরা কী করছে।

কারা-টিটিকে যেখানে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে, তা থেকে প্রায় তিরিশ হাত দূরে মস্ত একটা ভারি পাথর ছিল-দেখে মনে হতে পারতো এই মস্ত পাথরটা দিয়ে কেউ যেন কোনো খুদে জ্বালামুখের মুখে ছিপির মতো আটকে দিয়েছে। কেননা পাথরটার চারপাশ দিয়ে সামান্য যা ফাটল আছে-পুরো মুখটা বোধহয় খাপে-খাপে বোজেনি-তা দিয়ে এতক্ষণ হিস-হিস করে গ্যাস বেরুচ্ছিলো। এখন পাথরটাকেই ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে-তাহলেই, মুখটা খুলে যেতেই বেরিয়ে আসবে জ্বলন্ত বাষ্প, আগুনের শিখা, তপ্ততরল

লাভা-আর বিজ্ঞান তো বলে তরল পদার্থ গড়িয়ে নিচে নেমে যায়, ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠে না-অতএব সে-সব নেমে যাবে নিচের দিকে, কারা-টিটির সমাধিভবনের দিকে বেয়ে-বেয়ে উঠে আসবে না।

কিন্তু তার আগে মাটি কেটে একটা খাত তৈরি করে দিতে হবে, যাতে সেই খাতটা দিয়েই নিচে গড়িয়ে নামে লাভা। পাথরটাকেও ঠেলে সরাতে গেলে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যাতে এলোপাথারি নিচে নেমে না-যায়-ঐ খাত ধরেই সে যেন গড়গড় করে নেমে যায়। সমাধিভবনের একটা কাঠের খুঁটি উপড়ে এনে সেটা খাঁজের মধ্যে পাথরের তলায় আড়কাঠের মতো চালান করে দিয়ে সবাই মিলে হেইয়ো-জোয়ান বলে একটা বিষম হ্যাঁচকা চাড় দিলেন। আর আচমকা ঠেলা লেগে পাথরটা যে শুধু কাই হলো, তা নয়-ঐ খাঁজকাটা খাত দিয়ে গড়িয়ে পড়লো।

আর অমনি যেন শুরু হলো প্রলয়। দুম করে ফেটে গেলো মাটির পালা আস্তর-গর্ত ফেটে বেরিয়ে এলো জ্বলন্ত গ্যাস, আর তারপর একটার পর একটা বিস্ফোরণ, মাটি কেঁপে উঠলো, যেন অ্যাটলাসের কাঁধের ওপর আস্ত পৃথিবীটাই বিষম নড়ে উঠেছে, আর তরল আগুনের স্রোত নামতে শুরু করলো ঢাল বেয়ে।

নিশ্চয়ই কুণ্ডলী পাকিয়ে নিচে থেকে এতক্ষণ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্ছিলো গ্যাস, একটু ফাঁক পেয়ে এখন এমন তোড়ে বেরুতে শুরু করেছে যে চারপাশের মাটির চাঙাড ভেঙে নিচে পড়ে গেলো, আর জ্বালামুখের বেড়টা আচমকা অনেকটাই বড়ো হয়ে গেলো, গলগল করে বেরুতে লাগলো লাভা।

আর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বার সময় সেই লাভা সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নুড়িপাথর কাঠকুটো যা সামনে পাচ্ছে তা-ই। আঁৎকে, সবাই হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকলেন কারা-টিটির সমাধিঘরেই। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! সেদিন গ্লেনারভনের হাতেই মরেছে কারা-টিটি, কিন্তু বারেবারে তাকে আর তার সঙ্গীদের ফিরে আসতে হচ্ছে। যেখানে সে তার শেষনিদ্রায় শুয়ে আছে-কিছুতেই সে যেন এঁদের কাউকেই তার কাছ ছেড়ে যেতে দেবে না-কোন্-এক তাজ্জব আর অদৃশ্য বাঁধন দিয়ে সে যেন আটকে রেখে দিতে চাচ্ছে সবাইকে।

সারাটা আকাশ ততক্ষণে লালে-লাল! এ কোনো যেমন-তেমন লাল নয়, রাগি লাল, খ্যাপা লাল! আর নিচে মাওরিদের মধ্যে হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ পাহাড়ে পা দিয়েছে বলে খেপে গিয়েছেন পাতালের আগুনদেবতা, আগুন ওগরাতে শুরু করেছে নিষিদ্ধ পাহাড়, পালাও, পালাও, প্রাণ হাতে করে পালাও, এক্ষুনি! অমঙ্গল! অমঙ্গল! সম্মিলিত চীৎকার :ট্যাবু! ট্যাবু! আর সেই আতঙ্কের চীৎকারও এখন মিশে যাচ্ছে অগ্নদগারের নির্ঘোষের সঙ্গে।

পাণ্ডায়লের বুদ্ধিটা বোধহয় সর্বনাশই নিয়ে এসেছে ডেকে! এতদিন যা ছিলো পাথরচাপা, এখন তা খোলামুখ পেয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে। এতকাল এখানকার বাষ্পের চাপ টোনগারিরোর জাগ্রত জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো, কিন্তু এখন সব গ্যাস, সব লাভা বেরিয়ে আসছে এই নতুন মুখটা দিয়ে। আর বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে সমস্ত পাহাড়। অ্যাটলাস বুঝি আর তার কাঁধের ওপর বইতে পারছে না পৃথিবীকে-তার বুঝি পা টলছে। আর এই ভূকম্পন, বিস্ফোরণ আর অগ্নিবমনের সঙ্গে তাল রেখেই খেপে

উঠেছে আকাশ, বিদ্যুৎফালাফালা করে চিরছে অন্ধকারকে, বজ্র হংকার দিয়ে উঠেছে ঘন-ঘন ।

অবরুদ্ধ ছিলো বাষ্প, বিস্ফোরণ দীর্ঘ করে ঢাকা-
উদ্দাম বেরিয়ে আসে পাতালের চাপা-পড়া রোষ-
তরল আগুনে নাচে ক্ষিপ্তলাল মৃত্যুরই পতাকা-
সমস্ত না-ধ্বংস হলে শান্ত বুঝি হবে না আক্রোশ!

হঠাৎ কার যেন একটা কবিতার টুকরো মনে পড়ে গেলো পাণ্ডুলের ।

সারারাত আগ্নেয়গিরির আক্রোশ ঢেলে দিলে লাভার আকারে । ভোরবেলাতেও তার রোষ
আদৌ প্রশমিত হয়নি । ঝড়ও সমানতালে বাজ ফাটাচ্ছে-যেন হাততালি দিচ্ছে দৃশ্যটাকে ।
আর, নিচে, মাওরিদের মধ্যে আতঙ্ক যেন ক্রমশই সব সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছে ।

তারইমধ্যেকাই-কুমু এসে নতুন করে ট্যাবুজারি করে গেলো, শুধু-যে আগুনের পাহাড়টাই
পুরোপুরি নিষিদ্ধ হলো, তা নয়-নিষিদ্ধ হলো পাহাড়তলিও । আর তারপর এই রান্সুসে-
অমঙ্গলের জায়গা ছেড়ে চলে গেলো মাওরিরা-আজ থেকে এই তল্লাটই তারা আর
মাড়াবে না ।

সেই অর্থে পাণ্ডুলের ফন্দিটা কাজে খেটে গেছে । এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে কখন
থামে আগুনের এই সংহারলীলা ।

আর অপেক্ষাতেই কাটলো সারাটা দিন। বিকেলের দিক থেকে অগ্নদগারের প্রথম চোটটা একটু কমলো। রাত নটা নাগাদ শান্ত হয়ে এলো পাহাড়, জ্বালামুখ দিয়ে শুধু ধোঁয়া উঠছে এখন-বাপ্পের সেই তেজ আর নেই, আর বেরুচ্ছে না তরল আগুন। কিন্তু এটা যে একটা অগ্নদগার থেকে আরেকটা অগ্নদগারের মধ্যকার সাময়িক বিরতি নয়, তা কে জানে? আর একমুহূর্তও দেরি নয়। পলাতকেরা ঠিক করেছেন, এম্মুনি এখান থেকে নেমে যাবেন, সোজা ছুটবেন উপসাগরের দিকে। পাএওয়ল সমস্ত বিপদ আপদের মধ্যে একবারের জন্যেও নিউজিল্যান্ডের মানচিত্র কাছছাড়া করেননি। তিনি মোটামুটি ছক কষে নিয়েছেন-কোনদিকে গেলে উপসাগর পড়বে। এখন শুধু সেদিক দিয়েই তাদের চলতে হবে, যতক্ষণ-না তারা গিয়ে উপসাগরের তীরে পৌঁছোন।

সেই-যে তাঁরা চলতে শুরু করেছেন, তারপর যে কতক্ষণ কেটেছে, কারু খেয়াল ছিলোনা। সকালনটায় ক্লান্ত দেহগুলিকে প্রায় টেনেহিঁচড়েই যেন নিয়ে যেতে হচ্ছিলো তাঁদের। শুধু স্নায়ুর জোর আর অপ্রশম্য উত্তেজনাই একনাগাড়ে প্রায় বারো ঘন্টা হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে তাদের। সামান্য বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো তাদের পথচলা। এখন তারা যে-জায়গাটার মধ্যে দিয়ে চলেছেন, সেটাকে প্রায় আগুনের দেশই বলা যায়-এখনও তারা আগ্নেয়গিরির পাল্লা থেকে বেরুতে পারেননি। মাইলের পর মাইল জুড়ে পর-পর এসেছে ছোটোবড়ো আগুনজ্বালা হ্রদ, ফোয়ারার মতো গরম বাষ্পে ভরা জল আকাশ লক্ষ্য করে উগরেছে উষ্ণ প্রস্রবণ, গন্ধকের ঝর্ণা থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝঝালো দম আটকানো গন্ধ।

পাএওয়ল মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছেন কোনদিক দিয়ে যেতে হবে-কিন্তু দু-একটা ছোটোখাটো-হাঁছাড়া তার মুখে আর-কোনো বুলি নেই, যে-মুখে সারাক্ষণ খই ফুটতো সে-

মুখ এখন চুপ, কেমন যেন গম্ভীরও, কী-একটা অদ্ভুত বদল এসেছে তার মধ্যে, সেই লাল-কালো আলখাল্লাটা মুড়ি দিয়ে সারাক্ষণ কী যেন ভাবতে-ভাবতে কলের মতো পথ চলেছেন তিনি।

আর এইভাবেই দিনের পর দিন। কখন ছাড়িয়ে এসেছেন আগ্নেয়গিরির অঞ্চল, কবে ঢুকেছেন গভীর জঙ্গলে, কবে যে পেরিয়ে এসেছেন সেই জঙ্গলও, সেটাই যেন কারু খেয়াল নেই। শুধু হুঁশিয়ার থাকতে হয়, যখন মনে হয় কাছেই আছে মাওরিদের বসতি, না-হলে শুধু ধুকতে-ধুকতে একটানা চলো, যতক্ষণ-না চোখের সামনে দেখতে পাও বিশাল-নীল জলের বিস্তার। যেন একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছেন সবাই, কি-রকম একটা আচ্ছন্নভাব, তার মধ্যে আশাও নেই-হতাশাও নেই, শুধু মোহমান বিধুর দশা-যেন পাণ্ডায়লেরই ছোঁয়াচে রোগটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, সকলের মুখ থেকেই সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে, কেউ যেন আর-কিছু ভাবতেও চাইছে না, কে যেন অদৃশ্য থেকে সমানে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের।

আর এইভাবে যখন শেষটায় প্রশান্ত মহাসাগরের কাছে বসতির মধ্যে এসে পৌঁছুলেন সবাই, তখন আবার নতুন-একটা বিভীষিকারই যেন মুখোমুখি হতে হলো। একটা বিধ্বস্ত গ্রাম। শূন্য-সব কুঁড়েবাড়ি। ছারখার সব খেতখামার। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাওরিদের মৃতদেহ-সেগুলো পচেও যায়নি। যার মানে হলো সদ্য সেখানে শাদাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিলো মাওরিদের, আর ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত-যে যedিকে পারে পালিয়েছে, যারা পালাতে পারেনি-শিশুনারীবৃদ্ধ-তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে শেয়াল ও শকুনের খাদ্য হবে বলে।

আর একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে, ডাঙাটা অন্তরীপের মতো সরু ফালি হয়ে ঢুকে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। মৃতের এলাকায় এসে যতটা মনখারাপ হয়েছিলো, এই দূর নীল জলের ঢেউ ঠিক ততটাই নূতন উদ্যম এনে দিলে সকলের মাঝে। আর তারপরেই একটা হৈ-হৈ রৈ রৈ চীৎকারে যেন চটকাটাই ভেঙে গেলো আচমকা। পেছনে রে-রে করে তেড়ে আসছে একদল মাওরি। হয়তো তারা তাকে-তাকে ছিলো, কীভাবে বদলা নেবে, কীভাবে শাদাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে তাদের প্রতিহিংসা, আর এই বিধ্বস্ত ছোট দলটাকে দেখেই আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তাড়া করে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চাঁচিয়ে উঠেছেন কাণ্ডন ম্যাঙ্গল্‌স : নৌকো! নৌকো!

কাছেই, সমুদ্রের ধারেই বালিয়াড়ির মধ্যে পড়ে আছে ছয়-দাঁড়ের একটা ছিপছিপে ক্যানু। ভাবার কোনো সময় নেই। তক্ষুনি ক্যানুতে চেপে সেটা তারা ভাসিয়ে দিলেন সাগরজলে, দেখতে পেলেন মাওরিরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নেড়ে উৎকট আশ্ফালন করছে। কিন্তু এদের হাত এড়িয়ে তো জলে ভেসে-পড়া গেছে। আর ভয় কী? ম্যাঙ্গল্‌স তীর থেকে বেশি-দূরে নিয়ে যেতে দেননি ক্যানুটা, তীরের সমান্তরাল প্রায় মাইলখানেক দূর দিয়ে যাবেন বলেই হালে বসে দিক ঠিক করেছেন, আর অন্যরা সবেগে দাঁড়া বাইছে।

কিন্তু কাণ্ডন ম্যাঙ্গলসের পরিল্লনায় জলাঞ্জলি দিতে হলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অন্তরীপের মুখ থেকে তাদের ক্যানুকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে মাওরিদের তিনটে ক্যানু-সেগুলো আরো-লম্বা, আরো-বেশি দাঁড়ের, আরো-দ্রুতগামী নাগাল প্রায় ধরেই ফ্যালে

দেখে প্রমাদ গুনলেন কাণ্ডেন ম্যাঙ্গ। কিছু না-ভেবেই ক্যানুটার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন বারদরিয়ার দিকে।

আর শুরু হলো নৌকোর বাইচ। অসমান এক প্রতিযোগিতা। এঁরা সবাই পথের ধকলে ধুকছেন, মাওরিরা যুদ্ধে বিপর্যস্ত হলেও এঁদের মতো এখন নেতিয়ে পড়েনি, বরং প্রচণ্ড তেজেই এগুচ্ছে। আর তারপর যেই পাল্লার মধ্যে এসেছে তাদের ক্যানু, মাওরিদের কাছ থেকে সম্ভাষণ এসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে বন্দুকের গুলিতে।

সামনে অথৈ দরিয়া, পেছনে বন্দুকের গুলি! কিন্তু বন্দুকের গুলি তো সাক্ষাৎমৃত্যু! তার চেয়ে বরং সমুদ্র লক্ষ্য করে চলাই ভালো। মরণ যদি আসে, তবে সে আসুক সিন্ধুজলেই। তারা তো ডানকাননিয় জলেই ভেসেছিলেন একদিন-কবে, সে এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়, কিন্তু দূরের সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই গ্লেনারভন চিৎকার করে উঠলেন খ্যাপার মতো : জাহাজ! জাহাজ!

অমনি পাণ্ডয়ল তার চোখ রাখলেন তার টেলিস্কোপে, যে-টেলিস্কোপতার বুকেই ঝোলে সারাক্ষণ, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

সত্যি-তো, একটা স্টীমশিপ ছুটে আসছে এদিকটায়, আর ছুটে আসছে পুরোদমে, ভলকে-ভলকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার চোঙ দিয়ে, পেছনে শুধু ঢেউয়ের রেখা এঁকেই এগুচ্ছে না, আকাশেও যেন এঁকে দিচ্ছে ধোঁয়ার পুচ্ছ।

আর এটাই যেন নতুন উৎসাহ এনে দিয়েছে সকলের মধ্যে। চৌদুনে সবাই দাঁড় চালাচ্ছে এখন। বাষ্পচলা জাহাজটা অনেকটাই কাছে এসে পড়েছে এখন। দুটো মাস্তুল দেখা

যাচ্ছে। পেছনে কিন্তু মাওরিদের ক্যানুগুলো থেকে বিরামহীন গুলি আসছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। তবে যদি জাহাজটাকে ধরে ফেলা যায় এম্ফুনি-

পরক্ষণেই দূরবিনে চোখ লাগিয়ে গ্লেনারভনের মুখ পাংশু হয়ে গেলো-এক-নিমেষে কেউ যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে তার মুখ থেকে। ডানকান! বোম্বটেজাহাজ ডানকান!

কেউ কি কখনও ভেবেছিলো, একদিন লর্ড গ্লেনারভন নিজের এত সাধের জাহাজটাকে দেখে আতঙ্কে নীল হয়ে যাবেন? এটা যদি নিয়তির নির্মম পরিহাস না হয়, তবে পরিহাস আর কাকে বলে?

ডানকান! সঙ্গে-সঙ্গে হাল থেকে লাফিয়ে উঠেছেন জন ম্যাঙ্গলস। ডানকান শুধু লর্ড গ্লেনারভনেরই জাহাজ নয়-তারও জাহাজ! তিনিই ঐ জাহাজের কাপ্তেন।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ডানকান! গ্লেনারভন বোধহয় এবার পাগলই হয়ে গেছেন বুঝি। সামনে মৃত্যু-ডানকান! পেছনেও মৃত্যু-মাওরিদের ক্যানু!

আর যেন তার খ্যাপা হাহাকারের উত্তরেই ডানকানের ডেক থেকে গর্জে উঠলো কামান-তুলকালাম আওয়াজ করে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেলো কামানের গোলা। আর পেছন থেকে, সমানে তখনও বন্দুকের গুলি ছুটে আসছে তাদের ক্যানু লক্ষ্য করে।

সামনে কামান, পেছনে বন্দুক! দুইই আগুন ওগরাচ্ছে! সামনে বোম্বটেরা-পেছনে মাওরিরা! দু-দলই মায়াদয়ার ধার ধারে না!

কিন্তু ততক্ষণে জন ম্যাঙ্গসকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছে রবার্ট : টম অস্টিন! টম অস্টিন!
ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপর! হা-হা, টম অস্টিনই! আমাদের চিনতে পেরেছে-ঐ
যে মাথার টুপি খুলে নাড়ছে-সে-তো আমাদের দেখেই-

জন ম্যাঙ্গল্‌স ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ডানকানেরদিকে! এও কি সম্ভব? কিন্তু
পরক্ষণেই ডানকানের ডেক থেকে আবার গর্জে উঠলো কামান। আর গোলাটা এবার
চাঁদমারি খুঁজে পেয়েছে। মথার ওপর দিয়ে তীব্র ও ধারালো শিস তুলে ছুটে গিয়েছে
মাওরিদের একটা ক্যানুর দিকে-আর সেটা গোলায় ঘায়ে দু-টুকরো হয়ে যেতে-যেতে
যেন জল থেকে একটা বিষম লাফ দিয়েছে শূন্যে!

আর মাঝখানের ক্যানুটা গোলায় উড়ে যেতেই থমকে পড়েছে অন্য ক্যানু দুটো।

জাম্বিতারপর আবারও একটা কামানের গর্জন!

আর এই তৃতীয় গোলাটা উড়ে গিয়ে মাওরিদের কোনো ক্যানুতে পড়বার আগেই
মাওরিরা বেগতিক দেখে, প্রায় যেন হতভম্বভাবেই, উলটোদিকে-তীরের দিকে-তাদের
ক্যানুর মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে!

কখন যে তারপরে লর্ড গ্লেনারভনেরা নিজেদের জাহাজের ডেকে পা রেখেছেন, তাতারা
নিজেরাই জানেন না। পুরো ব্যাপারটাই কোনো অতিকায় স্বপ্ন নয়তো? স্বপ্নে যেমন সব
থাকে ছেঁড়া-ঘেঁড়া, কার্যকারণসম্পর্কবিহীন, কাকতালের উল্লাসে ভরা এলোমেলো সংলগ্ন-
অসংলগ্ন সব দৃশ্য-এও তার মতো কিছু নয়তো?

তারা কি তবে সত্যি এসে উঠেছেন ডানকানে? সে কি তবে বোস্বেটের জাহাজ নয় এখনও?

চার
কৌতুকের ঘূর্ণিপাকে

মাত্র তিনমাস আগে যাঁরা, আশায় ভরপুর, ডানকান থেকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও উৎফুল্ল আননে নেমে গিয়েছিলেন, আজ তারাই-না, পরিকল্পনামাফিক নয়, বরং মানুষের কষা সমস্ত গণিতকেই বানচাল করে দিয়ে-অপ্রত্যাশিতভাবে যেন নেহাৎ কপালজোরেই ফিরে এসেছেন ডানকানের ডেকে। কিন্তু এ-কী হতশ্রী চেহারাতাদের? ছেঁড়াখোঁড়া জীর্ণ পোশাক, উদ্ভাস্ত ব্যাকুল শুষ্কশীর্ণ মুখ, চোখে এ-কী-রকম অসহায় ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি? গ্লেনারভন এমন কল্পনাভীতভাবে ডানকানেউঠে এসে তখনও যেন বুঝে উঠতে পারেননি গোটাটাই কোনো স্বপ্ন, না কি সত্য। জাহাজের মাঝিমাল্লারা অবশ্যি হঠাৎ তাদের ফিরে পেয়ে তুমুল হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু লেডি হেলেনা আর লর্ড এডওয়ার্ডের দশা যেন তাদের পুনর্মিলনের উৎসবে একটু ঠাণ্ডাজলই ঢেলে দিলে।

খিদেয় প্রায় নুয়ে পড়েছেন, অবসাদে দেহ ভেঙে পড়েছে-তবুও লর্ড গ্লেনারভন কিন্তু প্রথমেই টম অস্টিনের কাছে জানতে চাইলেন, টুফোল্ড উপসাগরের মুখে না-গিয়ে-ডানকান নিউজিল্যান্ডের পূব-উপকূলে কী করতে এসেছে? তবে কি জাহাজটাকে নরাধম

দস্যু বেন জয়েস দখল করতে পারেনি? তাছাড়া জেল থেকে পালানো সেইসব কয়েদিরাই বা কোথায়?

জেলপালানো কয়েদি? টম অস্টিন যেন আকাশ থেকেই পড়েছে। এ-কথার অর্থ? লর্ড গ্লেনারভন কি জানেন, তিনি কী-সব আবোলতাবোল বকছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ! ঐ যারা জাহাজটা দখল করে নেবে বলে হানা দিয়েছিলো? বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! এবারে বিভ্রান্ত ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি বুঝি-বা টম অস্টিনেরই। জাহাজে হানা দিয়েছিলো? কারা? কোন জাহাজে?

কেন? ডানকানে! বেন জয়েস আসেনি ডানকানে?

কে বেন জয়েস? আমি তার নামও শুনিনি কখনও, চোখে দেখা তত দূরের কথা!

দ্যাখোনি? তাহলে টুফোল্ডের মুখেনা-গিয়ে ডানকানএখানে-নিউজিল্যান্ডের এই পূর্ব-উপকূলে কী করছে?বাঃ রে, সে তত আপনার হুকুমেই এখানে এসেছি।

আমার হুকুমে?!

নিশ্চয়ই। না-হলে আমরা খামকা মেলবোর্ন ছেড়ে বেরুবো কেন? চোদ্দই জানুয়ারি যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কালবিলম্ব না-করে তক্ষুনি তো পালন করেছি-অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে পড়েছি!

আমার চিঠি? আমি তোমাকে চিঠিতে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে নিউজিল্যান্ডে চলে

আসতে বলেছিলুম?

এ-কোন চিঠির কথা বলছে টম অস্টিন? একটা চিঠি তিনি লিখেছিলেন-না, তিনি নিজের হাতে লেখেননি, জখম হয়ে গিয়ে ব্যথায়-অবশ হাতটা তিনি তখন প্রায় নাড়তেই পারতেন না, তবে তারই বয়ান অনুযায়ী সেটা গোটা-গোটা হরফে স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছিলেন জাক পাঞ্চওয়ল। তিনি চিঠিটা না-পড়েই কোনোমতেই শুধু তলায় নাম সই করে দিয়েছিলেন।

গ্লেনারভনের মাথাটা আবার কেমন যেন ঘুরে গেলো। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। অন্যারা পাশেই দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই কথোপকথন শুনছিলো, তারাও সবাই কি-রকম যেন বোমকে গিয়েছে। টম অস্টিন যে কী বলতে চাচ্ছে, তা-ই কারু মাথায় ঢুকছে না। ডানকানযে নিউজিল্যান্ডের পূর্ব-উপকূলে সমুদ্রেটলহ দিয়ে বেড়াচ্ছে, তা নাকি লর্ড গ্লেনারভনেরই নির্দেশমাফিক!

আবেশটা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছেন তখন গ্লেনারভন। এ আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো?...আচ্ছা, এক-এক করে সব শুনি। প্রথমেই-টম, সত্যি করে বলল, তুমি কি আমার কোনো চিঠি পেয়েছিলে?

হ্যাঁ। পেয়েছি।

মেলবোর্নে?

মেলবোর্নেই। আমরা তখন ডানকানের মেরামতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

চিঠিটা কীরকম? আমার লেখা?

না, হাতের লেখাটা আপনার ছিলো না বটে, আপনার বকলমে নিশ্চয়ই আর-কেউ লিখেছিলেন, তবে তলায় আপনার নাম সই ছিলো।

চিঠিটা কে নিয়ে এসেছিলো? বেন জয়েস? সেই ভয়ংকর দস্যু, যার নামে অস্ট্রেলিয়ায় হুলিয়া বেরিয়েছিলো?

কই, না তো। চিঠি যে নিয়ে এসেছিলো তার নাম তো আয়ারটন। সে তো ব্রিটানিয়া জাহাজের কোয়ার্টারমাস্টার ছিলো।

আয়ারটন আর বেন জয়েস একই লোক। কিন্তু কী লেখা ছিলো চিঠিতে?

লেখা ছিলো : চিঠি পাবামাত্র যেন একমুহূর্তও দেরি না-করে-

অত কথা শোনবার মতো ধৈর্য বুঝি তখন ছিলো না গ্লেনারভনের। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলেটুফোল্ড উপসাগরের মুখে যেতে বলেছিলাম।

এবার আবারও হতভম্ব হবার পালা বেচারার টম অস্টিনের। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে? না তো। স্পষ্ট করে লেখা ছিলো, একমুহূর্তও দেরি না-করে যেন নিউজিল্যান্ডের পূর্ব-উপকূলে চলে আসি।

না! না! না! এতক্ষণ যারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই কথোপকথন শুনছিলো, এবার তারা সকলেই সমস্বরে চৈঁচিয়ে উঠেছে।

টম অস্টিন এবার সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছে। একটা চিঠিও কি সে ঠিকমতো পড়তে পারে না? মাত্র দু-তিনটে লাইন? চিঠি পড়ে সে তো যেমন নির্দেশ ছিলো তা-ই করেছে। তবে কি চিঠিটা পড়তেই তার ভুল হয়েছে?

এতদিন সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই সব কাজ করে এসেছে। সকলেই বলতে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। একদিন নিজেই সে কোনো জাহাজ চালাবার ভার পাবে-খোদ কাপ্তেন হয়ে উঠবে। আর ঠিক যখনই একটা জাহাজ নিজে থেকে চালাবার ভার পেয়েছে, মহড়া দিচ্ছে কাপ্তেনগিরির, ট্রায়াল রানকে বলে, ঠিক তখনই এত-বড়ো একটা মারাত্মক ভুল! তার এতদিনের সুনামের পাশে অ্যাঙ্গিনে একটা মস্ত কালো উঁাড়া পড়ে গেলো? পারলে সে যেন কোনো শামুকের মতো এফুনি তার খোলার ভেতর গুটিয়ে যেতো!

তার লাল-হয়ে-যাওয়া মুখটা দেখে কেমন যেন দয়াই হয়েছে গ্লেনারভনের। তিনি সান্ত্বনার সুরে বলেছেন : অত মনখারাপ কোরো না। তোমার ভুলে বরং শাপেবরই হয়েছে-ঐ ভুলটা না-করলে আজ আর তোমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে পারতুম না।

ততক্ষণে টম অস্টিন নিজেকে সামলে নিয়েছে। মাপকরবেন, মি-লর্ড। এত-বড়ো কোনো ভুল আমি করতেই পারি না। সে-চিঠি শুধু আমিই পড়িনি, আয়ারটনও পড়েছে। সে বরং চিঠি পড়ে হস্বিতস্বি করছিলো। বলছিল, চিঠিতে ভুল লেখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে জাহাজটাকে নিয়ে যাবার জন্যে সে বরং জোরজবরদস্তি করতে চাচ্ছিলো।

আয়ারটন?!

হ্যাঁ। সে ধুয়ো ধরেছিলো, চিঠিতে নাকি ভুল লেখা হয়েছে। আপনি নাকি ডানকানকেটুফোল্ড উপসাগরের মুখেই নিয়ে যেতে বলেছেন।

এতক্ষণে অকুস্থলে নেমে পড়েছেন মেজর ম্যাকন্যাব্‌স। তাঁর মাথার মধ্যে সমস্তকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিলো। টম, চিঠিখানা কোথায়? সেটা দেখলই তো সব ভুলবোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে।

আনছি। বলেই উদ্বশ্বাসে নিজের ক্যাবিনে ছুটে গিয়েছে টম অস্টিন।

আর সে চলে যেতেই সবাই একসঙ্গে কলরব করে উঠেছেন। এ আবার কেমনতর প্রহেলিকায় ছিলো অস্ট্রেলিয়া, হয়ে গেলোনিউজিল্যান্ড! ব্যাঙাটির ল্যাজ খসে পড়লে ব্যাঙ হয়ে যায়, এটা সবাই জানে। কিন্তু কোথায় AUSTRALIA, আর কোথায় NEW ZELANAD!

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স এই কলরবে যোগ না দিয়ে বরং সরাসরি জাক পাঞ্চয়লের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। মঁসিয় পাঞ্চয়ল, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে হয়ে গেলো না তো?

গোলমেলে? মানে? জাক পাঞ্চয়ল কেমন যেন ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

আর তক্ষুনি হস্তদন্ত হয়ে চিঠিটা হাতে করে নিয়ে এসেছে টম অস্টিন। নাঃ, চিঠিটায় কোনো গোলমাল নেই-কেউ চিঠিটা জাল করেনি। এটা সেই চিঠিই, যা লিখেছিলেন মঁসিয় পাএওয়ল, আর যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন লর্ড গ্লেনারভন।

টম অস্টিন চিঠিটা লর্ড গ্লেনারভনের দিকেই বাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, আপনিই পড়ুন।

গ্লেনারভন পড়লেন :

টম অস্টিনকে হুকুম দিচ্ছি সে যেন এক্ষুনি ডানকানকে নিউজিল্যান্ডের পূর্ব-উপকূলে নিয়ে যায়।

নিউজিল্যান্ড! গ্লেনারভনের হাত থেকে চিঠিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছেন সিয় পাএওয়ল। আর চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়েই তিনি যেন আঁৎকে উঠেছেন। নিউজিল্যান্ড! তার চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে উঠেছে, তাতে সাতরাজ্যের বিস্ময়,

আর হাত থেকে খসে পড়ে গিয়েছে চিঠিটা।

মেজর ম্যাকন্যাব্‌স তার কাঁধে হাত রেখেছেন। প্রায় তারিফ করার ভঙ্গি করেই বলেছেন : বাহবা, মঁসিয় পায়ল। আপনি যে ডানকানকে কোচিন-চিনে পাঠিয়ে দেননি, এজন্যে আপনাকে শাবাশি দিতেই হবে!

বেচারী জাক পাঞ্চওয়ল! জাহাজশুল্ক সবাই এমনভাবে হো-হো করে হেসে উঠেছে যে তাঁর মনে হয়েছে পারলে বুঝি কোনো-একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে সঁধিয়ে যান।

কিন্তু এ-কী! মেজর ম্যাকন্যাসের ঠাট্টায় পাএয়লের মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে গেলো নাকি? তার মুখচোখের চেহারা দুম করে পালটে গিয়েছে। একটু আগেই যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিলো, এখন এক তুলকালাম উৎসাহে একবার দৌড়ে গেলেন জাহাজের সামনে, একবার পেছনে, প্রায় একটা পুরো-পাকই খেয়েছেন জাহাজের ডেকে। তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়েছেন। কী-যে করবেন, কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছেন না। মাথা নাড়ছেন আপনমনে, কী যেন বিড়বিড় করে বকছেন-খেয়ালই নেই কখন কোথায় যাচ্ছেন! হনহন করে একবার উঠে গেছেন ক্যাবিনের সিঁড়ি বেয়ে, পরক্ষণেই তিন লাফেই ফের নেমে এসেছেন ডেকে, সোজা ছুটে গেছেন ফোরকাসুলের দিকে, আর তারপরেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটা! হঠাৎ পা জড়িয়ে গেছে কুণ্ডলীপাকানো কাছিতে, মুখ খুবড়ে পড়তে-পড়তে সজোরে চেপে ধরেছেন সামনে যে-দড়িটা ঝুলছিলো তাকেই-

আর তক্ষুনি প্রচণ্ড আওয়াজ করে গর্জে উঠেছে কামান, গোলা ছুটে গিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের অস্থির জলের ওপর দিয়ে। বারুদঠাশা কামানের দড়িটা পাকড়ে ধরেই পড়ে যেতে-যেতে টাল সামলেছেন পাএয়ল। আর কামানের এই তুলকালাম আওয়াজ শুনে বেজায় ভড়কে গিয়ে পিছোতে গিয়ে চিৎপাত পড়েছেন হালের চাকার ওপর। পড়েই নটনড়নচড়ন নট কিছু। এ আবার কোন ফ্যাসদ-ভদ্রলোক হার্টফেল করেই মরে গেছেন নাকি? সবাই হস্তদন্ত হয়ে ছুটে গেছেন তার দিকে। না, মারা যাননি পাএয়ল, তবে ভির্মি খেয়েছেন, কেমন একটা দাঁতকপাটি লেগে গেছে! সবাই তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো জাহাজের পেছন দিককার উঁচু মাচাটায়।

বেচারি পাএয়লের দশা দেখে ততক্ষণে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে সবার। মেজর ম্যাকন্যাব্স ফৌজে থাকার সময় কতবারই কতজনের প্রাথমিক চিকিৎসার ভার

নিয়েছেন, ফাস্টএইড দিয়েছেন। তিনি ঝুঁকে পড়ে পাএয়লের সেই একমেবাদ্বিতীয় লাল-কালো ঢোলাজামাটা ক্ষতস্থান দেখছেন বলে যেই না হাত দিয়েছেন, অমনি তিড়িং-বিড়িংকরে লাফিয়ে উঠেছেন ভির্মি-খাওয়া মানুষটা-যেন তার দেহেবিদ্যুৎ আঁকুনি দিয়েছে।

না, না, ককখনো না, ছোঁড়াখোঁড়া জামাটা টেনেটুনে এমনি তড়িৎগতিতে তিনি ফের সারা গা ঢেকে দিয়েছেন যে সবাই ভারি তাজ্জব হয়ে গেছেন। মাথায় চোট খেয়ে শেষটায় পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছে নাকি মগজটা?

মেজর তো-ততা করে শুধু বলতে চেয়েছেন-কিন্তু, তাহলে—

মুখের মাথা কেড়ে নিয়েই বলেছেন পাএয়ল-গায়ে হাত দিলে ভালো হবে না বলছি।

এ তো আচ্ছা জ্বালা হলো দেখছি! দেখতে হবে না হাড়গোড় কোথাও ভাঙলো কি না!

যা ভেঙেছে, সেটা সারাতে ছুতোর লাগবে।

অ্যাঁ!

কী ভেঙেছে!

এ-যে মাথাটাই গেছে!

সবাইকার একসঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তার উত্তরে পাওয়াল ভাবলেশহীন মুখে জানিয়েছেন-ভেঙেছে তো খুঁটিটা-যেটার ওপর আছাড় খেয়েছিলুম!

এবার আর হেসে না-উঠে পারেননি কেউই। যাক, ভদ্রলোক শুধু পাগলই নন—নিরেটও। কামানের সঙ্গে কোলাকুলি করার পরিণামে তার দৈহে অন্তত কোনো জখম হয়নি-কিন্তু কোথায় কোনো আঁচড় পড়েছে কি না, সেটা ঠিক বোঝা যায়নি। তা, তিনি যখন কাউকেই দেখাতে দেবেন না কী হয়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে তেমন গুরুতর কোনো আঘাত লাগেনি।

গ্লেনারভন কিন্তু নাছোড়ের মতো লেগে রয়েছেন। আচ্ছা, এবার পুরো ব্যাপারটার জট খুলে দিন তো, মঁসিয় পাওয়াল! চিঠি লেখার সময় আপনি এই মস্ত ভুলটা না-করলে ডানকান বোম্বটেজাহাজ হয়ে যেতো ঠিকই-আর আমরাও হয়তো মাওরিদের হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পেতুম না। আপনার এই ভুলটার কাছে তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু আমি যেটা বুঝতে পারছি না আপনি এই ভুলটা করলেন কী করে? অস্ট্রেলিয়া লিখতে গিয়ে নিউজিল্যান্ড লিখতে তো দুর্দান্ত প্রতিভা লাগে-ব্যারন মুনখাউসেনের প্রতিভাতেও তা সম্ভব হতো কি না, কে জানে!

শুনুন তবে, লর্ড এডওয়ার্ড। সর্বসমক্ষে আমি কবুল করছি আমি একটা আস্ত গাড়ল, আকাট বোকা! সেই গোড়া থেকেই একটার পর একটা ভুলই করে চলেছি শুধু।

এমন স্বীকারোক্তির পর কী-যে বলা যায়, সেটা এমনকী পুঁদে ম্যাকগাসেরও মাথায় আসেনি।

কিন্তু গ্লেনারভন এবার ফের টম অস্টিনকে নিয়েই পড়েছেন। আচ্ছা, টম, হঠাৎ নিউজিল্যান্ড যাবার হুকুম পেয়ে তোমার মনে কোনো খটকা জাগেনি?

জেগেছিলো। আমি একটু অবাকই হয়েছিলুম। কিন্তু আমি জাহাজের ফাস্টমেট-ওপর থেকে হুকুম এলে আমার দিক থেকে প্রশ্ন করা মানায় না-আমি শুধু হুকুম তামিল করতেই শিখেছি। আমি যদি নির্দেশমতো কাজ না-করতুম আর আপনাদের যদি মস্ত কোনো বিপদ ঘটে যেতো, তবে আমিই কি তার জন্যে দায়ী হতুম না? আচ্ছা, কাণ্ডেন, ম্যাঙ্গসের দিকে কাতরভাবে তাকিয়ে সে জিগেস করেছে, আপনি হলে কী করতেন?

তুমি যা করেছে, তা-ই করতুম। কাণ্ডেন ম্যাঙ্গসের কথায় কোনো দ্বিধা নেই।

কিন্তু এ-রকম একটা অদ্ভুত হুকুম পড়ে তোমার কিছুই মনে হয়নি? গ্লেনারভন জেদ ধরেছেন : ব্যাপারটার একটা ফয়সালা না-করেই তিনি ছাড়বেন না।

আমার মনে হয়েছিলো, আপনারা নিশ্চয়ই কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো খোঁজ পেয়ে একমুহূর্তও সবুর না-করে সোজা নিউজিল্যান্ডের পূব-উপকূলের দিকে অন্যকোনো জাহাজে করে চলে গিয়েছেন-আমাকেও আসতে বলেছেন ডানকান নিয়ে। তাই কাউকে কিছু না-বলেই আমি তৎক্ষণাৎ জাহাজ ছেড়ে দিই। বারদরিয়ায় পড়ার আগে জাহাজের আর-কেউই জানতে পারেনি আমরা কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু তারপরেই এমন-একটা ঘটনা ঘটলো যে সব তালগোল পাকিয়ে গেলো।

কী ঘটলো?

জাহাজ ছেড়ে দেবার পরেরদিন আয়ারটন যখন শুনলে যে জাহাজ যাচ্ছে—

আয়ারটন! সে এখনও জাহাজে আছে নাকি?

হ্যাঁ। আছে। ঐ সামনের ক্যাবিনে। পাহারার জন্যে আমি একজনকে মোতায়ন করে রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা থাকে।

কেন? ওকে কয়েদ করেছো কেন?

ডানকাননিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে শুনে সে এমনই খেপে যায় যে তাকে সামলানোই দায় হয়ে পড়ে। বলে যে জাহাজের মুখ ঘোরাতেই হবে, জোরজুলুমও করেছিলো, এমনকী মাঝিমাঝীদের খেপিয়ে তুলে একটা মিউটিনি বাধাবারও চেষ্টা করে। অগত্যা, নাচার হয়েই, আমাকে তাকে বন্দী করতে হয়।

হ্যাঁ, এটা ঠিকই করেছে। কিন্তু তারপর?

তারপর থেকে ঐ ক্যাবিনেই আছে। আর ওকে বেরুতে দেয়া হয়নি।

ঠিক আছে। তাহলে ওকে এফুনি এখানে নিয়ে-আসার ব্যবস্থা করো।

আয়ারটন যখন এসেছে, সঙ্গে পাহারা, তখন তার পা একবারও কাপেনি! মুখটা শুকনো গম্ভীর, কিন্তু তাতে একটা তেরিয়া জেদেরও ভাব। গ্লেনারভনের সামনে এসে সে বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে জেরার প্রতীক্ষায়।

আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো, আয়ারটন, কোনো ভনিতা না-করে সোজাসুজি বলেছেন গ্লেনারভন। অবশ্য দেখা হলো সেই জাহাজেই যেটা তুমি জেলপালানো দস্যুদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে।

আয়ারটনের মুখচোখ গোঁয়ারের মতো। সে কোনো কথা না-বলে চুপচাপদাঁড়িয়ে থেকেছে।

গ্লেনারভনও নাছোড়। কী? জবাব দাও, আয়ারটন। বললো, তোমার কী বলার আছে। আমি তোমার কাছ থেকে একটা জবাবদিহি চাই।

আয়ারটনের চোখদুটো একবার জ্বলে উঠেই পরক্ষণেই নিভে গিয়েছে! ঠাণ্ডাগলায় বলেছে, আমার কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই। আমাকে নিয়ে আপনারা যা প্রাণে চায় করতে পারেন।

এ-কথা বললে তো চলবে না, আয়ারটন। আমি সোজাসুজি কয়েকটা প্রশ্ন করবো তোমাকে, এবং এও চাইবো যে তুমিও সোজাসুজি সে-সব কথার জবাব দেবে! আমার প্রথম প্রশ্ন হলো : তুমি কি কোনোকালে সত্যি-সত্যি ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টারমাস্টার ছিলে?

প্রশ্নটা যেন আয়ারটনের কানেই ঢোকেনি। সে বিকারহীন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে।

গ্লেনারভনের ধৈর্যের বাঁধ বোধহয় ভেঙেই যেতে চেয়েছে। ব্রিটানিয়া জাহাজ থেকে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলে কীভাবে? এবং কেন?

আয়ারটন দাঁড়িয়ে থেকেছে নিরুত্তর ।

আয়ারটন, আমি তোমার ভালোর জন্যেই জিগেস করছি। আমি এই প্রশ্নগুলোর জবাব চাই ।

এবার আয়ারটন সোজাসুজি তাকিয়েছে গ্লেনারভনের চোখে। আমার কিছুই বলার নেই। আমার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো অভিযোগ থাকে, তবে সেটা প্রমাণ করবার দায় আপনার-আমার নয় ।

প্রমাণ? প্রমাণ করাটা কি খুব কঠিন হবে?

কঠিন নয়! এবার টিটকিরি দিয়েছে আয়ারটন। আপনি তালেবর লোক, লর্ডসাহেব, তাই তড়িঘড়ি সব ঠিক করে ফেলছেন। কিন্তু কোনো আদালতের সবচেয়ে কড়া হাকিমও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। কাপ্তেন গ্রান্ট যখন নেই তখন কে এসে বলবে যে আমি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম কেন? এবং আমিই যে বেন জয়েস, তা-ই বা কে বলবে? পুলিশ তো আমায় কখনও পাকড়াতে পারেনি। আমার যারা সাগরেদ ছিলো, তারাও তো সবাই পুলিশের খপ্পর থেকে পালিয়েছে। আমি যে সত্যি-সত্যি কোনো অপরাধ করেছি, সেটা প্রমাণ করবে কে? আমি যে জেলপালানো দস্যুদের হাতে এ-জাহাজটা তুলে দিতে চেয়েছিলাম, তা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে? কেউ পারবে না। আপনি শুধু কতগুলো সন্দেহের কথা তুলেছেন-কিন্তু শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কারু কখনও সাজা হয় না। যতক্ষণ-না সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ জোগাড় করতে পারছেন ততক্ষণ আমি ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টারমাস্টার আয়ারটন ছাড়া আর-কেউ নই।

গ্লেনারভন এতক্ষণ তার কথায় কোনো বাধা দেননি। এবার সে থামতেই বলেছেন, আমি তোমায় বিচার করতে বসিনি, আয়ারটন-তোমাকে সাজা দেবার কোনো বাসনাও আমার নেই। আমি এও জানতে চাচ্ছি না তুমি নিজের অপরাধের জন্য কতরকম ওজর বা কৈফিয়ৎ খাড়া করো। অন্তত এটুকু বলো, কোথায় গেলে তাকে খুঁজে পাবো।

আয়ারটনের মুখে কোনো বিকার নেই। সে ঘাড় গুঁজে চুপ করে থেকেছে।

ব্রিটানিয়ার্টিক কোথানে ডুবে গিয়েছিলো, সেটা বলতে নিশ্চয়ই তোমার কোনো আপত্তি নেই?

আছে।

এবার গ্লেনারভনকী-যে করবেন, ভেবেই পাননি। একটু চুপকরে থেকে শেষটায় বলেছেন, আয়ারটন, অন্তত এই ছেলেমেয়ে দুটির মুখ চেয়ে বলোকাপ্তেন গ্রান্ট এখন কোথায় আছেন?

এই-প্রথম আয়ারটনের মুখটা কেমন কোমল হয়ে এলো, একটু যেন দোটানায় পড়েছে সে। যেন ভেবেই পাচ্ছে না কী বলবে। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের দুর্বলতা।

পরক্ষণেই রক্ষস্বরে বলে উঠেছে। উঁহু, আমি এ-বিষয়ে কিছুই বলবো না। কী করবেন? আমাকে ফাঁসি দেবেন!

ফাঁসি দেবো? এবার গ্লেনারভনও আর রাগ সামলাতে পারেননি। না, আয়ারটন, না। আমি জজসাহেবও নই, জল্লাদও নই। কোনো জজ থেকে জল্লাদ হতে চাই না আমি। প্রথমে যে-বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবো, সেখানেই নৌ কর্তৃপক্ষের হাতে তোমাকে তুলে দেবো। তোমাকে নিয়ে নৌ কর্তৃপক্ষ কী করবে, সে তাদের ভাবনা।

আমিও তো তা-ই চাইছি। বলেই আয়ারটন ফিরে গিয়েছে নিজের ক্যাবিনে-সঙ্গে গেছে জাহাজের দুজন মাঝা, তার সর্বক্ষণের পাহারা।

আয়ারটন ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তাকে কিছুতেই টলানো গেলো না।

কিন্তু এখন তাহলে তাঁরা কী করবেন? ব্রিটানিয়ার কোনো হৃদিশই আজ অন্ধি পাওয়া যায়নি। বোতলে-পাওয়া সেই চিরকুটগুলো জুড়ে দিয়েও আজও তার কোনো অর্থোদ্ধার করা যায়নি। ৩৭° দেশান্তরে আর তো কোনো ডাঙা নেই। তাহলে কি ইওরোপেই ফিরে যাবে ডানকান?

অগত্যা। জাহাজে যাকয়লা আছে, তাতে বড়োজোর দিন-পনেরো চলবে। কাজেই ডানকানলকাউয়ানো উপসাগরে ফিরে গিয়ে কয়লা ও অন্যান্য রসদ নিয়ে কেপ হর্ন ঘুরে ফের অ্যাটলান্টিক পেরিয়ে ফিরে যাবে স্বদেশেই।

সেই মর্মেই নির্দেশ দিয়েছেন লর্ড গ্লেনারভন, এবং আধঘন্টা বাদেই জাহাজের মুখ ঘুরেছে সেই পথে। তার খানিক বাদে পেছনে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ডের তটরেখা।

জাহাজ চলেছে, যেহেতু সে কলের জাহাজ, বয়লার জ্বলছে, সারেঙ দিক ঠিক করে দিচ্ছে, কিন্তু মানুষগুলো?

অভিযান যখন শুরু হয়েছিলো তখন কী উৎসাহ ছিলো সবাইকার, কতটা আশা, কতটা উদ্দীপনা। এখন কে যেন নিংড়ে বার করে দিয়েছে সব। কি-রকম হতাশ, ব্যর্থ, নিষ্পল লাগছে সবাইকার, কী-ভীষণ মনখারাপ। কাপ্তেন গ্রান্টের কোনো হৃদিশ যে জানে, সে ঐ আয়ারটন। কিন্তু সে তার মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। কানে খুঁজেছে তুলো, পিঠে বেঁধেছে কুলো। লর্ড গ্লেনারভনের কোনো ক্ষমতাই নেই যে তার মুখ থেকে টু-শব্দটি বার করবেন।

মেরি আর রবার্টের দিকে এখন আর তাকানোই যাচ্ছে না। যে-রবার্ট সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটতো, পথের এত বিপদেও যার মুখ থেকে কখনও হাসিটি মিলিয়ে যায়নি, সে পর্যন্ত কেমন যেন বিধ্বস্ত, মনমরা, হতাশ। ক্রোনিদো একদিন তাকে বলেছিলো, এখন তুমি আর ছোটটি নও, রবার্ট, এখন তুমি বড়ো হয়ে গেছে; সেই ক্রোনিদোই এখন তাকে দেখতে পেলে ভাঙাগলায় হয়তো বলে উঠতো, তুমি তো বড়ো হওনি, রবার্ট, তুমি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছে! আর মেরি? সে গিয়ে সটান ঢুকেছে তার ক্যাবিনে, গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে।

এ-সব দেখে লেডি হেলেনা আর থাকতে পারেননি। তিনি কি কিছু করতে পারেন? তিনি কি বোঝাতে পারবেন না আয়ারটনকে? তিনি কি একবার শেষচেষ্টা করে দেখবেন না? গ্লেনারভনকে বলে-বলে শেষটায় রাজি করিয়েছেন হেলেনা, তিনি নিজে আয়ারটনের ক্যাবিনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন, সঙ্গে থাকবে শুধু মেরি, আর-কেউ নয়। অন্য-

কারু সামনে হয়তো আয়ারটন কোনো কথা বলবে না। যদি শুধু তাদের কাছেই মুখ খোলে...।

পাঁচই মার্চ আয়ারটনের ক্যাবিনেই মেরিকে নিয়ে গিয়েছেন লেডি হেলেনা। একঘন্টারও ওপর কত কাকুতিমিনতি, কত সাধ্য-সাধনা করেছেন তাকে, কত বুঝিয়েছেন-কিন্তু আয়ারটনের বোধহয় বুক নেই, হৃদয় যেখানে থাকে সেখানে। বোধহয় আছে শুধু পাষাণ-সে একফোঁটাও টলেনি।

লেডি হেলেনার কিন্তু জেদ চেপে গিয়েছিলো। ফিরেই তো চলেছেন-কিন্তু ফিরে যাবার আগে কোনোমতে যদি আয়ারটনের মুখ থেকে একটা কথা খসানো যায়! পরদিন তিনি আবার গেলেন আয়ারটনের ক্যাবিনে,এবার একেবারে একা। মেরিকেও নিয়ে যাননি। মেরি বেচারি আয়ারটনের নির্বিকার নির্লিপ্তভাব সহিতে পারেনি, সে বরং আরো ভেঙে পড়েছে। তারপর দু-ঘন্টা লেডি হেলেনা মুখোমুখি বসে থেকেছেন। আয়ারটনের, তাকে বুঝিয়েছেন, একবারও মেজাজ খারাপ করেননি, তর্ক করেননি, হুমকি দেননি, শুধু অনুনয়-বিনয়।

আর বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করেছেন অন্যরা। কীরকম হাত কামড়াতে ইচ্ছে করেছে সকলের, এমন অসহায় আর অক্ষম লাগছিলো।

দু-ঘন্টা পরে লেডি হেলেনা বেরিয়ে আসতেই অধীরস্বরে গ্লেনারভন। শুধিয়েছেন : কী? মুখ খুলেছে?

না। তবে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করতে চাচ্ছে।

তাহলে কি একটু টলেছে ওর মন?

বোধহয় ।

তুমি কি ওকে কোনো কথা দিয়ে এসেছো? কোনো প্রতিশ্রুতি?

আমি তোমার হয়ে ওকে কথা দিয়েছি যে ওর শাস্তিটা যাতে লঘু হয় সেজন্যে তুমি তোমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা-ই করবে ।

বেশ । তাহলে আমি এম্মুনি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি ।

আয়ারটন যখন গ্লেনারভনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তার মুখচোখে তেমন কোনো বদল দেখা যায়নি যা থেকে মনে হতে পারে অকস্মাৎ তার কোনো হার্দ্য পরিবর্তন হয়েছে ।

এবার তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বলবে তো, আয়ারটন?

আয়ারটন ঘাড় হেলিয়ে তার সম্মতি জানিয়েছে । তারপর বলেছে :

তবে আমি যখন কথা বলবো তখন এখানে যদি মঁসিয় পাএয়ল আর মেজর ম্যাকন্যাব্‌স উপস্থিত থাকেন, তাহলে ভালো হয় ।

কার ভালো হয়?

আমার । খুব শান্তস্বরে আয়ারটন বলেছে ।

তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করেছেন গ্লেনারভন । তারপর ডেকে পাঠিয়েছেন পাণ্ডয়ল আর ম্যাকগ্যাসকে ।

তারা এসে হাজির হতেই গ্লেনারভন বলেছেন : এবার বলো ।

আয়ারটন কী যেন ভেবে নিয়ে বলেছে : দুই পক্ষের মধ্যে যখন কোনো রফা হয়, তখন সাক্ষী থাকলে ভালো হয় বলেই আমি মেজর ম্যাকন্যাব্‌স আর মঁসিয় পাণ্ডয়লকে এখানে থাকতে বলেছি । কেননা আমি এখন আপনার সঙ্গে একটা রফানিষ্পত্তিতে আসতে চাই ।

রফানিষ্পত্তি? কী-ধরনের রফা?

আপনি চান এমন-কিছু খবর যা শুধু আমিই জোগাতে পারি । আর আমি চাই এমন-কিছু সুবিধে যা শুধু আপনিই আমাকে দিতে পারবেন ।

হ্যাঁ, মঁসিয় পাণ্ডয়ল এই ভনিতায় একটু অধীর হয়ে উঠেছেন, কিন্তু, কী এমন খবর তুমি আমাদের দিতে পারো, যা আর-কেউই জোগাতে পারবে না?

উঁহু, গ্লেনারভন তাকে থামিয়ে দিয়েছেন, আমি জানতে চাই কী এমন সুবিধে আমি তোমাকে দিতে পারি, যার জন্যে তুমি এমন দরাদরি করছো?

আপনি তো আমাকে ইংরেজ গবর্নরের হাতে তুলে দিতে চাইছেন?

হ্যাঁ।

অর্থাৎ আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে চান না?

এ একটা বিষম সংকটের মধ্যে পড়েছেন গ্লেনারভন। উত্তরে তিনি কী বলবেন তার ওপরই নির্ভর করছে কাণ্ডন গ্রান্ট ভাগ্য-তাছাড়া মেরি আর রবার্টের কথাও তাকে ভাবতে হবে। অথচ আয়ারটন যে-ভয়ানক অপরাধ করেছে, তার যদি কোনো সাজা না-হয়, তাহলে তো ন্যায়নীতি বলে কিছুই থাকবে না। শেষটায় কঠিনসুরে তিনি বললেন, না আয়ারটন। আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। কেউ যদি ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু আমি তো তা চাইছি না?

তবে তুমি কী চাচ্ছে?

আমি কখনও এ-কথা বলিনি যে আমাকে আপনারা এমনি-এমনি ছেড়ে দিন। আমি কঁসির দড়িও চাইছি না-অথবা বেকসুর খালাস পেতেও চাইছি না-চাইছি এরই মাঝামাঝি কিছু-একটা।

সেটা কী?

আমাকে বরং প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো নির্জন দ্বীপেই ছেড়ে দিন আপনারা, সঙ্গে দিন সামান্য-কিছু খাবার-দাবার। কষ্টেস্টেইনা-হয় দিন কাটাবো সেখানে-আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

ঠিক এমন-কোনো প্রস্তাব যে আসতে পারে, গ্লেনারভন সেটা প্রত্যাশাই করেননি। কী-রকম অপ্রস্তুত চোখে ম্যাকন্যাব্স আর পাএয়লের মুখের ওপর চোখ বুলিয়েছেন তিনি। দুজনের কারুকাছ থেকেই কোনো সাড়া আসেনি। যা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সেটা নিতে হবে স্বয়ং গ্লেনারভনকেই। সারা সেলুনঘরটা হঠাৎ কী-রকম যেন শুক্ক হয়ে গেছে। শুধু জানলা দিয়ে একটানা ভেসে আসছে জলের ছলছল আর এনজিনের গুঞ্জন। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে শেষটায় গ্লেনারভন বলেছেন, তোমার কথা যদি রাখি, তবে তুমি যা জানো সব বলবে তো, আয়ারটন?

হ্যাঁ, মি-লর্ড। কাপ্তেন গ্রান্ট অর ব্রিটানিয়া সম্বন্ধে যা জানি, সব খুলে বলবো। কোনো কথাই বাদ দেবো না।

সব বলবে? সত্যি?

সত্যি। আমি হলফ করে বলছি—

কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে একটু অসহিষ্ণুস্বরেই গ্লেনারভনবলে উঠেছেন, কিন্তু তুমি যে সত্যিকথা বলছো, তা আমরা বুঝবো কী করে? তুমি যে আগের মতোই সব বানিয়ে-বানিয়ে বলবে না, তা আমরা যাচাই করে নেবো কী করে?

বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। আমি বদমায়েশ, বিশ্বাসঘাতক, মহাপাতক-তবুও আমার কথা আপনাদের বিশ্বাস করতেই হবে। এছাড়া তো আর-কোনো চারা নেই।

বেশ। আমরা তাহলে ধরেই নেবো যে তুমি যা বলছে, তার কিছুই মিথ্যে নয়।

যদি পরে দ্যাখেন, আমি আবার আপনাদের সঙ্গে ফেরেব্বাজি করেছি, তাহলে তো অনায়াসেই কঠোর-সাজা দিতে পারবেন-

কীভাবে?

যে-জনমানবহীন দ্বীপটায় আমাকে নামিয়ে দেবেন, সেখান থেকেই ফের আমায় পাকড়ে আনতে পারবেন।

এ-কথার পর অবশ্য আয়ারটনকে আর অবিশ্বাস করার কোনো কথাই ওঠে না। আয়ারটন বলেছে, আপনাদের আমি গোড়াতেই বলে দিতে চাই-আমার কাছ থেকে আপনারা বেশি কিছু প্রত্যাশা করবেন না। কাপ্তেন গ্রান্ট সম্বন্ধে খুব-বেশি কথা আমি জানি না।

সে-কী? তাহলে-

হ্যাঁ, মি লর্ড। আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই আমার খবর। কিন্তু তা থেকে ব্রিটানিয়া জাহাজ যে কোথায় ডুবেছে, সে-কথা আপনারা জানতেই পারবেন না-

ঘরটার মধ্যে যেন বিনামেঘেবজ্রাঘাত হয়েছে। এই কথাবর্তার সূচনায় সবাই ভেবেছিলেন, এতদিনে বুঝি শেষটায় কাণ্ডেন গ্রান্টের ঠিকানা মিললো। আর এখন কি না আয়ারটন নিজেই বলছে যে সে যা বলবে তা থেকে কাণ্ডেন গ্রান্টের কোনো পাত্তাই পাওয়া যাবে না।

আয়ারটন ফের বলেছে, আমি আপনাদের আগেই বলেছি, মি-লর্ড, এই রফায় যদি কারু কোনো সুবিধে হয়, সে আমার। আপনাদের কোনো লাভই হবে না।

ঠিক আছে। তোমার প্রস্তাবটাই মেনে নিচ্ছি, বলেছেন গ্লেনারভন। কিন্তু মনে রেখো, প্রশান্ত মহাসাগরের যে-দ্বীপটায় তোমাকে নামিয়ে দেবো, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ জনমানবমশূন্য হবে—

আমি তো তা-ই বলেছি, মি-লর্ড। কোনো নিরিবিলি দ্বীপে আমি পুরোপুরি-একা আমার নিজের মুখোমুখি হতে চাই।

ভারি-অদ্ভুত একটা কথা বলছে আয়ারটন। নিজের মুখোমুখি হবে। একা-একাই। অথচ তার মুখে অনুশোচনার কোনো চিহ্নই নেই। সম্পূর্ণ বিকারহীন একটা মুখ। মনে হচ্ছে—সে যে সব কথা খুলে বলতে রাজি হয়েছে, তা যেন নিজের কথা ভেবে নয়-অন্য-কারু কথা ভেবেই।

গ্লেনারভন এবার শুরু করেছেন একেবারে গোড়া থেকে। আচ্ছা, আগে তুমি তোমার পরিচয় দাও। সত্যি করে বললো, তুমি কে!

আমার নাম টম আয়ারটন। আর এ-কথাটাও মিথ্যে নয় যে আমি ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টারমাস্টার ছিলাম। কিন্তু গোড়া থেকেই কাপ্তেন গ্রান্টের সঙ্গে তুচ্ছ-সব কারণে খটাখটি লাগছিলো। শেষটায় আমি অন্য মাঝিমাল্লাদের খেপিয়ে দিয়ে ব্রিটানিয়াদখল করে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভালো করে ঘোঁট পাকাবার আগেই কাপ্তেন গ্রান্ট আমায় অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দিয়ে চলে যান।

অস্ট্রেলিয়ায়?এবারে চমকে উঠেছেন মেজর ম্যাকন্যাব্স। তার মানে ব্রিটানিয়া যখন কাইয়াওতে পৌঁছোয়, তখন তুমি জাহাজে ছিলে না?

না। কাইয়াওতে যাবার আগেই আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো। প্যাডি ওমুরের খামারবাড়িতে যে কাইয়াওর নাম বলেছিলাম, সে শুধু আপনাদের মুখে পুরোকাহনটা শোনবার পরই।

হুঁ! জিগেস করেছেন গ্লেনারভন, কিন্তু তারপর কী হলো?

অস্ট্রেলিয়ায় আমার সঙ্গে একদল জেলপালানো কয়েদির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ক-দিনের মধ্যেই আমি তাদের পাণ্ডা হয়ে উঠি, আড়াই বছর ধরে অবাধে খুনজখম লুঠতরাজ চালিয়ে যাই। সেখানে বেন জয়েস নামেই পুলিশ আমাকে চিনতো-আমার সত্যিকার পরিচয় কারু জানা ছিলো না। আমাকে আগে যারা চিনতো, তারা সবাই ব্রিটানিয়ারসঙ্গেই অথই পাথারে ভেসে গিয়েছিলো। কিন্তু পুলিশ যখন বেন জয়েসের নামে হুলিয়া বার করে দিলে,আর অনবরত পুলিশের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হতে লাগলো, তখন আমি ভেবেছিলাম-ধুর-ছাই, ডাঙায় আর নয়। আর তাই ১৮৬৪ সালের . সেপ্টেম্বর মাসে ফের

আয়ারটন সেজে প্যাডি ওমুরের খামারে গিয়ে চাকরি নিয়েছিলাম। শুধু-যে পুলিশের চোখে ধুলো দেয়াই উদ্দেশ্য ছিলো তা নয়। প্যাডি ওমুরের খামারটা সমুদ্রের একেবারে গা ঘেঁষে বলেই অনবরত জাহাজ এসে ভেড়ে সেখানে। মৎলব ছিলো, সুযোগ পেলেই কোনো-একটা জাহাজে দখল করে বসবো। তারপর আর আমায় পায় কে? পুরো সমুদ্রটাই আমার দখলে চলে আসবে। অনবরত আর পুলিশের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে না। আমিই যে বেন জয়েস, প্যাডি ওমুর সেটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। আমার কাজে সে মোটামুটি খুশিই ছিলো। হঠাৎ এমন সময় দু-মাস বাদে একদিন এসে হাজির ডানকান। আপনাদের মুখেই খাবারটেবিলে বসে-বসে জানতে পেলাম যে কাইয়াও যাবার পথে হঠাৎ একদিন ব্রিটানিয়া নিখোঁজ হয়ে গেছে-বোতলে-পাওয়া একটা চিরকুট পড়ে শুধু এটুকুই জানা গেছে সে নাকি সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তরের কোথাও। অমনি মনে-মনে ফন্দি এঁটে ফেললাম, এটাই সুযোগ,এই ডানকানকেইদখল করে নিতে হবে। নৌবাহিনীর সেরা জাহাজটাকেও টেক্সা দিতে পারে ডানকান-যদি কোনো জাহাজ নিয়ে সমুদ্রকে শাসন করে বেড়াতে হয় তবে তো এমন-কোনো জাহাজই চাই। কিন্তু ডানকানকে ছোটোখাটো ভাঙচুর মেরামত করতে হবে শুনে তখন আর তাকে বাধা দিইনি, মেলবোর্নে যেতে দিয়েছি। আপনাদের গাইড সেজে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে। ডানকানের হৃদিশ পেয়েই আমি আর আমার দলের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছিলো, কখনও আমাদের আগে-আগে গেছে, কখনও গেছে পেছন-পেছন। তারাইমিছেমিছি ট্রেন উলটে দিয়ে, ক্যামডেন ব্রিজের কাছে লুঠতরাজ চালায়-তখন ঠিক এভাবে নিজেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ওদের উচিত হয়নি। সেটাই আমাদের চালে সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছিলো। আমি অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম অত-বড়ো সমুদ্র ছাড়া আর-কিছুতেই আমি আঁটবো না। পথ

দেখিয়ে আপনাদের নিয়ে এসেছিলাম স্লোয়ি নদী অর্দি, পথে একটা-একটা করে মেরেছি ঘোড়া আর বলদগুলোকে, যাতে আপনারা মেলবোর্ন অর্দি পুরো রাস্তাটা একসঙ্গে যেতে না-পারেন। শেষটায় একদিন কাদার মধ্যে গাড়িটাকে ডাবিয়ে দিয়েছি আমিই। মঁসিয় পাঞয়ল যদি অন্যমনস্ক হয়ে চিঠিটায় নিউজিল্যান্ড কথাটা না-লিখতেন অ্যাদ্দিনে আমিই তবে ডানকানের মালিক হয়ে বসতাম। এছাড়া আর কিছুই আমার বলার নেই, মি-লর্ড। কাপ্তেন গ্রান্ট কোথায় আছেন আমি জানি না। কিন্তু আপনারা তো আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন-আমারই সুবিধে হবে জেনেও আপনারা আমায় কোনো-একটা নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।

আয়ারটনের পুরো কাহনটা শেষ হবার পরেও বেশ-কয়েক মিনিট কারু মুখে কোনো কথা নেই। বাইরে জলের উচ্ছল রোল আর এনজিনের গুঞ্জন। ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ। এটুকু অন্তত তিনজনেই বুঝতে পেরেছেন, আয়ারটন নরাধম হতে পারে, কিন্তু এবার সে একটাও মিথ্যেকথা বলেনি। তার সব ষড়যন্ত্র ভঙুল হয়ে গেছে মঁসিয় পাঞয়লের অন্যমনস্কতায়। কারু-কোনো অন্যমনস্কতাও যে অনেক সময় মহাবিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, এটা বোধহয় তারই অনন্য নজির। আবার কৌতুক এটাই যে পাঞয়লের অন্যমনস্কতায় নরাধম আয়ারটনের মুঠোর মধ্যে এসেও হাত ফসকে বেরিয়ে গেছে ডানকান।

কবে তোমাকে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে নামিয়ে দেয়া হয়েছিলো?জিগেস করেছেন মেজর ম্যাকন্যা। ১৮৬২ সালের আটই এপ্রিল?

হ্যাঁ।

কাপ্তেন গ্রান্ট কোথায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন?

ঠিক জানি না।

যতটুকু জানো, বলো।

নিউজিল্যান্ড যেতে চেয়েছিলেন। কাইয়াও থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই ঐদিকেই গিয়েছিলেন। চিরকুটের তারিখের সঙ্গে কিন্তু ব্রিটানিয়ারডুবে-যাবার তারিখটাও মিলে যাচ্ছে।

এবার পাএয়লও সায় দিয়েছেন। তা ঠিক।

কিন্তু গ্লেনারভন সে-কথা শুনতেই চাননি। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কোনো নামগন্ধই তো নেই চিরকুটগুলোয়।

এ-বিষয়ে আমার ঠিক কিছুই জানা নেই, বলেছে আয়ারটন। নিউজিল্যান্ড যাবার কথা আলোচনা হয়েছিলো অবশ্য ব্রিটানিয়ায়।

গ্লেনারভন বলেছেন, যাক-গে। তুমি তোমার কথা রেখেছো যখন, তখন আমিও আমার কথা রাখবো। জবানের কোনো নড়চড় হবে না। ঠিক কোন দীপে যে তোমায় নামিয়ে দেয়া যায়, এবার সেটাই ঠিক করা যাক।

আমার কোনো পছন্দ নেই। যেখানে হয় নামিয়ে দিলেই হবে।

বেশ, তাহলে এখন তোমার ক্যাবিনে ফিরে যাও।

পাহারারা আয়ারটনকে তার ক্যাবিনে নিয়ে গেছে তারপর।

সে চলে যেতেই বেশ খানিকটা আপশোস করেই বলেছেন গ্লেনারভন : আয়ারটনের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। লোকটাকু-পথে না-গেলে অনেক উঁচুতে উঠতে পারতো। ওর মাথা আছে, সাহস আছে, নিজের ক্ষমতার ওপর অপরিসীম বিশ্বাস আছে। কিন্তু আয়ারটনের কথা এখন থাক। এটা বোধহয় ধরে নেয়াই যেতে পারে যে কাপ্তেন গ্রান্টের আশা এবার আমাদের ছাড়তে হবে। কেউ জানে না তিনি কোথায়। শেষ ভরসা ছিলো আয়ারটন-এখন তো সেটাও গেলো।

কেউ জানে না মানে? হঠাৎ পাণ্ডয়ল উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেছেন। আমি জানি। আমি-জাক পাণ্ডয়ল।

গত কদিন ধরেই মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন পাণ্ডয়ল। আর হঠাৎ এমন বোমা ফাটালেন সেই-তিনিই।

আপনি জানেন?

আলবৎ।

কীভাবে জানলেন?

ঐ চিরকুটগুলো পড়েই।

ধেন্তোরি, যাও-বা আশা হয়েছিলো, তাও চুপসে গেলো। মেজর ম্যাকন্যাব্স আর-কখনও ঐ চিরকুট নিংড়ে কোনো অর্থ বার করবার কথা বিশ্বাসই করেন না।

এবার পাণ্ডয়ল প্রায় খেপেইউঠেছেন। কথাটা আগে শুনেনি, ফুঃ করে উড়িয়ে দেবেন পরে। অ্যাডিন কিছু বলিনি কেউই আমার কথা বিশ্বাস করবে না বলে। কিন্তু এখন আর আমার কোনো সন্দেহ নেই। আয়ারটনও আমার কথায় সায় দিয়ে গেছে এইমাত্র। সেইজন্যেই আজ আমি সব কথা খুলে বলবো

নিউজিল্যান্ডে-

কী-একটা বলতে চেয়েছেন গ্লেনারভন, কিন্তু পাণ্ডয়ল অধীরভাবে তাকে থামিয়ে দিয়েছেন। কথাটা আগে শুনুন। স্লোয়ি নদীর তীরে বলদে-টানা গাড়িটার মধ্যে বসে আপনার শ্রুতিলিখন শুনে-শুনে চিঠিটা লেখবার সময় ভুলটা আমার অকারণে হয়নি। আমার মাথায় তখন নিউজিল্যান্ড শব্দটাই ঘুরছিলো। NEW ZEALAND। অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড গেজেটটা ভাজ-করা পড়ে ছিলো মেঝেয়-এমনভাবে যে শুধু ALAND হরফগুলোই দেখা যাচ্ছিলো। আর তা-ই দেখেই আমার মাথায় নিউজিল্যান্ড শব্দটা বিদ্যুতের মতো খেলে গিয়েছিলো। মনে আছে নিশ্চয়ই-চিরকুটে aland কথাটাও ছিলো কিন্তু আমরা তার অন্যরকম অর্থ-করেছিলুম।

তখনই যদি কথাটা আপনার মাথায় খেলে গিয়ে থাকে, তবে অ্যাডিন মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন কেন? জিগেস করেছেন গ্লেনারভন।

ফের মিথ্যে একটা আশা দিয়ে সবাইকে নাচিয়ে তুলতে চাইনি বলে। তাছাড়া, চিরকুটে লেখা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তর অনুযায়ী অকল্যাণ্ডের দিকেই তো যাচ্ছিলুম।

কিন্তু সে-রাস্তা থেকে এখন তো আমরা সরে এলুম, গ্লেনারভন প্রায় চেপেই ধরেছেন তাকে, যখন ডানকানের মুখ ঘোরানো হয়েছে ফিরতিপথে, তখনও কেন সে, কথা বলেননি?

বলে কোনো লাভ হতো না বলে। কাণ্ডেন গ্রান্টের হৃদিশ আপনি পেতেন কোথায়?

তার মানে?

নিউজিল্যান্ডের উপকূলে জাহাজডুবির পর দু-বছর যে-মানুষের খোঁজ নেই, হয় তিনি ডুবে মরেছেন, আর নয়তো মিশেল এঁতেইন-এর ক্যানিবালাদের পেটেই গেছেন। এটা তো রান্সসমুলুক-না, কী?

গ্লেনারভন এতক্ষণ দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে চুপচাপ বসে থেকেছেন। ম্যাক্সাসের মুখেও কোনো কথা নেই। একটুবাদে হাতের ফাঁক থেকে মুখ তুলে কী-রকম যেন জীর্ণগলায় গ্লেনারভন বলেছেন, মঁসিয় পাএয়ল, আমায় যে-কথা বলেছেন-বলেছেন। খবরদার-এ-কথা আর-কাউকে বলবেন না। কাণ্ডেন গ্রান্টের ছেলেমেয়েদের যা বলবার আমিই সময়সুযোগমতো বলে দেবো।

পাঁচ

অন্যমনস্কতা, জিন্দাবাদ!

দীর্ঘজীবী হোক, ভুলোমনেরা!

দীর্ঘজীবী হোক, কিউয়িপাখি!

অথচ তবু কেমন করে যেন সারা জাহাজেই খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছে।

আয়ারটন জানেনা, কাণ্টেন গ্রান্ট কোথায়। আর সেইজন্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের অজস্র জনমানবহীন ছোটো দ্বীপের একটায় তাকে নামিয়ে দিয়ে ডানকানইওরোপে ফিরে যাবে।

পাণ্ডায়ল আর ম্যাঙ্গলস-দুজনেই মানচিত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি দেশান্তর বরাবর একটা জনমানবহীন পাথুরে দ্বীপ আছে, যেটা আমেরিকা থেকে ৩৬০০ মাইল আর নিউজিল্যান্ড থেকে ১৫০০ মাইল দূরে। দ্বীপটায় কোনো মানুষ থাকে না। হয়তো শুধু গাংচিলেরাই উড়তে-উড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে এই দ্বীপে নেমে অবসন্ন ডানা জিরিয়ে নেয়-কোনো জাহাজই সমুদ্রের সে-দিকটায় মাড়ায় না। একেবারেই বিজনবিভূই একখণ্ড মস্ত পাথর যেন একদিন সমুদ্র থেকে মাথা বার করে আকাশ হাড়েছিলো।

আয়ারটন কিন্তু সেই দ্বীপটাতেই নামতে রাজি হয়েছে। দ্বীপটায় কেউ কখনও যায় না বটে, তবু তার একটা বাহারে নাম আছে; মারিয়া তেরেসা। ডানকান এখন সেই দ্বীপটা লক্ষ্য করেই চলেছে।

দু-দিন দু-রাত একটানা যাবার পর পর একদিন শেষবিকালের আলোয় দূরে দেখা গেলো মারিয়া তেরেসাকে। প্রায় তিরিশ মাইল দূর থেকে দেখা গেলে, দ্বীপটার ওপর সরু সুতোর মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে শূন্যে উঠে গেছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আশ্চর্য! দ্বীপটা কি তবে কোনো আগ্নেয়গিরি? প্রশান্ত মহাসাগরের এমন কত দ্বীপ আছে, যা একদিন জলের ওপর মাথা তুলেছিলো কোনো অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, তারপর একদিন আবার আগুনের উল্লিরণেই ফের সমুদ্রের তলায় ডুবে গিয়েছে। এ কী তাহলে সেইরকমই কোনো আগ্নেয় দ্বীপ? দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো কয়েকটা পাহাড়ের চূড়োও।

তখন বিকেল পাঁচটা। পাএয়ল তার টেলিস্কোপে চোখ রেখে দ্বীপটাকে দেখছিলেন কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স শুধোলেন : কী মনে হচ্ছে? কোনো আগ্নেয়গিরি?

কী জানি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কোনো ভৌগোলিকের বিবরণেই তো মারিয়া তেরেসার কোনো উল্লেখ নেই। তবে হয়তো অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই একদিন জলের মধ্য থেকে মাথা তুলেছিলো-ফলে এ যদি আগ্নেয়গিরি হয়ও, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

কিন্তু, গ্লেনারভন একটু শঙ্কিত স্বরেই বললেন, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যদি দ্বীপটা গজিয়ে থাকে, তবে তো অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই একদিন জলের তলায় ফের তলিয়ে যেতেও পারে।

তা নাও হতে পারে। মারিয়া তেরেসা দ্বীপঅন্তত কয়েকশো বছরের পুরোনো। গ্লেনারভন জিগেস করলেন, জন, রাতিরেই দ্বীপে নামা যাবে তো?

নামা হয়তো যাবে-তবে নামা কিন্তু ঠিক হবে না। যদি কোথাও কোনো চোরাপাহাড় থেকে থাকে, তাহলে ডানকান বিপদে পড়বে।

রাত তখন আটটা, মারিয়া তেরেসা দ্বীপের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এসেই কাণ্ডেন তার এনজিন বন্ধ করে দিলেও আন্তে-আন্তে তারই দিকে ভেসে চলেছে ডানকান, শুধু পালের হাওয়ার ওপর নির্ভর করেই। নটা নাগাদ দ্বীপ যখন আরো-কাছে এগিয়ে এলো, তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা নিবাতনিষ্কম্প স্থির উজ্জ্বল আলো দেখা গেলো।

এ আলো কি আগ্নেয়গিরিরই চিহ্ন না কি? পাণ্ডোল একটু আঁৎকেই উঠলেন।

কিন্তু অগ্ন্যুৎপাতের কোনো আওয়াজ তো শুনছি না, কাণ্ডেন ম্যাঙ্গস একটু অবাক সুরেই বললেন।

এ হয়তো এমন আগ্নেয়গিরি যে শুধু আগুনই ছড়ায়, কোনো আওয়াজ করে না। নিঃশব্দেই নিজের কাজ করে যেতে ভালোবাসে।

কিন্তু জাক পাঞ্চোলের এই ব্যাখ্যানায় কোনো কান না-দিয়েই জন ম্যাঙ্গল্‌স চোঁচিয়ে উঠলেন :এ-কী! ঐ-যে আরেকটা আগুন দেখছি! ঐ দেখুন-তীরে-বালিয়াড়ির ওপর! দেখুন! দেখুন! এ-আলোটা যে নড়ছে!

না, জন ম্যাঙ্গসের দেখায় কোনো ভুল হয়নি। সত্যিই একটা আলো জ্বলছে বেলাভূমিতে। হাওয়ায় কখনও নিভু নিভু হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠছে।

তার মানে, গ্লেনারভন বলে উঠলেন, এ-দ্বীপে লোক থাকে। এ আলো প্রকৃতির দান নয়-
মানুষেরই হাতে জ্বালানো!

তাহলে তো আয়ারটনকে এই দ্বীপে নামানো যাবে না!

না। মেজর ম্যাকন্যাব্স সায় দিয়ে বললেন, দ্বীপে যদি বন্য বর্বরেরা থেকে থাকে, তাহলে
আয়ারটনের কপালে দুঃখ আছে। জেনে-শুনে এমন দ্বীপে আয়ারটনকে রেখে আসা যাবে
না।

রাত এগারোটার সময় কাণ্ডেন শুক্কু সবাই যে য়াঁর ক্যাবিনে চলে গেলেন। ভোর-হওয়া
অন্ধি ডানকান তীরের কাছে এখানেই অপেক্ষা করবে। তারপর দিনের আলোয় অবস্থা
বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

কেউ যখন ডেকে নেই, এমন সময় ডেকে এসে দাঁড়ালে মেরি আর রবার্ট। আর সবাই
হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের চোখে কোনো ঘুম নেই।

রেলিঙে ভর দিয়ে দুজনেই তাকিয়ে রইলো ফসফর-জ্বলা নীল জলের দিকে। কে জানে,
তাদের দুজনের জন্যে ভবিষ্যৎকী সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন তো অতীতও
গেলোকান্ডেন গ্রান্টের কোনো খবরই আর পাওয়া যাবে না। তিনি কি এখনও বেঁচে
আছেন? কোথায় আছেন? কোথায়?

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে ফিশফিশ করে রবার্ট বলে উঠলো : মেরি! আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি। কখনও ছাড়বোও না। বাবাকে আমি খুব-ভালো করে চিনি। সহজে হাল ছেড়ে দেবার মানুষ তিনি নন।

মেরি তেমনি ফিশফিশ করেই জিগেস করলে, কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স কী বলেন? উনি কি এখনও কোনো আশা রাখেন?

নিশ্চয়ই। কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌স আমাদের সত্যিকার বন্ধু-উনি আমাদের কিছুতেই হতাশার মুখে ঠেলে দেবেন না। ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে-উনি আমাকে জাহাজ চালাতে শেখাবেন। আমিও একদিন জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। বাবাকে খুঁজতে বেরুবো।

বাঃরে, তাহলে তো তোর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।

তা হয়তো হবে-কিন্তু একলা তো থাকবি না। লেডি হেলেনা কিছুতেই তোকে কাছছাড়া করবেন না। তাছাড়া কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের ইচ্ছে যে-

কাপ্তেন ম্যাঙ্গল্‌সের ইচ্ছেটা যে কী, সেটা মেরিরও অজানা নেই। তবু রবার্টের মুখ থেকে কথাটা বেরতেই তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিলো, ভাগ্যিণী এত-রাত বলে ডেকে আলোছায়ার খেলা চলছিলো, রবার্ট নিশ্চয়ই তার মুখখানা দেখতে পায়নি। কিন্তু রবার্টের কথাটা যেমন অসমাপ্ত রয়ে গেলো, মেরির লজ্জাবিজড়িত ভাবনাটাও তেমনি মাঝখানে কোন্-এক হ্যাঁচকা টানে যেন ছিঁড়ে গেলো।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্য থেকে কার যেন অস্ফুট কাতর স্বর ভেসে এসেছে : বাঁচাও!
বাঁচাও!

রবার্ট অমনি কথা ঘুরিয়ে বললে :মেরি, তুই কিছু শুনতে পেলি!

রেলিঙ ধরে ঝুঁকে পড়লো দুজনে। অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে কিছুই ঠাহর হয় না।

কিন্তু কোন-এক তীব্র আবেগে মেরির আরক্ত মুখটা হঠাৎ পাংশু হয়ে উঠলো। ধরাগলায় বললে, রবার্ট...রবার্ট...মনে হলো...না, না, তা কী করে হবে... আমি বোধহয় ভুলই শুনেছি!

সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে এলো আবার সেই আর্ত হাহাকার : বাঁচাও! বাঁচাও!মনে হলো ঢেউয়ের ফসফরের মধ্য দিয়েই আবছা নীল আলোর মতো ভেসে এলো স্বরটা।

এবং এবার রবার্টের আর ভুল হলো না। আর সে নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। আকুলস্বরে ডেকে উঠলো : বাবা! বাবা! যেন অন্ধকারের মধ্যেই তার গলার স্বর বাবাকে খুঁজতে সিন্ধুহাওয়ায় উড়ে চলে গেলো।

মেরি আর সহ্য করতে পারেনি, ততক্ষণে সে তীব্র আবেগের চাপেই বুঝি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতো-যদি-না শেষমুহূর্তে রবার্ট তাকে ধরে ফেলতো। রবার্ট যে কী ভেবেছিলো কে জানে। মেরির মূর্ছিত চেতনাহীন দেহটা জড়িয়ে ধরেই সে চেষ্টা করে উঠলো : কে কোথায় আছে! এম্ফুনি এসো! বাবা ডাকছেন! এসো, বাঁচাও!

যে-সব মাল্লারা যে-যার কাজে তখনও ব্যস্ত ছিলো, তারা সবাই ছুটে এলো! চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে অন্যদের। তারা সবাই যে যার ক্যাবিন থেকে ছুটে এসেছেন।

এইমাত্র রাত্তিরে এ-কী ব্যাপার! কাপ্তেন থ্রান্টের কোনো খোঁজ আর পাওয়া যাবে না জানবার পরে দুই ভাইবোনের কি মাথাইবিগড়ে গেছেনাকি! ডেউয়ের দিকে আঙুল তুলে বুকভাঙা আতর্স্বরে রবার্ট শুধু একই কথা বলছে : বাবা! বাবা! ঐ-যে ঐখানে, অন্ধকারে... মেরিকে সে তখন ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। কী? শুনতে পাচ্ছেন না? বাবা আছেন-সাহায্য চেয়ে ডাকছেন-ঐ-যে-শুনুন...বাঁচাও!বাঁচাও! মেরিও শুনেছে, শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি-জ্ঞান হারিয়ে গেছে ওর...কিন্তু ঐ শুনুন...

এ কী নিশির ডাক শুনেছে নাকি? এখনও কি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে আছে? ঠিক জানে, সে কী বলছে?

রবার্টের কাঁধে হাত রেখে লর্ড গ্লেনারভন জিগেস করলেন : কী বলছে। রবার্ট? তুমি কাপ্তেন থ্রান্টের গলা শুনতে পেয়েছো?

হ্যাঁ...হ্যাঁ...মেরিও শুনেছে। একজনের ভুল হতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দুজনেরই একই ভুল হবে কী করে? হঠাৎ গলাটা শুনতে পেয়েই তো মেরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে-

লেডি হেলেনা এসে ততক্ষণে মেরির দেহটা ধরে দাঁড়িয়েছেন।

ক্রোনিদো যতই বলুক না কেন, এখন তুমি বড় হয়ে গেছে, রবার্ট,তবু তো। রবার্ট সত্যি এখনও ছেলেমানুষই আছে! কী শুনতে কী শুনেছে...আর ঠিক নিজের ইচ্ছাপূরণের মতো করেই রাতের হাওয়ায় শুনে ফেলেছে বাবার গলা!

কিন্তু যতই ইচ্ছাপূরণের অলীক কল্পনা হোক না কেন, এর ভুলটা তো এখুনি, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই ভাঙিয়ে দিতে হয়! হাল ধরে যে-নাবিকটি দাঁড়িয়েছিলো, তাকেই ডেকে গ্লেনারভন জিগেস করলেন : হকিস, মিস মেরি অজ্ঞান হয়ে যাবার সময় তুমি হালেই ছিলে তো?

হ্যাঁ, মি-লর্ড। কিছু শুনেছো?

না, মি-লর্ড। জলের আর হাওয়ার শব্দ ছাড়া আর-কিছুই শুনিনি। শুধু ওখানে দাঁড়িয়ে ওঁরা দুজনে কথা বলছিলেন।

না-না। আমি সত্যি শুনেছি। খুবই চাপা অস্ফুট স্বর-হকিস হয়তো খেয়াল করেনি, তাই শুনতে পায়নি-কিন্তু নৌকো নিয়ে একবার চলুন নাদীপটায়-ওখানে গিয়েই তো সন্দেহভঞ্জন করা যায়—

পাওয়েল হঠাৎ রেলিঙ ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সবাইকে চুপ করতে বললেন।সকলেই উৎকর্ণ হয়ে আছেন, যদি কিছু কানে আসে। কিন্তু জলের একটানা ফিশফিশ শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না-এমনকী হাওয়াও এখন মরে এসেছে-হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না এখন।

পাণ্ডয়ল নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে বললেন, অদ্ভুত! সত্যিই, বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যাই চলে না। আবেগ আর অনুভূতির কোন চরম বিপর্যয়ের মধ্যে যে মানুষ নিজের ইচ্ছাপূরণ করার জন্যে কত-কী শুনতে পায়! অদ্ভুত! ভারি অদ্ভুত!

লর্ড গ্লেনারভন নিজেই রবার্টকে ধরে-ধরে নিয়ে গেলেন তার ক্যাবিনে। লেডি হেলেনা ততক্ষণে মেরিকে নিয়ে চলে গিয়েছেন। আজ রাতে তো আর কিছুই করার নেই, কাল দিনের আলোয় না-হয় দ্বীপে নেমে দেখা যাবে।

পরের দিন, আটই মার্চ, ভোর হবামাত্র রবার্ট আবার ডেকে এসে দাঁড়ালে। সারারাত সে একফোঁটাও ঘুমোয়নি। উদ্ভান্ত চোখমুখ। যেন বড়ো-একটা ঝড় বয়ে যাবার পর কোনো একটা গাছ আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

আস্তে-আস্তে অন্ধকার থেকেফুটে উঠেছে দ্বীপটা—ডানকান মাত্র একমাইল দূরে নোঙর ফেলেছে।

অন্যরাও ততক্ষণে ডেকে এসে হাজির হয়েছেন। সবাই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখতে চাচ্ছে দ্বীপটাকে।

হঠাৎ আবার চীৎকার করে উঠলো রবার্ট, গত রাত্তিরের মতোই। এবার সে কিন্তু শোনেনি, বরং দেখেছে যে দুজন লোক একটা পতাকা নাড়তে-নাড়তে বেলাভূমির দিকে ছুটে আসছে!

দূরবিনে চোখ লাগিয়েই চীৎকার করে উঠলেন কাণ্ডেন ম্যাঙ্গ-এ-কী! এ-যে ইউনিয়ন জ্যাক, গ্রেটবিটেনের পতাকা!

ততক্ষণে জাক পাঞ্চয়ল কেমন বিস্ফারিত চোখে, তার টেলিস্কোপ থেকে নজর সরিয়ে কেমন-একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন রবার্টকে। শুধু বললেন : হ্যাঁ, এটা ইউনিয়ন জ্যাকই!

এতই হকচকিয়ে গিয়েছেন সবাই যে পরের কয়েকটা মুহূর্ত কারু মুখেই কোনো কথা নেই! তারপরেই প্রচণ্ড আবেগে রবার্টের কম্পিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো : মি-লর্ড! মি-লর্ড! এম্ফুনি যদি নৌকো না-নামান তো আমি কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরেই চলে যাবো! দয়া করুন, মি-লর্ড! আমায় যেতে দিন!

কাণ্ডেন ম্যাঙ্গসের নির্দেশে ততক্ষণে একটা নৌকো নেমে পড়েছে জলে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে পর-পর নেমে এলেন লর্ড গ্লেনারভন, কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স আর জাক পাঞ্চয়ল, তারপর মেরি আর রবার্ট। ছ-জন মাঝা বসলো দাঁড় টানতে, আর কাণ্ডেন ম্যাঙ্গল্‌স নিজে গিয়ে বসলেন হালে।

তীর থেকে যখন বিশ-পাঁচিশ হাত দূরে, তখনই উত্তেজিত স্বরে মেরি চৈঁচিয়ে উঠলো : বাবা!

বেলাভূমিতে দুই লম্বাচওড়া পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শীর্ণ কিন্তু দীর্ঘদেহী তৃতীয় একজন পুরুষ। আর মেরির গলা শুনেই সেই মানুষটি যেন সামনের দিকে তাকিয়ে হাওয়া আঁকড়ে ধরতে চেয়ে লুটিয়ে পড়ে গেলেন বালির ওপর।

কাপ্তেন গ্রান্ট!

শুধু যে দুঃখেই বুক ফাটে তা নয়, আনন্দেও কখনও-কখনও বুক ফেটে যায়। কিন্তু একটু শুশ্রূষার পরেই কাপ্তেন গ্রান্ট আবার সাড় ফিরে পেয়েছেন। তারপরই তাকে আর তার দুই সাথীকে নিয়ে ডানকানে ফিরে এলো নৌকো। আর নৌকোয় আসতে-আসতেই দু-চারকথায় ছাড়া-ছাড়া ভাবে কাপ্তেন গ্রান্ট শুনেছেন ডানকানের ইতিহাস। দুই ভাই-বোনই একসঙ্গে কথা কইতে যাচ্ছিলো, তারপর দুজনেই হঠাৎ-হঠাৎ একসঙ্গে থেমে যাচ্ছিলো, তারপর ফের আবার কাহনের খেই ধরেছিলো দুজনেই একসঙ্গে। ডানকানে এসেই কাপ্তেন গ্রান্ট প্রথমে প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা করে তার কৃতজ্ঞতা জানালেন, কিন্তু বার-বার ধন্যবাদ দিয়েও যেন অনুভূতির শান্তি নেই। এটা স্কটল্যান্ডেরই জাহাজ, তারই দেশের জাহাজ। একবার নতজানু হয়ে বসে ঝুঁকে এমনকী ডানকানেরই ডেককে চুম্বন করলেন কাপ্তেন গ্রান্ট-এই জাহাজ তো তারই স্বদেশের সম্প্রসারিত ভূমি-সাতসাগর তেরোনদী পেরিয়ে এই মারিয়া তেরেসা দ্বীপের কাছেই যেন এসে পড়েছে।

আর একবারও চোখ ফেরাত পারেননি ছেলেমেয়ের ওপর থেকে। মেরি শুধু বয়েসেই বাড়েনি, রূপ ফেটে পড়ছে তার সুগঠিত দেহবল্লরী থেকে। আর রবার্ট? তার চেহারাটা কিশোরেরই, কিন্তু দেখে মনে হয় যেন কত বড়োটি হয়ে গেছে। মাত্র দুটো বছরেই এত বদল হয় লোকের?

তারপর যখন সকলের সঙ্গে এক এক করে পরিচিত হবার সময় জন ম্যাঙ্গস-একটা ঝকঝকে নতুন জাহাজের কাপ্তেন-কেমন যেন লাজুক-লাজুক ভঙ্গিতে গুটিয়ে যেতে

চাচ্ছিলেন আর মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন লেডি হেলেনা, তখন কাণ্ডেন গ্রান্টের বুঝতে দেরি হয়নি এই তরুণ কাণ্ডেনের সঙ্গে তার মেয়ের সম্পর্কটা কী দাঁড়িয়েছে। আর তক্ষুনি মেয়েকে ডেকে সকলের সামনেই তিনি জন আর মেরির হাত মিলিয়ে দিলেন— আর শুভকামনায় যেন ফেটে পড়লো আস্ত জাহাজটাই। আজ শুধু পুনর্মিলনেরই দিন নয়, নূতন জীবন শুরু করারও দিন।

এই উৎসবের আবহাওয়ার ভেতর মনখারাপের শুধু একটাই বিষয়। আয়ারটনকে এই দ্বীপেই নির্বাসন দিতে হবে। তার আগেই অবশ্য কাণ্ডেন গ্রান্ট আবারও একবার নেমেছেন দ্বীপটায়, যে-দ্বীপটা দু-বছর তাদের আশ্রয় দিয়েছে। ঘুরে-ঘুরে সবাইকে দেখিয়েছেন আস্ত দ্বীপটাই।

ছোট দ্বীপ মারিয়া তেরেসা। দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল, প্রস্থে মোটে দু-মাইল। জাক পাঞ্চয়ল সত্যিই ধরেছিলেন—আসলে দ্বীপটা একটা মস্ত অগ্নিগিরির চূড়া কিন্তু আগ্নেয়গিরি এখন আর জাগ্রত নয়। কবেই যে সে মরে গিয়েছে তা কেউ জানে না। পলি জমেছে বোজানো জ্বালামুখে। গাছপালা গজিয়েছে, হয়তো কোনোদিন সমুদ্রপাখিরা ঠোঁটে করে এনেছিলো কোনো উদ্ভিদের বীজ। একবার একদল তিমিশিকারি এখানে থেমেছিলো, তারা ছেড়ে দিয়ে গেছে শুওর আর ছাগল—এতদিনে তারা শুধু বংশবৃদ্ধিইকরেনি, এমনকী ছাগলগুলোও বন্য হয়ে গিয়েছে, শুওরগুলোর তো কথাই নেই। ছোট একটা ঝর্না আছে, কী মিষ্টি তার জল! আর বারোমাস জল থাকে সেখানে, শুধু বর্ষার জলের জন্যে হা-পিত্যেশ করে থাকতে হয় না। দ্বীপের এ-দিকটাতেই ঝড় এসে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেছিলো ব্রিটানিয়াকে। শুধু এঁরা তিনজন ছাড়া সেইকরাল তুফানের হাত থেকে আর-কেউ রেহাই পায়নি। দুই সাথীকে নিয়ে সেখানেই ঘর বাধেন কাণ্ডেন গ্রান্ট, আরো-একটা

রবিনসনেডই বুঝি, শুধুতার দুজন সঙ্গী ছিলো প্রথম থেকেই-আর কোনো ফ্রাইডেও একদিন এখানে এসে হাজির হয়নি। ভাঙাচোরা ব্রিটানিয়ার ধ্বংসাবশেষ থেকেই কাঠকুটো এনে কুঠি তৈরি করেন তারা। ভারি কেম্বিসকাপড়ের পালে আলকাতরা মাখিয়ে গোড়ায় ছাত বানান। পরে অবশ্য অন্য কাঠকুটো এনে সেটাকে শক্ত করা হয়। ভাঙা জাহাজে কিছু বীজও পেয়েছিলেন-তাই থেকে ছোট আবাদও তৈরি হয়। দুটি বুনো ছাগলকে ধরে এনে পোষ মানিয়ে নেয়। ব্রেডফুট গাছ জোগায়-না, রুটি ঠিক নয়, তবে তারই মতো কিছু-একটা। আর এইভাবেই কেটে গিয়েছে আড়াই বছর। এই দ্বীপ কোনো জাহাজ যাবার পথে পড়ে না। সবচেয়ে কাছে আছে নিউজিল্যান্ড, সেও তো দেড়হাজার মাইল দূরে। তবু তারা পালা করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখতেন দূরে কোথাও কোনো জাহাজ দেখা যায় কি না। আড়াই বছরে মাত্র তিনটে জাহাজ দেখেছেন- কোনোটাই থামেনি-অনেক দূর দিয়ে চলে গিয়েছে।

কিন্তু গতকাল যখন দেখতে পেলেন চোঙ দিয়ে ভলকে-ভলকে ধোঁয়া ছেড়ে একটা জাহাজ এই দ্বীপের দিকেই আসছে, তখন সবাই উল্লাসে ফেটে পড়েছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। জাহাজ থেকে লোক যাতে টের পায় দ্বীপে কেউ থাকে, সেইজন্যে পাহাড়ের চূড়ায় তারা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন গ্রান্ট তার পরেও কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। জাহাজ মাত্র মাইলখানেক দূরে এসে গেছে, অথচ তাদের জ্বালানো আগুন দেখেও কোনো সাড়া দিচ্ছে না, তখন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, সাঁতরেই জাহাজে চলে যাবেন বলে। কিন্তু জাহাজ অর্ধি যেতে পারেননি- মাঝপথেই যখন গেছেন, তখন দ্যাখেন জাহাজটা মুখ ঘুরিয়েছে। এতক্ষণ সাঁতার দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, দম ফুরিয়ে যাচ্ছিলো, তবু শেষমুহূর্তে বাঁচাও! বাঁচাও! বলে আত্মস্বরে চেষ্টায়ে উঠেছিলেন। তাঁর দুই সঙ্গী কোনোমতে জল থেকে তাকে উদ্ধার করে

আনে ঠিককরেছিলেন, পরদিন ভোরেই তীরে জলের কাছে দাঁড়িয়ে চেষ্টায়ে পতাকা নেড়ে জাহাজের দৃষ্টিআকর্ষণ করার চেষ্টা করবেন।

এতক্ষণ ধরে সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে-দেখতেই কাপ্তেন গ্রান্ট পুরো কাহনটা শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু শুনতে-শুনতে সারাক্ষণই উশখুশ করেছেন পাএয়ল। একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই তার মাথার মধ্যে কামড়াচ্ছিলো, এবার কাপ্তেন গ্রান্ট থামতেই আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, ফস করে জিগেস করে বসলেন : আচ্ছা, চিরকুটগুলোয় কী লিখেছিলেন মনে আছে? সেই যে-লেখাটা বোতলে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন?

নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রত্যেকটা কথাই মনে আছে। তিন ভাষাতেই একই কথা লিখেছিলুম। শুনুন, আপনাকে আগে ফরাশি বয়ানটাই শোনাই, বলে স্পষ্ট করে প্রত্যেকটা কথা শুনিয়ে দিলেন কাপ্তেন গ্রান্ট :

বিস্মিত পাএয়লের মুখ দিয়ে একটা উৎকট আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

কাপ্তেন গ্রান্ট একবারও না-থেমে বাকিটুকুও বলে দিলেন :

Tabor কথাটা শুনেই বিস্ময়ে চেষ্টায়ে উঠেছিলেন পাএয়ল, এখন প্রায় ঝগড়া করার ভঙ্গিতেই বললেন-যেমন তিনি বলে থাকেন কোনো পণ্ডিতজনের আলোচনাসভায়-কিন্তু সে-কী! আপনি টেবর আইল্যাণ্ড বলছেন কাকে? এটা তো মারিয়া তেরেসা দ্বীপ!

দুটোই ঠিক, মঁসিয় পাএয়ল। কাপ্তেন গ্রান্ট স্মিতমুখে বললেন, ইংরেজি আর আলেমান ভাষায় যাকে মারিয়া তেরেসা বলে, ফরাশিতে তারই নাম টেবর।

ঠিক তক্ষুনি বিষম একটা থাবা পড়লো মঁসিয় পাঞয়লের কাঁধে। থাবাটা মেজর ম্যাকন্যাসের। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেই ফেলেন : ধুত্তোরি ভূগোলের! কিন্তু শত ধিক ভূগোলের পণ্ডিতদের!

পাঞয়ল সে-কথা কানেই নেননি। তখন তিনি নিজেই ধুলোয় মিশিয়ে যেতে, পারলে বাঁচেন। এমনকী কাঁধের ঐ চাপড়টা পর্যন্ত তিনি টের পাননি। শতধিক কী বলছেন মেজর, সহস্র ধিক, লক্ষ ধিক! এত-বড় ভূগোলবিশারদ হয়েও তিনি কি

জানতেন না যে একটা ছোট দ্বীপের দু-দুটো ভিন্ন নাম! ছি-ছি-ছি, এত তিনি জাঁক দেখাতেন নিজের জ্ঞানগরিমা নিয়ে। অথচ এই তুচ্ছ কথাটাই কি না তিনি জানতেন না! না-না, পারলে বুঝি মাথার চুলগুলোই ছিঁড়ে ফেলতেন তিনি, ভৌগোলিক সমিতির সচিব হবার কোনো যোগ্যতাই আমার নেই! এক্ষুনি ইস্তফা দেবো-এক্ষুনি পদত্যাগপত্র দাখিল করবো

লেডি হেলেনা একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন : এ আর এমন কী ভুল! অত মনখারাপ করার কী হলো?

মনখারাপ করবো না? আবারও মাথার চুল ছিঁড়েছেন পাঞয়ল, আমি একটা গাধা! একটা আহাম্মক একটা আকাট মূর্খ!

কিন্তু ততক্ষণে চিরকুটটির যে-সব শব্দের ভুল অর্থ করা হয়েছিলো, হরফ জলে ভিজে মুছে যে-ব্যাসকূট তৈরি করেছিলো, এখন সে-সবও স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন Contin

মানে Continent নয়, Continual; Indi হবে না India বা Indegenese হবে Indigence!

আর এই নিয়ে কত-কী বলাবলি করতে-করতেই ফের ডানকানেফিরে এলেন সবাই।

বিকেলবেলায় ডেকের ওপর আয়ারটনকে নিয়ে-আসা হলো কাণ্ডেন গ্রান্টের সামনে।
গ্রান্ট শুধু ছোট করে বললেন : আয়ারটন, আমি আবার ফিরে এসেছি।

আয়ারটনের মুখে কিন্তু এতটুকু ভাবান্তর হলো না। শুধু বললে : এসেছেন? বেশ ভালো হলো। সুখী হলাম।

আমি কিন্তু মস্ত একটা ভুল করেছিলুম, আয়ারটন। তোমাকে আমি নামিয়ে দিয়েছিলুম লোকালয়ে, মানুষ যেখানে থাকে। কিন্তু তুমি তো অন্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার যোগ্য নও!

হয়তো। এবার কিন্তু আর সেই ভুল হবে না। আমি অ্যাডিন যে-নির্জন দ্বীপটায় ছিলাম, এখন থেকে আমার বদলে তুমিই সেখানে থাকবে। আমাদের দুজনেরই ভূমিকাউলটে যাবে। এখানে একা-একা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। বিধাতা তোমায় দেখবেন।

তা-ই হবে, আয়ারটনের স্বর একটুও কাঁপলো না।

গ্লেনারভন আবারও জিগেস করলেন : এখনও তুমি একা-একা এই দ্বীপে থাকতে চাচ্ছে?

হ্যাঁ।

তাহলে এই কথাগুলো শুনে রাখো। কাপ্তেন গ্রান্টের মতো তুমি কিন্তু মোটেই হারিয়ে যাবে না। আমরা সবাই জানবো, তুমি কোথায় আছো। তোমার কথা আমাদের মনে থাকবে। এও জানা থাকবে, কোথায় গেলে তোমায় পাওয়া যাবে। কাকতাল কিন্তু বার-বার হয় না বলেই সেটা কাকতাল। ডানকান দৈবাৎ এদিকটায় এসে পড়েছিলো বলেই কাপ্তেন গ্রান্ট বেঁচে গিয়েছেন। তোমার বেলায় আমরা আর ঐ দৈব যোগাযোগের ওপর নির্ভর করবো না। আমরা একদিন আবার ফিরে আসবো, তোমাকে মানুষের মাঝখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

তা-ই হবে।

আর একটা কথাও বললো না আয়ারটন, নৌকায় গিয়ে উঠলো। তার জন্যে নৌকায় আগেই তুলে রাখা হয়েছিলো শুখা মাংস, কাপড়চোপড়, কিছু যন্ত্রপাতি, বন্দুক, গুলিবারুদ-আর সবচাইতে বড়ো-একটা হাতিয়ার-সে হলো বাইবেল।

সবাই ডেকের ওপর সার দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। লেডি হেলেনা একটু বিচলিত বোধ করেছেন। মেরির চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। অন্যরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছেন। লেডি হেলেনা একবার বলেই ফেলেন, এড, ওকে কি নির্বাসন না-দিলেই নয়? তার মনে পড়ে গেছে তার সঙ্গে কথা বলবার পরই আয়ারটন লর্ড গ্লেনারভনের সঙ্গে একটা রফানিস্পত্তি করতে চেয়েছিলো-এই শাস্তিটা সে নিজেই বেছে নিয়েছে নিজের জন্যে।

গ্লেনারভন কিছু বলবার আগেই আয়ারটনশান্তঅবিচলিত স্বরে বললে : আমাকে আপনারা আমার পাপের সাজাই ভোগ করতে দিন। কোনো সহানুভূতি দেখিয়ে আমায় দুর্বল করে দেবেন না।

নৌকো তাকে নিয়ে দ্বীপে গিয়ে পৌঁছুতেই লাফিয়ে নেমে পড়লো আয়ারটন। নৌকো ফিরে এলো জাহাজে। ডেক থেকে দেখা গেলো, বালিয়াড়িতে একটা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে আছে আয়ারটন-তাকিয়ে আছে ডানকানেরই দিকে।

ও-দিকে সূর্যাস্তের রঙে তখন রাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছে সাগরজল। জন ম্যাঙ্গস প্রায় ফিশফিশ করেই অনুমতি চাইলেন : জাহাজ ছাড়ি?

ছাড়োবলেই দ্রুতপদে ডেক ছেড়ে চলে গেলেন গ্লেনারভন।

আর রাত আটটা নাগাদ অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো টেবর আইল্যান্ডের পাহাড়ের চূড়ো।

ফেরবার পথে অমন যে অবিচলিত নির্বিকার মেজর ম্যাকন্যাব্স তিনি পর্যন্ত পাণ্ডুলেবের একটা ব্যাপার দেখে কৌতূহলে প্রায় ফেটেই পড়বেন যেন। সেই-যে তালকাউয়ানো ছেড়ে অ্যাটলান্টিক ধরেছেন তারা, তখন থেকেই তার কৌতূহলটা আরো-উগ্র হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

বিষম গরমে সকলে যখন হাঁসফাস করছে, প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, তখনও কি না মঁসিয় পাএয়ল শুধু-যে তার লম্বা ওভারকোট পরেই থাকেন, তা নয়, গলা পর্যন্ত বোম আটকে রাখেন, আর দরদর করে ঘামেন, আর আইটাই করেন। ব্যাপারটা কী? ভুলোমন? অন্যমনস্কতা? দিনের পর দিন তিনি কি ভুলেই যাচ্ছেন যে এখন ওভারকোট গায়ে দেবার মরশুম নয়-অন্তত গরম নিশ্চয়ই কথাটা তাঁকে জানান দেয়। তবে?

দশই মে বেলা এগারোটায় ডামবারটনে নোঙর ফেলেছে ডানকান। আর বেলা দুটোয় ম্যালকম কাসলে এসে ঢুকেছেন অভিযাত্রীরা।

সারা তল্লাটটায় আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেলো। আস সরগরম। রোজ বড়ো-বড়ো মজলিশ হয়। আর এমনি একটা মজলিশে মেজর ম্যাকন্যাসের এক তুতোবোনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো মঁসিয় পাএয়লের। আর দেখবামাত্র মহিলাটি পাএয়লের প্রেমে পড়ে গেলেন। মহিলাটির টাকার অভাব নেই, রূপও আছে, কিন্তু মাথায় একটু ছিট আছে-তাই অ্যাডিন কাউকে ধারে-কাছে ঘেঁসতেই দেননি। অথচ এবারে পাএয়লকে দেখেই ভদ্রমহিলা কুপোকাত। পাএয়লেরও যে তাকে পছন্দ হয়নি, তা নয়। কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন না।

শেষটায় বেজায় চটে গিয়ে মেজর ম্যাকন্যাই একদিন চেপে ধরলেন পাএয়লকে। যখন চেপে ধরেছিলেন, তখনও জানতেন না যে এবারই ওভারকোটরহস্যটার একটা সমাধান হয়ে যাবে।

ব্যাপারটা কী, মঁসিয় পাএয়ল? মিস অ্যারাবেলাকে যদি পছন্দ না-হয় তো সাফসুফ বলে দিলেই পারেন। অমন ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন?

পছন্দ হবেনা কেন?খুব হয়েছে। চাদেও তোকলঙ্ক থাকে-মিস অ্যারাবেলারই কোনো খুঁত নেই।

তা থাকবে না কেন। দোষে-গুণে মিশিয়েই তো মানুষ হয়। কিন্তু ওঁকে যদি মনে ধরেই থাকে, তবে বিয়েটা করে ফেলছেন না কেন?

না-না, সে হয় না। কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না।

কিন্তু মেজর ম্যাকন্যাব্‌স নাছোড়। তার গোঁ আছে। তিনি যেটা করবেন বলে ধরেন, সেটার একেবারে শেষ না-দেখে ছাড়েন না। শেষটায় তার বিষম চাপ আর সহ্য হলো না পাএয়লের। একদিন মেজরের কানে-কানে গুপ্ত রহস্যটা ফাস করে দিলেন। শুনে মেজর তো হেসেই বাঁচেন না। আরে! এই কথা! শুধু যদি এটাই বাধা হয় তবে এ তো মোটেই ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। অ্যারাবেলা তো দেখছি আপনার প্রেমে আরো হাবুডুবু খাবে। এমন-কোনো বর তো সে আর-কোথাও খুঁজে পাবে না।

মেজর ম্যাকন্যাসের উদ্যোগেই পনেরোদিন পরে মহাধুমধাম করে মিস অ্যারাবেলার সঙ্গে মঁসিয় পাএয়লের বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের আসরেও দেখা গেলো একটা মস্ত ওভারকোট পরে আছেন পাএয়ল, তেমনি গলা অন্দি বোম আঁটা। এটাই কি ফ্রান্সের হালফ্যাশান নাকি?

পাএওয়লের গুপ্তরহস্য অবশ্যি কেউই কোনোদিন জানতে পারতেন না, যদি-না মেজর একদিন চুপি-চুপিকথাটা বলে দিতেন গ্লেনারভনকে, গ্লেনারভন বলে দিতেন হেলেনাকে, হেলেনা বলতেন মিসেস ম্যাঙ্গল্‌স ওরফে মেরিকে, আর মেরি বলতো মিসেস অলবিনেটকে, আর তারপর এ থেকে সে, সে থেকে ও-এইভাবে গোপন কথাটি আর গোপনই রইলো না আস্ত স্কটল্যাণ্ডে।

মাওরিদের ঘাঁটিতে যখন তিনদিন বন্দী হয়ে কাটিয়েছিলেন মঁসিয় পাএওয়ল, তখন মাওরিরা জোর করে তাদের কুলের চিহ্ন কিউয়ি পাখির উলকি দেগে দিয়েছে তার বুক : দু-পাশে ডানাছড়ানো মস্ত-একটা কিউয়ি; আর পাএওয়ল অ্যাদ্দিন ধরে বুক লুকিয়ে রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের ঐ পাখিকে!